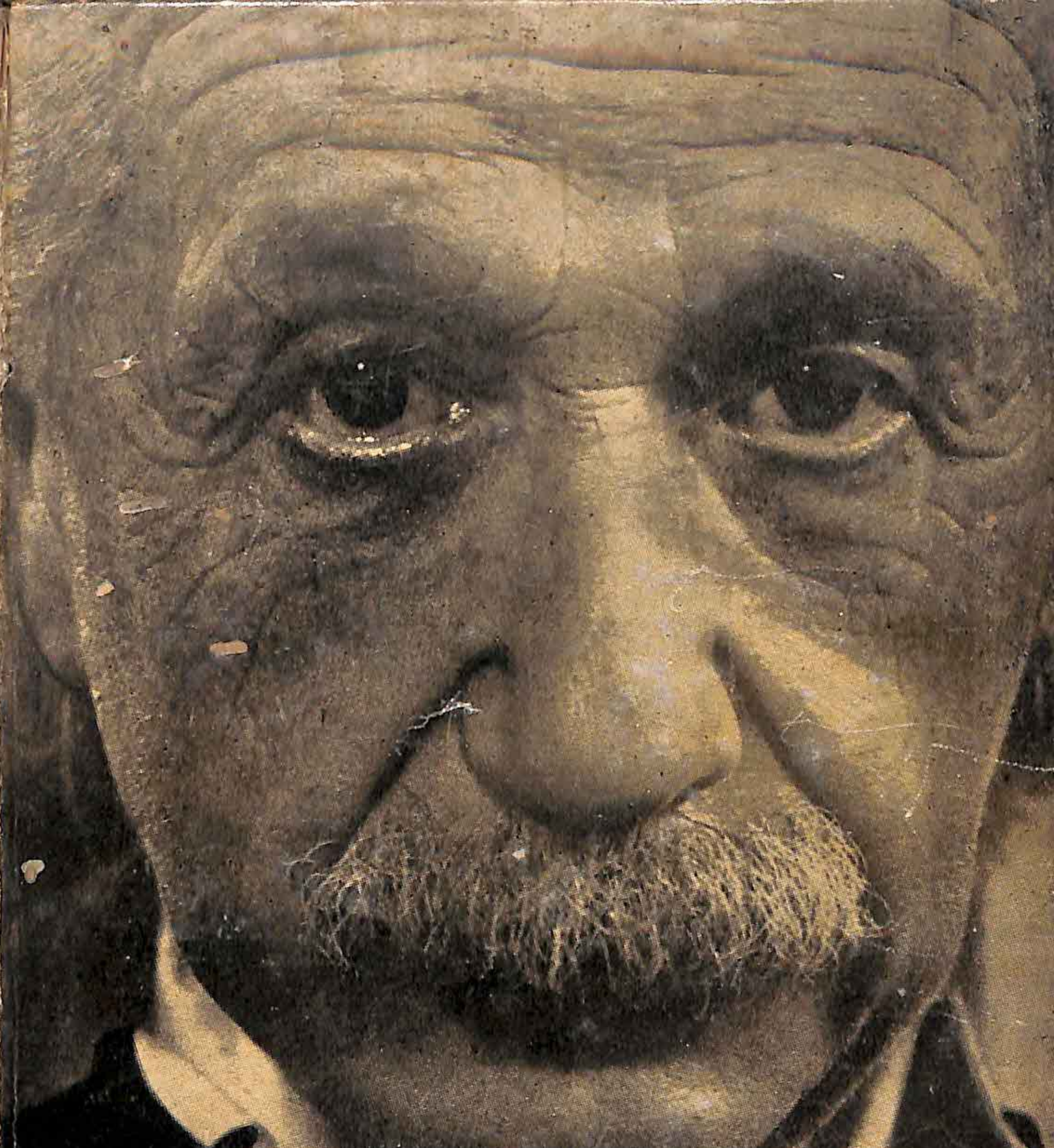


আইনস্টাইন

জীবন-জিজ্ঞাসা

সংকলক ও অনুবাদক - শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন-জিজ্ঞাসা

মানুষ আইনস্টাইনের পরিচায়ক এই গ্রন্থে তাঁর সাধারণ অভিমত ছাড়াও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্র এবং শান্তিবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আইনস্টাইনের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংকলন করা হয়েছে। এ যুগের একজন অদ্বিতীয় মানবদরদী মহাপুরুষের মানসলোকের গঠন ও গতিপ্রকৃতি উদ্ঘাটিত হয়েছে এই রচনা সংকলনে। আইনস্টাইনের জীবিতকালে তাঁর নিজের তত্বাবধানে এ সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত হয় তার প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে তাঁর সর্বশেষ রচনাগুলি। এই পুস্তকের অনেকগুলি প্রবন্ধ ইতঃপূর্বে বিশ্বের কোন ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।

বিজ্ঞান-রাজ্যের বিস্ময়, পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্রদের মত কৌতূহলাবৃত অসীম প্রতিভাধর এক মহাজ্ঞানীর চিন্তাধারার পরিচায়ক এই গ্রন্থ—জীবন-জিজ্ঞাসা।

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ :

মহাত্মা গান্ধীর	আমার ধ্যানের ভারত
	আমার জীবন কাহিনী
	শিক্ষা
	ছাত্রদের প্রতি
	পল্লী পুনর্গঠন
কিশোরলাল মশরুওয়ালার	গান্ধী ও মার্কস
আলডুস হাক্সলের	বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি
	এপ অ্যাণ্ড এসেন্স
মৌলিক গ্রন্থ	সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ

আইনস্টাইন

জীবন-জিজ্ঞাসা

সংকলক ও অনুবাদক
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা-১২
১৩৬৯

প্রথম সংস্করণ : এক হাজার
পৌষ ১৩৬৯ । জানুয়ারি ১৯৬৩

প্রকাশক : ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী : চারু খান

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা-১৩

দাম : আট টাকা

সুইজারল্যাণ্ডের ইউরোপা ভারলাগের সহযোগিতায় প্রকাশিত।

পরমারাধ্য পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

করকমলেষু

ভূমিকা

আপেক্ষিকবাদের আবিষ্কারক বলে আইনস্টাইনের জগৎজোড়া খ্যাতি। তা ছাড়া তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনে পদার্থবিদ্যার অনেক মূলগত সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন বলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মহলে তিনি সকলের নমস্য। যে সমস্ত বিজ্ঞানী পরমাণুর মধ্যে নিহিত শক্তিকে মানবকল্যাণে নিয়োগের জন্য নানাবিধ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন, তাঁদের কাছে আইনস্টাইনের সমীকরণ $E=MC^2$ একরকম বীজমন্ত্র। এরই সাহায্যে হিসাব করা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন আণবিক প্রক্রিয়ার ফলে কত পরিমাণ শক্তির বিকাশ হতে পারে। নিউটনের পর যেমন বিজ্ঞানের এক নবীন যুগের সূত্রপাত হয়েছিল বলে আমরা ধরে থাকি, আইনস্টাইনকে তেমনি বর্তমানে যে যুগ চলছে তার প্রবর্তক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

জাতিতে ইহুদী ছিলেন বলে নিজের জীবনে আইনস্টাইনকে অনেক অসুবিধা এবং অনাচার সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে তাঁর ন্যায়বিচারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিন্দুমাত্র দমিত হয়নি। এই মহাপুরুষ সর্ব সময় ন্যায়ের সপক্ষে নিজের মত অকুণ্ঠ ভাবে ঘোষণা করে এসেছেন এবং এর পরিণামে পুনরায় তাঁকে বহুবিধ নির্যাতন বরণ করতে হয়েছে। যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক রূপে বহু বৎসর যাবত তিনি এক মনে যে দেশের সেবা করেছিলেন, উৎকট জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের কারণে তাঁকে সে দেশ ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় পথচারী পথিক হতে হয়েছিল। বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মান পেলেও স্বজন এবং প্রিয়জন থেকে বহু দূরে প্রবাসে তাঁকে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল।

আইনস্টাইনকে শুধু বিজ্ঞানী বলা চলে না। জাতিবৈষম্য, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্ম ও বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রশ্নে বহু যুগ ধরে মানুষের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজকে যে সব নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, আইনস্টাইন স্বয়ং সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত অনেক প্রবন্ধে বিভিন্ন সময় স্বাধীন ও নির্ভীক ভাবে ব্যক্ত করে গেছেন।

শুধু নীরস গণিত শাস্ত্রই নয়, সঙ্গীত, কলা, সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রও তাঁর মনকে নাড়া দিত এবং তাঁর রচনাবলী পাঠ করলে দেখা যাবে যে, বহু মূল সমস্যাকে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেছেন তার মধ্যে মৌলিকত্ব আছে যথেষ্ট। আর যা লিখেছেন, তার মধ্যে ভাববার কথাও আছে প্রচুর।

পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত থাকলেও তিনি মূলতঃ অহিংসাবাদী। তাই আমাদের ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আদর্শ তাঁকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতি অনেক জটিল প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রবল বেগে হিংসা ও দ্বেষের হলাহল ছড়িয়েছে। যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মানুষ তার সমন্বয় করতে সমর্থ হয়নি এবং এ প্রচেষ্টায় কৃতকার্য হতে না পারলে যে মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে সে ভয়ও অলীক নয়।

শ্রীমান শৈলেশ গান্ধীবাদে বিশ্বাসী। তিনি আইনস্টাইনের নানাবিধ প্রবন্ধের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন এমন কতকগুলি, যাতে আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্বে বিজ্ঞান ছাড়া যে একটি বিশেষ দিক ছিল এবং সেটি যে তাঁর মূল অহিংসাবাদ ও শান্তিবাদের, যা তিনি বিশ্বাস করেন, তার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয়। আমি আশা করি যে চিন্তাশীল পাঠক তাঁর দ্বারা অনূদিত প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে আইনস্টাইনের মত একজন বিরাট্ মানুষের ব্যক্তিত্বের সাহচর্য পাবেন। আমি এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

সত্যেন বোস

অনুবাদকের নিবেদন

পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন বসু মহাশয় লিখিত ভূমিকা এবং আইনস্টাইনের জীবনী ও কৃতি বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধটি (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) পাঠের পর আইনস্টাইনের এই রচনা সংগ্রহের বঙ্গানুবাদের উপক্রমণিকা স্বরূপ বিশেষ আর কিছু বলার থাকতে পারে না। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীর এই রচনা-সংকলনটি প্রধানতঃ কার্ল সীলিগ (Carl Seelig) দ্বারা সম্পাদিত আইনস্টাইনের 'আইডিয়াস এণ্ড ওপিনিয়নস' পুস্তক অবলম্বনে করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর 'দি ওয়ার্লড অ্যাজ আই সি ইট' এবং 'আউট অফ মাই লেটার ইয়ারস' নামক গ্রন্থের কিছু কিছু প্রবন্ধও এই সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। উপরিউক্ত পুস্তক তিনটি ছাড়া ডঃ রাধাকৃষ্ণণ কর্তৃক সম্পাদিত গান্ধীজীর সপ্ততিতম জন্মদিবসে প্রকাশিত 'মহাত্মা গান্ধী' নামক পুস্তক থেকে "দেশনায়ক গান্ধী" প্রবন্ধটি গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের মধ্যে আলোচনার একটি বিবরণ ("আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ") 'বিশ্বভারতী' পত্রিকা থেকে সংকলিত এবং অপরটি ("রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন") 'এসিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। এতদ্ব্যতিরেকে বর্তমান সংকলনে আইনস্টাইনের আরও কয়েকটি ইতঃপূর্বে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাও আছে।

সংকলনটিতে ইচ্ছা করেই বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ বর্জন করা হয়েছে। আইনস্টাইনের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ কেবল বিশেষজ্ঞদের জন্য এবং তাঁদের কাছে বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে এ বিষয় উপস্থাপিত করার প্রয়াস বাহুল্য মাত্র। এবং তা ছাড়া বিজ্ঞানের উপর সে অধিকারও আমার নেই। আমি তাই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে আইনস্টাইনকে উপলব্ধি করার প্রয়াস করেছি এবং ওই দৃষ্টিভঙ্গী চালিত হয়েই প্রবন্ধ নির্বাচন করেছি। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মত মানুষ আইনস্টাইনও সর্বকালে সর্ব দেশে শ্রদ্ধার পাত্র। প্রবন্ধগুলিকে কতকগুলি মোটামুটি বিষয়ের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক ভাবে সাজাবার প্রযত্ন করেছি। এতে তাঁর বিচার-প্রবাহের ক্রম-বিকাশের ধারা উপলব্ধিতে সহায়তা হবে আশা করা যায়। প্রয়োজন বোধে কোথাও কোথাও ঈষৎ সম্পাদনা করতে হয়েছে এবং বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার্থে শীর্ষকের পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে তার ফলে আইনস্টাইনের মূল বক্তব্যের যাতে কোন রকম বিকৃতি না ঘটে, তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

এবার ঋণ স্বীকারের পালা। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম অধ্যাপক সত্যেন বসু মহাশয়ের নামোল্লেখ করতে হয়। আইনস্টাইনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং আমার প্রতি অসীম স্নেহদৃষ্টি ছাড়া আমার নিজের এমন কোন যোগ্যতা ছিল না, যার জন্য

তাঁর মত কর্মযোগীর কাছ থেকে এই পুস্তকের ভূমিকা লেখার জন্য তাঁর বহুমূল্য সময়ের একাংশ দাবি করি। তিনি কেবল এই পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়েই আমাকে অনুগৃহীত করেননি, স্বয়ং আগ্রহ করে আইনস্টাইন সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক প্রবন্ধটিও আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। এর ফলে নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পুস্তকে আইনস্টাইনের যে পৃথক প্রতিকৃতিটি রয়েছে, সেটিও তাঁর কাছে বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠের যে বিশেষ একটি আলোকচিত্র ছিল তারই প্রতিলিপি। কেবল ঋণ স্বীকার ছাড়া অন্য কোন ভাবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের স্পর্ধা করতে পারি না।

পুস্তকের কয়েকটি প্রবন্ধ, বিশেষতঃ যেগুলিতে কোন বিশিষ্ট জ্ঞানের চর্চা আছে, তার অনুবাদের ব্যাপারে স্কটিশ চার্চ কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক কৃষ্ণপদ ঘোষ মহাশয় আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছেন। অধ্যাপক ঘোষ কেবল বৈজ্ঞানিক নন, তিনি দর্শন শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত। তাঁর সাহায্য না পেলে ওই প্রবন্ধগুলি যথাযথ ভাবে অনুবাদ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হত।

আমার অগ্রজ সদৃশ শ্রদ্ধেয় চপলকুমার তালুকদার মহাশয় এই গ্রন্থের অন্যতম পরিকল্পনাকারী এবং রূপকার। এই গ্রন্থের মাল-মশলা সংগ্রহের জন্য আমাকে বিভিন্ন স্থানে যাবার সুবিধা করে দিয়ে রচনা সংকলনটিকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করার কাজে তিনি সহায়তা করেছেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বন্ধুপত্নী শ্রীমতী অঞ্জলি দাশগুপ্ত ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাশগুপ্তের আতিথ্যের নিশ্চিন্ত ছত্রছায়ায় অধিকাংশ অনুবাদকার্য সম্পন্ন করেছি। আমার দুই শ্রদ্ধাভাজন গুরুজন কটকের শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত জনসেবক শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায় আমাকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন। সুহৃৎপ্রবর ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে প্রতিপদে সহায়তা পেয়েছি। শান্তিনিকেতনের শ্রদ্ধেয় সুধীর কর মহাশয়ের কাছেও আমি বহু বিষয়ে ঋণী। এঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্বভারতী পত্রিকার সৌজন্যে শ্রদ্ধেয় কানাই সামন্ত মহাশয় কর্তৃক অনূদিত "আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি এই গ্রন্থে ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছি। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের বদান্যতার ফলে রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের আলোকচিত্রটি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা সম্ভবপর হয়েছে। 'এসিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন" শীর্ষক প্রবন্ধটি অনুবাদের ব্যাপারে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত ওই রচনাটিরই অনুবাদ পাঠে উপকৃত হয়েছি। দিল্লীর গান্ধী মিউজিয়ম এবং শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনের গ্রন্থাগারিক মহাশয়দের বদান্যতায় আমি এই পুস্তকের কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছি। নিউইয়র্কের 'রিপোর্টার' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষ করে শ্রী য়্যালিস ট্রিপ আমাকে

আইনস্টাইনের একটি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা অনুসন্ধানের কাজে খুবই সাহায্য করেছেন। এ সম্বন্ধে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ গান্ধীপন্থী মনীষী রিচার্ড বি. গ্রেগ এবং নিউইয়র্কের ফেলোশিপ অফ রিকনসিলিয়েশনের শ্রী এ. জে. মাস্কের সহায়তার কথাও উল্লেখযোগ্য। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীমন্নারায়ণজী তাঁর সঙ্গে আইনস্টাইনের আলোচনার বিবরণ প্রকাশ করতে দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সহৃদয়তার ফলে আইনস্টাইন সম্পর্কে অধ্যাপক সত্যেন বসু মহাশয়ের প্রবন্ধটি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি। অনুবাদের কাজ অনেকদিন পূর্বে সমাপ্ত হলেও শ্রীযুক্ত মেহ্‌রার মত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম অনুরাগী ও বিদগ্ধ রুচির প্রকাশকের শরণ না পেলে আমার এই প্রয়াস যে আরও কতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকত তা কে জানে? অর্থকারী মনোভাবের প্রাবল্যের দিনে তাঁর মত সুরুচিসম্পন্ন প্রকাশক, যিনি অর্থোপার্জনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কর্তব্যজ্ঞানে সৎসাহিত্যের প্রচার করছেন, তাঁর আনুকূল্য পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। সাহিত্যিক ও সমালোচক বন্ধু শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী অশেষ পরিশ্রম করে গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন।

সর্বশেষে উল্লেখ করলেও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, আইনস্টাইনের মূল জার্মান রচনাবলীর প্রকাশক সুইজারল্যাণ্ডের "ইউরোপা ভারলাগ" (Europa Verlag) কোম্পানীর কাছ থেকে পদে পদে সহায়তা না পেলে এই গ্রন্থ সংকলন বা অনুবাদ করা সম্ভব হত না। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বর্তমান যুগের এক মহাজ্ঞানীর মানসিক গঠন ও তাঁর অন্তর্লোকের পরিচয় পাবার ব্যাপারে যদি এই গ্রন্থ সহায়ক প্রমাণিত হয় তা হলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বুঝব।

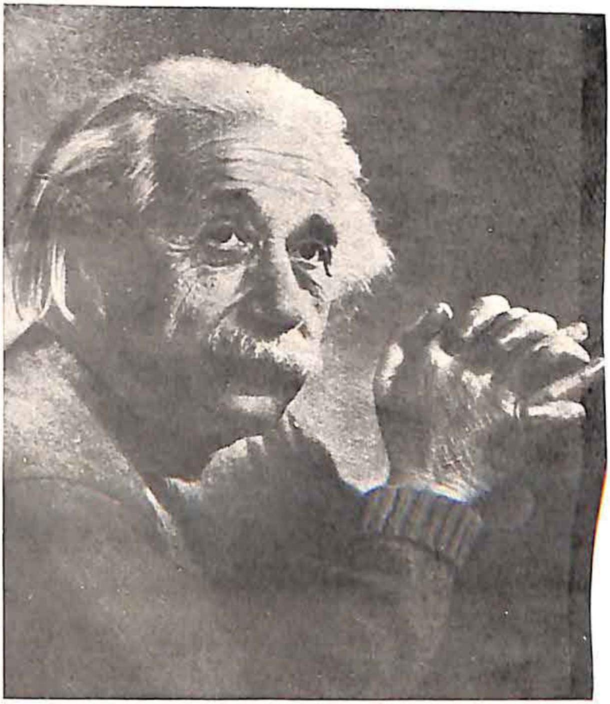
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ — শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ইহুদীদের কথা

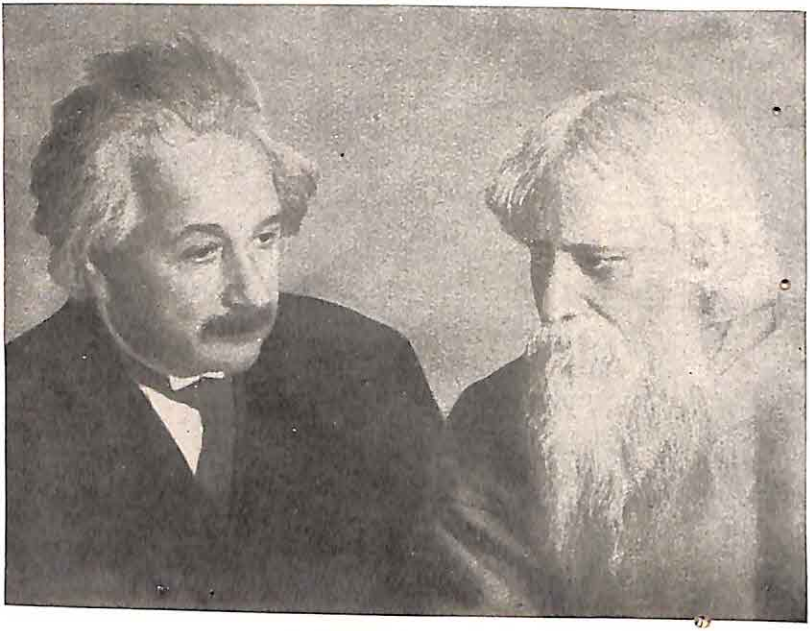
বিবিধ

পরিশিষ্ট





[জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র সৌজন্যে]



আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ

[বিশ্বভারতী ও ভারত ফোটোটাইপ-এর সৌজন্যে]

অভিমত

স্বর্গ হইতে বিদায়

সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপের পণ্ডিত সমাজ এবং শিল্পিগণ এক সর্বজনমান্য আদর্শবাদের বন্ধনে এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধ ছিলেন যে সেকালে রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের দ্বারা ক্বচিৎ তাঁদের পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যাহত হত। সাধারণ ভাবে লাতিন ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় এই ঐক্য অধিকতর শক্তিশালী হয়েছিল।

আজ ওই অবস্থার কথা চিন্তা করলে মনে হয় যে, আমাদের যেন স্বর্গ হতে বিদায় দেওয়া হয়েছে। জাতীয়তাবাদের মোহাবেশ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিরাজিত এই ঐক্যবন্ধন বিনষ্ট করেছে এবং একদা যে লাতিন ভাষা সমগ্র পৃথিবীকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল তা আজ মৃত। বিদ্বৎ-সমাজ আজ চূড়ান্ত উগ্র জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের ধারক হয়েছেন এবং তাঁদের ভিতর পুরাতন বুদ্ধিভিত্তিক রাষ্ট্রসমবায় (commonwealth) ভাবনা আর নেই।

বাস্তবপন্থী নামে আখ্যাত রাজনীতিবিদ্‌রা আজ আন্তর্জাতিক ভাবধারার ধ্বজাধারক—আমাদের এই হতাশাজনক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এঁরাই আবার লীগ অফ নেশনসের স্রষ্টা।

[১৯১৯]

আমার দৃষ্টিতে এই জগৎ

আমাদের মত এই মরণশীল জীবের অবস্থা কী বিচিত্র! এই ধরাতলে অত্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য আমাদের আগমন। কেন যে মানুষ এ পৃথিবীতে আসে, তা সে জানে না; যদিচ সময় সময় এই কারণ অনুভব করেছে বলে সে ভাবে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির খুব গভীরদেশে না গিয়েই বলা যায় যে, আমাদের অস্তিত্ব আমাদের সাথীদের জন্য। প্রথমতঃ যাদের মুখের হাসি ও কল্যাণভাবনার উপর আমাদের সুখশান্তি নির্ভর করে এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের অপরিচিত যে সব শত সহস্র ব্যক্তির ভাগ্যের সঙ্গে সমবেদনাসূত্রে আমরা যুক্ত, তাদের সকলেরই জন্য আমাদের বেঁচে থাকা। প্রত্যহ শতাবধি বার আমি নিজেকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিই যে, আমার অন্তর্লোক ও বাহ্য-জীবন জীবিত ও মৃত বহু ব্যক্তির শ্রমের ফলে পরিপুষ্ট এবং মনে করি যে, তাদের কাছ থেকে আমি যে ভাবে গ্রহণ করেছি ও করছি, সেই ভাবে নিজেকেও বিকীর্ণ করে দেওয়া উচিত। সরল জীবনযাত্রা পদ্ধতির প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ এবং মাঝে মাঝে এই ভাবনা আমাকে পীড়িত করে যে, আমার সাথী-ভাইদের অনেকখানি পরিশ্রম আমি অন্যায়

ভাবে আত্মসাৎ করছি। শ্রেণী-বৈষম্যকে আমি ন্যায়বিচারবিরোধী ও হিংসা-আধারিত বলে মনে করি। আমার মতে দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই সরল জীবনযাত্রা সকলের পক্ষে মঙ্গলকর।

মানব-স্বাধীনতার দার্শনিক ব্যাখ্যায় আমার তিলেক আস্থা নেই। শুধু বাহ্য অবস্থার চাপেই মানুষ কাজ করে না, অন্তরের তাগিদেও সে কাজ করে। শোপেনহাওয়ার বলেছিলেন, "মানুষ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারে; কিন্তু ইচ্ছা অনুযায়ী ইচ্ছা করতে পারে না।" আমার যৌবনকাল থেকে অদ্যাবধি এই মহাজনবাক্য আমাকে প্রেরণা দিয়েছে এবং আমার নিজের ও অন্যান্যের জীবনের দুঃখ-দুর্দৈবের সামনে ওই বাণী এক নিত্যকালের সান্ত্বনা ও সহিষ্ণুতার চির-বহমান-উৎস বলে মনে হয়েছে। যে দায়িত্ববোধের পাষাণভার হেতু সহজেই আমরা মানসিক বৈকল্যের শিকার হই, এই ধারণার কৃপায় তার কথঞ্চিৎ হ্রাস হয় এবং এরই দৌলতে আমরা নিজেদের ও অন্যান্য সকলকে খুব একটা গুরুগম্ভীর ভাবে বিচার করা থেকে বিরত থাকি। সর্বোপরি এই ধারণা জীবনের এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সাহায্য করে, যেখানে রসরসিকতার যথাযোগ্য স্থান আছে।

নিজের বা এই সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির অস্তিত্বের অর্থ বা উদ্দেশ্যের অন্বেষণ তন্নিষ্ঠ (objective) দৃষ্টিকোণ থেকে আমার কাছে বরাবর অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। তবু প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু আদর্শ থাকে এবং এই আদর্শই তার কর্মপ্রচেষ্টা ও বিচারের গতিপথ নির্ধারণ করে। এই অর্থে আয়েস বা স্বাচ্ছন্দ্যকে আমি কখনই জীবনের এক চরম ধ্যেয় বলে মনে করি নি। জীবনের এ-জাতীয় ভিত্তিভূমি আমার মতে বরং একপাল শূকরকেই মানায়। যে আদর্শবাদের প্রজ্বলিত বর্তিকা আমার যাত্রাপথকে আলোকিত করেছে এবং প্রতিনিয়ত যা আমাকে সহর্ষে জীবনের সম্মুখীন হবার সাহস জুগিয়েছে, তা হচ্ছে "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"। অনুরূপ মনোভাবের সঙ্গী-সাথীদের সাহচর্য না পেলে, এই উদ্দেশ্যে বিভোর হয়ে না থাকলে, এবং শিল্পকলা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার শাশ্বত অপ্রাপ্তব্য রহস্যের আভাস না পেলে জীবন আমার কাছে শূন্য হয়ে যেত। লোকচক্ষে মানবীয় প্রচেষ্টার মানদণ্ডরূপে পরিগণিত ঐশ্বর্য, বাহ্যিক সাফল্য ও বিলাস-ব্যসন ইত্যাদি সব কিছু সর্বদা আমার কাছে নগণ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

আমার সুগভীর সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে আমার অন্যান্য ব্যক্তি বা মানব সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজনবন্ধন থেকে সুউচ্চারিত মুক্তিকামনা মোটেই খাপ খায় না। আমার চলার পথে আমি নিঃসঙ্গ পান্থ এবং নিজ দেশ, গৃহ, বন্ধুবান্ধব বা একান্ত অন্তরঙ্গ পরিবারের সঙ্গেও আমি সর্বান্তঃকরণে একাত্ম হতে পারি নি। এই সব বন্ধন-ডোরের সামনে আমি

কদাপি আমার একরোখা অসম্পৃক্ত ভাব, নিভৃতি-পিপাসা প্রকাশ করতে ছাড়ি নি। আর দেখেছি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই মনোভাব আরও বাড়ছে। অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে হৃদয়-বিনিময় ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনের পথে এ কত বড় অন্তরায় সে বিষয়ে আমি তীব্র ভাবে সচেতন; তবু আমার কোন খেদ নেই। নিঃসন্দেহে এরকম লোকের সংবেদন বৃত্তির কথঞ্চিৎ সংকোচন হয় এবং তার মনোবীণায় লঘু সুরের দোলা লাগে না। পক্ষান্তরে, সে তার সঙ্গী সাথীদের চিন্তাধারা, অভিমত ও অভ্যাসের প্রভাব থেকে বহুলাংশে মুক্ত থাকে এবং এই-জাতীয় ক্ষণভঙ্গুর বুনিয়াদের উপর নির্ভর করার প্রলোভন পরিহার করতে পারে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ব্যক্তি হিসাবে যেন প্রত্যেকের সম্মান করা হয় এবং কাউকে যেন দেবতা বানানো না হয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, নিজের কোন দোষ বা গুণ বিনাই আমি আমার সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে অত্যধিক প্রশস্তি ও শ্রদ্ধা পেয়েছি। নিরবধি প্রচেষ্টা দ্বারা দু একটি বিষয় বোঝার মত যৎসামান্য ক্ষমতা আমি আয়ত্ত করেছি। এইটা অনেকে পেরে ওঠেন না বলেই বোধহয় আমার এত সম্মান। এ কথা আমি ভাল ভাবেই জানি যে, কোন জটিল কার্যের সাফল্যের জন্য একজন লোকের উপরই সে সম্বন্ধে চিন্তন ও পরিচালন ভার থাকা উচিত এবং কাজের মোটামুটি দায়িত্বও তাঁর উপর থাকা প্রয়োজন। তবে যারা পরিচালিত হবে, তাদের বাধ্য করা চলবে না। নায়ক নির্বাচনের সুযোগ তাদের থাকা চাই। আমার বিশ্বাস আনুগত্য আদায় করার স্বৈরতন্ত্রী প্রথা শীঘ্র কলুষিত হয়। কারণ হিংসাশক্তি সর্বদাই নিম্নস্তরের নীতিজ্ঞান বিশিষ্ট লোকেদের আকর্ষণ করে এবং এ কথা আমি এক অপরিহার্য বিধান বলে বিশ্বাস করি যে, প্রতিভাশালী স্বৈরতন্ত্রীদের উত্তরসাধকরা অপদার্থ হয়ে থাকে। এই কারণে আজকের ইটালী ও রাশিয়ায় যে ব্যবস্থা চলেছে, আমি বরাবর তার ঘোরতর বিরোধী। বর্তমানে ইউরোপে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির যে কারণে দুর্নাম, তার জন্য গণতান্ত্রিক আদর্শকে দোষ দেওয়া চলে না। রাষ্ট্রনায়কদের নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা এবং নির্বাচন পদ্ধতির নৈর্ব্যক্তিক রূপ এর মূলে রয়েছে। আমার মনে হয় এ দিক থেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সঠিক পন্থা আবিষ্কার করেছে। তারা বেশ দীর্ঘ দিনের জন্য একজন দায়িত্বশীল প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করে এবং সত্যকার দায়িত্বশীল হবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার যে অংশ আমি সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করি তা হচ্ছে অসুস্থতা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার ব্যাপকতর অধিকার। আমার মতে মানবের জীবন-নাট্যপ্রবাহে সত্যকার মূল্যবান জিনিস রাষ্ট্র নয়, তা হচ্ছে সৃজনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব। যা কিছু

মহৎ, তার স্রষ্টা ব্যক্তি ; অন্তর্বৃত্তির বন্ধন মোচন করার ক্ষমতা রাখে ব্যক্তি। পক্ষান্তরে গোষ্ঠীভাবনা চিন্তা এবং সংবেদনশীলতা—উভয় ক্ষেত্রেই রসস্পর্শহীন থেকে যায়।

এ প্রসঙ্গে গোষ্ঠীপ্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ঘৃণার্হ সৃষ্টি ও আমার একান্ত অপ্রিয় সামরিক প্রথার কথা আসে। কেউ যে বাজনার তালে তালে সারিবদ্ধ হয়ে কুচকাওয়াজ করায় আনন্দ পেতে পারে—এইটুকু জানাই তার উপর আমার ভক্তি চটে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। ভুল করে তাকে একটা বড় আকারের মস্তিষ্ক দেওয়া হয়েছে ; শুধু মেরুদণ্ডতেই তার কাজ চলে যেত। সভ্যতার এই দুষ্টক্ষতের অতি দ্রুত অপসারণ প্রয়োজন। হুকুম মোতাবেক সাহস দেখানো, কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংসা এবং স্বদেশপ্রেমের নামে আর যে সব চূড়ান্ত মূর্খতা চলে, আমি তা মনে প্রাণে ঘৃণা করি। যুদ্ধ আমার কাছে এক হীন ও ন্যক্কারজনক ব্যাপার বলে মনে হয়। এরকম ঘৃণ্য ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার চেয়ে আমি বরং ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে রাজী আছি। আমায় টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেও আমার দ্বারা এ কাজ হবার নয়। এসব সত্বেও মানবজাতি সম্বন্ধে আমার অভিমত এত উচ্চ যে আমি বিশ্বাস করি, বণিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ধারক ও বাহক দল কর্তৃক বিভিন্ন জাতির সুবুদ্ধি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে দূষিত না হলে বহু পূর্বেই এই জুজু অদৃশ্য হত।

আমাদের অনুভূতির সীমানায় সবচেয়ে সুন্দর যে বস্তু ধরা দেয় তা হচ্ছে রহস্যময়তার চেতনা। সত্যকার চারুকলা এবং সত্যকার বিজ্ঞানের প্রথম সোপানে রয়েছে এই মৌলিক আবেগ। এ আবেগের সঙ্গে যার পরিচয় নেই, যে আর বিস্মিত হয় না বা আশ্চর্যবোধ করে না, সে মৃত। সে নির্বাপিত দীপশিখা। রহস্যের এই উপলব্ধিই ধর্মের জন্ম দিয়েছিল। হয়তো সেই রহস্যের বোধের মধ্যে কিছু ভীতি মিশ্রিত ছিল। আমাদের বোধাতীত এক সত্তার অস্তিত্বের উপলব্ধি এবং এই বিশ্বে যুক্তির সূক্ষ্মতম বিকশিত রূপ ও সুন্দরতমের যে চিরনিত্য অভিপ্রকাশ চলেছে, তার ধারণার পরিমাপ চলে শুধু আমাদের যুক্তিপদ্ধতির প্রাথমিক পর্যায়ে। এই অনুভূতি এবং এই আবেগই খাঁটী ধর্মীয় আচরণের ভিত্তিমূল। এই অর্থে, মাত্র এই অর্থেই, আমি গভীর ধর্মবিশ্বাসী। আমি এমন এক ঈশ্বরের কল্পনা করতে পারি না, যিনি তাঁর সৃষ্ট জীবদের পুরস্কার ও শাস্তি দেন বা আমাদের মত যাঁর ইচ্ছাশক্তি আছে। মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তির সূক্ষ্ম দেহে জীবিত থাকার ব্যাপার আমার ধারণার বহির্ভূত, আর আমি চাইও না যে এ রকম হোক। এ-জাতীয় ধারণা ভীতিসঞ্জাত বা দুর্বল প্রকৃতির লোকের মিথ্যা অহমিকাপ্রসূত। চিরন্তন জীবনপ্রবাহরহস্য, বাস্তবের অনিন্দ্যসুন্দর রূপের অস্পষ্ট দর্শন এবং তৎসহ এই বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর

লীলায়িত যুক্তিতরঙ্গের নাতিক্ষুদ্র একটুখানি অংশের উপলব্ধির একাগ্র সাধনা—এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

[১৯৩১]

বিজ্ঞান ও সভ্যতা

আজকের মত সর্বব্যাপী আর্থিক দুর্দশার দিনেই মানুষের ভিতরকার নৈতিক শক্তির কার্যক্ষমতা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। আমরা আশা করব যে, রাজনৈতিক ও আর্থিক্ দিক থেকে সম্মিলিত উত্তরকালীন ইউরোপের ঐতিহাসিকরা পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে রায় দান প্রসঙ্গে যেন এ কথা বলতে পারেন যে আমাদের যুগে মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ও মর্যাদা পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক রক্ষিত হয়েছিল। ইতিহাসে যেন লিখিত থাকে যে উৎপীড়ন এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রচারের শতবিধ প্রলোভনের বিরুদ্ধে দারুণ দুঃসময়েও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি নিজ আদর্শে অবিচল ও দৃঢ়নিষ্ঠ ছিল। উত্তরকাল ঘোষণা করুক যে, পশ্চিম ইউরোপ সাফল্য সহকারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল, যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সহায়ে জ্ঞান ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবর্তমানে আত্মসম্মানবিশিষ্ট কোন নাগরিক জীবনধারণ করা কাম্য মনে করে না।

বহু বৎসর যাবৎ যে জাতি আমাকে আপনার মনে করেছে, আজ তার আচরণের বিচার করতে বসা আমার পক্ষে সাজে না। আর তা ছাড়া কাজের সময়ে বসে বসে বিচার করা বোধ হয় অলসতার পরিচায়ক।

আজ নিম্নোক্ত প্রশ্ন আমাদের হৃদয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আলোড়ন তুলেছে: মানবজাতি এবং তার যে আধ্যাত্মিক সম্পদের আমরা উত্তরাধিকারী, কিভাবে তাকে রক্ষা করা যায়? কোন্ উপায়ে ইউরোপকে এক নূতন সংকটের হাত থেকে বাঁচানো যায়?

এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না যে, বিশ্বব্যাপী মন্দা এবং সেই মন্দার কারণে দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন বর্তমানের ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব সমূহের জন্য কতকাংশে দায়ী। এইরকম সময়ে অসন্তোষের ফলে ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব বৃদ্ধি পায় এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষ আবার হিংসা, বিপ্লব, এমনকি কখনও কখনও যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে। এইভাবে এক দুঃখ-দুর্দশা নূতন দুঃখ-দুর্দশার জন্ম দেয়। তারপর মুখ্য রাষ্ট্রনায়কদের উপর আজ ভীষণ দায়িত্বভার পড়েছে। কুড়ি বৎসর পূর্বে তাঁদের উপর এই-জাতীয় গুরুভার পড়েছিল। আমরা আশা করব, তাঁরা যেন সময় থাকতে ইউরোপে ঐক্যাবস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় উপনীত হন। তা হলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই জঙ্গী মনোবৃত্তি ও কাজ একেবারে

অসম্ভব হয়ে পড়বে। তবে রাষ্ট্রনায়কদের প্রচেষ্টা তখনই ফলবতী হয়, যখন তার পিছনে জনসাধারণের সুচিন্তিত ও দৃঢ়ভাবে অভিব্যক্ত ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশীল থাকে।

শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি বজায় রাখার কার্যকর সমস্যাই কেবল আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় নি, জনসাধারণকে শিক্ষাদান এবং তাদের সজাগ ও সচেতন করার গুরু দায়িত্বও আমাদের উপর পড়েছে। চিত্তের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবলোপী শক্তিসমূহের প্রতিরোধ করা যদি আমাদের কাম্য হয়, তা হলে প্রত্যাসন্ন সংকট সম্বন্ধে আমাদের মনে স্বচ্ছ ধারণা থাকা চাই এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ কঠোর সংগ্রাম দ্বারা আমাদের জন্য যে স্বাধীনতা অর্জন করে গেছেন, তার মূল্য সম্বন্ধেও সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

এই স্বাধীনতা না থাকলে সেক্সপীয়র, গ্যেটে, নিউটন, ফ্যারাডে, পাস্তুর বা লিস্টারের উদ্ভব সম্ভবপর হত না। জনসাধারণ বাসোপযোগী স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ গৃহ পেত না, রেলওয়ে ও বেতারের প্রচলন হত না, মহামারীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় অনাবিষ্কৃত থাকত, স্বল্পমূল্যে গ্রন্থাদি পাওয়া দুর্ঘট হত, এবং শিল্প সংস্কৃতির উপভোগ সর্বজনসুলভ হত না। জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর শ্রমের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য কোন যন্ত্রের আবিষ্কারও সম্ভবপর হত না। প্রাচীনকালের এসিয়ায় স্বৈরতন্ত্রী শাসকদের অধীনে জনগণের যে চরম দুরবস্থা ছিল, অধিকাংশ মানুষই আজ তা হলে সেই অবস্থায় দিনাতিপাত করত। একমাত্র স্বাধীন ও মুক্ত মানবই নব নব আবিষ্কার ও চিৎপ্রকর্ষবিধায়ক সৃষ্টিকার্যে সক্ষম, এবং এই সব আবিষ্কার ও সৃষ্টিই আমাদের আধুনিক মানবসমাজের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলেছে।

বর্তমান আর্থিক মন্দা জনিত বিপত্তি নিঃসন্দেহে শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করবে যখন শ্রম-শক্তির চাহিদা ও জোগান এবং উৎপাদন ও উপভোগের (consumption) ভিতর আইনদ্বারা সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। কিন্তু স্বাধীন মানব রূপেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। এর সমাধানের জন্য কৃতদাসের পর্যায়ে নেমে গেলে চলবে না। কারণ তা হলে শেষ অবধি যাবতীয় সুস্থ বিকাশের গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

[১৯৩৩]

"ইউরোপ কি সফলকাম হয়েছিল ?"

মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, নিছক প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা না করে চিন্তার বিষয়মুখীনতার (odjectivity) জন্য প্রয়াস এবং মতামত ও রুচির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি লক্ষণাবলীর সঙ্গে

ইউরোপের মানবতাবাদী আদর্শ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পূর্বোক্ত গুণাবলী এবং আদর্শ ইউরোপীয় স্বভাব-ধর্মের বৈশিষ্ট্য। যুক্তি দিয়ে এই সব মূল্যবোধ (values) এবং নীতির সার্থকতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ এগুলি হচ্ছে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে মৌলিক আদর্শ স্থানীয় এবং এগুলি মানা বা না মানা হৃদয়াবেগের এলাকাভুক্ত ব্যাপার। আমি কেবল এইটুকু জানি যে, আমার সমগ্র আত্মার প্রবলতা দিয়ে আমি পূর্বোক্ত মূল্যবোধগুলি মান্য করি এবং যে সমাজ ক্রমাগত ওই মূল্যবোধগুলিকে অস্বীকার করে, আমার পক্ষে তেমন সমাজের আওতায় টিকে থাকা অসহ্য বোধ হত।

আমি সেই সব নৈরাশ্যবাদীদের সঙ্গে সহমত নই যাঁরা মনে করেন যে, বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশ কোন না কোন প্রকারের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন দাসত্বের আধারের উপর নির্ভরশীল। যন্ত্র-কৌশলের প্রগতির আদিম যুগে জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য পণ্যসম্ভার উৎপাদনের জন্য অধিকাংশ মানুষকে যখন অমানুষিক দৈহিক শ্রম করে তাদের কর্মশক্তি প্রায় নিঃশেষ করে ফেলতে হত তখন হয়তো এ কথা সত্য ছিল। কিন্তু একালে যন্ত্র-কৌশলের অসীম প্রগতি হওয়ার ফলে মোটামুটি ন্যায়সঙ্গতভাবে শ্রম বিভাজন করা যেতে পারে এবং সকলের মধ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বণ্টিত হতে পারে। তাই বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় দক্ষতা ও অভিরুচি অনুযায়ী সূক্ষ্মতম মননশীল ও শৈল্পিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করার উপযুক্ত সময় ও শক্তির অভাব হবার কারণ নেই। অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে এই অবস্থার কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারে এমন পরিবেশ আমাদের সমাজে নেই। তবে ক্রমাগত অধিকসংখ্যক বিবেচক ব্যক্তিরা যে ইউরোপীয় আদর্শের রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তা ও বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হচ্ছেন, আমরা আশা করব যে ইউরোপীয় আদর্শের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তিই প্রাণপণ চেষ্টা করে তাকে মূর্ত করে তুলবেন।

আর্থিক প্রগতির কঠিন চেষ্টাকে জয়যুক্ত করবার জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শকে কি সাময়িকভাবে বর্জন করা উচিত? জোরজবরদস্তি ও আতঙ্কবাদের রাজত্বের সাফল্যের তুলনামূলক আলোচনা করার সময় জনৈক সংস্কৃতিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী রুশ পণ্ডিত অত্যন্ত দক্ষতাসহকারে আমার কাছে এর সমর্থন করছিলেন। তিনি বলছিলেন যে অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় এটা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ তিনি যুদ্ধপরবর্তী রাশিয়ার সাম্যবাদের সাফল্য ও জার্মান সোশাল ডেমোক্রাসীর ব্যর্থতার কথা বলেন। তাঁর যুক্তি আমাকে প্রভাবিত করতে পারে নি। আমার কাছে কোন আদর্শই এমন মহান্ নয় যার রূপায়ণের জন্য অনুচিত পন্থার শরণ নেওয়া সমর্থন করা চলতে পারে। হিংসা হয়তো কোন কোন সময়ে ত্বরিৎগতিতে পথের বাধা দূর করেছে; কিন্তু কখনও তা সৃষ্টিধর্মী বলে প্রতিপন্ন হয় নি।

[১৯৩৪]

ভাল ও মন্দ

মনুষ্যজীবন ও মানবজাতির উত্থানের জন্যে যাঁদের অবদান সর্বাধিক, তাঁরা সকলের কাছে সবচেয়ে বেশী ভালবাসা পাবেন—নীতি হিসাবে এ কথা যথার্থ। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে কারা এই রকম লোক, তা হলে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। রাজনৈতিক নেতারা, শুধু তাই নয় ধর্মীয় নেতারাও, বেশী ভাল করেছেন না মন্দ করেছেন, এ কথা বলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, জনসাধারণের সেবা করার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে তাদের উন্নত করে তুলতে পারে এমন কোন রকম কর্মসূচী তাদের দেওয়া এবং এই ভাবে পরোক্ষ উপায়ে তাদের উত্থান ঘটানো। মহান্ কলাকারদের ক্ষেত্রে অতি মাত্রায় এবং বিজ্ঞানীদের পক্ষেও কথঞ্চিৎ মাত্রায় এ কথা প্রযোজ্য। ফলতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ফল মানুষের উত্থান ও তার স্বভাবের সমৃদ্ধি ঘটায় না ; সৃষ্টিধর্মী এবং গ্রহণধর্মী বুদ্ধিবৃত্তির অবদান হৃদয়ঙ্গম করার আকাঙ্ক্ষা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উদাহরণতঃ বুদ্ধিগত ফলের মানদণ্ডে "তালমুদ"কে* পরিমাপ করতে যাওয়া নিশ্চয় একটা অবাস্তব ব্যাপার।

অহং ভাব থেকে মানুষ কতখানি মুক্ত হয়েছে সেই অর্থে এবং সেই মানদণ্ডেই মূলতঃ মানুষের সত্যকার মূল্য যাচাই হয়।

[১৯৩৪]

সমাজ ও ব্যক্তিত্ব

আমাদের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টার পরিমাপ করতে যখন আমরা যাই, শীঘ্রই এটা চোখে পড়ে যে, আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ ও ইচ্ছা অন্যান্য মানবের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের সমগ্র স্বভাব সামাজিক জীবদের স্বভাবের অনুরূপ। যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তা অপর কেউ উৎপাদন করেছে, আমাদের পরিধেয় অন্য কারও দ্বারা উৎপন্ন, বাসগৃহ অপর ব্যক্তি দ্বারা নির্মিত। আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের অধিকাংশ আমরা অন্যান্য ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়েছি এবং এর মাধ্যম মানুষের ভাষাও অপরাপর ব্যক্তির সৃষ্ট। ভাষা না হলে আমাদের মানসিক ক্ষমতা অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর তুলনায় নিঃসন্দেহেই নিম্নস্তরের হত। সুতরাং আমাদের এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, মানব-সমাজে বাস করার দৌলতেই আমাদের অবস্থা মূলতঃ অন্যান্য জীবের চেয়ে উন্নত। কোন ব্যক্তিকে জন্মমুহূর্ত থেকে একলা ছেড়ে দিলে চিন্তা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে সে এমন এক আদিম ও পশু-প্রায় অবস্থায় থেকে যেত, যা কল্পনা করা কঠিন। ব্যক্তি যা তা-ই এবং তার যে

---

* ইহুদীদের রচিত মৌখিক আইন-কানুনের এক বিরাট সংকলন।

মূল্য তা তার ব্যক্তিত্বের কারণে ততটা নয় যতটা সে এই মহান্ মানব-সমাজের অঙ্গ বলে। এই সমাজ তার আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বকে শিশু-বিহারের প্রথম ধাপ থেকে সমাধিভূমি পর্যন্ত চালিত করে।

মানুষের ভাবনা-চিন্তা এবং কার্যকলাপ যে পরিমাণে তার সঙ্গী-সাথীদের হিতার্থে প্রযুক্ত হয়, তারই উপর সমাজের নিকট তার মূল্য নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে তার আচরণ দেখে তাকে আমরা ভাল বা মন্দ আখ্যা দিয়ে থাকি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেন মানুষের সামাজিক গুণাবলীর উপরই তার মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

তবু এ-জাতীয় মনোভাব পোষণ করা ভুল হবে। এ কথা স্পষ্ট যে, আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের কাছ থেকে আমরা যে অবদান পেয়ে আসছি তার উৎস হচ্ছে অগণিত যুগের সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার সমবায়। আগুনের ব্যবহার, খাদ্যোপযোগী গাছপালার চাষ, বাষ্পীয় এঞ্জিন ইত্যাদি প্রত্যেকটিই এক একজন মানুষের আবিষ্কারের ফল।

ব্যক্তিই কেবল চিন্তা করতে সমর্থ ও এইভাবে সে সমাজের পক্ষে নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি এমন নূতন নৈতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে পারে, গোষ্ঠী-জীবন যাকে গ্রহণ করে সার্থক হয়। জীবনরসের আকর গোষ্ঠীর বুনিয়াদ ছাড়া যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশের কথা চিন্তা করা যায় না, তেমনি সৃষ্টিশীল স্বাধীন চিন্তক ও বিচারক ব্যক্তি ছাড়া সমাজের ঊর্দ্ধগতি অকল্পনীয়।

সুতরাং সমাজ-দেহের প্রাথমিক একম্ স্বরূপ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তি-সমবায়ের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সংহতি—উভয়ই সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য সমরূপে প্রয়োজন। এ কথা বলা যথার্থ যে, সমগ্র ভাবে গ্রীক-ইউরোপীয়-আমেরিকান সংস্কৃতি এবং বিশেষতঃ মধ্যযুগের ইউরোপের অচলায়তনভঙ্গকারী এর যে মনোরম ধারাটি ইতালীয় রেনেসাঁস্ নামে আখ্যাত, ব্যক্তির মুক্তি ও আপেক্ষিক নিঃসঙ্গতা হচ্ছে তার ভিত্তিমূল।

এবার বর্তমান যুগের কথা বিচার করা যাক। এখানে সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ কি? সভ্যদেশ সমূহে জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একশত বৎসর পূর্বের তুলনায় আজ ইউরোপের জনসংখ্যা তিনগুণ অধিক। কিন্তু মহাপুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। জনসাধারণ মাত্র দু চারজন লোককে তাঁদের সৃষ্টিধর্মী অবদানের কারণে জানে। প্রতিষ্ঠান কতকাংশে মহা-মানবদের স্থান গ্রহণ করেছে। যন্ত্রকৌশলের ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞানজগতে এটা মুখ্যতঃ সুস্পষ্ট।

বিশেষ করে শিল্পকলার ক্ষেত্রে নাম করার মত কৃতী পুরুষের অভাব চোখে পড়ে।

চিত্রকলা ও সঙ্গীত নিশ্চিত রূপে অধোগামী হয়েছে এবং জনসাধারণের কাছে তাদের মর্যাদার হ্রাস হয়েছে। রাজনীতিতে শুধু নেতারই অভাব নয়, নাগরিকদের ভিতরও স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং ন্যায়বিচারের প্রতি আগ্রহ যথেষ্ট পরিমাণে কমে গেছে। স্বাধীনতার উপরিউক্ত ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা বহু স্থলে তছনছ হয়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে একনায়কত্ব মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ও তাকে বরদাস্ত করা হচ্ছে। ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধীয় ভাবনা আর মানুষের মনে যথেষ্ট প্রবল নয়, সেইজন্য এই অবস্থা। সংবাদপত্রগুলি পক্ষকালমধ্যে মেষপালের ন্যায় জনসাধারণকে এমন ভাবে তাতিয়ে আগুন করতে পারে যে জনকয়েক লোকের তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা উর্দি গায়ে চড়িয়ে মারতে ও মরতে প্রস্তুত হয়। আজ সভ্য মানব-সমাজ ব্যক্তির মর্যাদাহানির যে রোগে ভুগছে, আমার মতে তার সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য উপসর্গ হচ্ছে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি। তাই মনীষীরা যখন আমাদের সভ্যতার দ্রুত বিলুপ্তির কথা বলেন তখন আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু দেখি না। আমি অবশ্য এ-জাতীয় নৈরাশ্যবাদীর দলে নই; আমি বিশ্বাস করি সুদিন আসছে। আমার বিশ্বাসের কারণ সংক্ষেপে ব্যক্ত করব।

আমার মতে বর্তমানে যে অবনতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে, তার মূলে আছে শ্রম-শিল্প ও যন্ত্রের বিকাশ জনিত জীবনসংগ্রামের অভূতপূর্ব তীব্র রূপ। এর ফলে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ প্রচণ্ড ভাবে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু যন্ত্রের উন্নতির পরিণামে সমাজের প্রয়োজনপূর্তির জন্য ব্যক্তিকে ক্রমেই কম পরিশ্রম করতে হচ্ছে। সুতরাং সুপরিকল্পিত শ্রমবিভাজনের দাবি ক্রমশঃ মুখর হচ্ছে এবং এই বিভাজনের ফলে ব্যক্তির আধিভৌতিক নিরাপত্তার পথ প্রশস্ত হবে। এই নিরাপত্তা এবং ব্যক্তির হাতে যে অবকাশ ও উদ্বৃত্ত কর্মোদ্যম থাকবে, তার দ্বারা তার প্রগতি হবে। এই ভাবে মানবসমাজ তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং আমরা আশা করব যে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক আজকের অস্বাস্থ্যকর উপসর্গের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলবেন যে, ও ছিল সভ্যতার অত্যন্ত দ্রুতগতির কারণে প্রগতিকামী মানবসমাজের শৈশবকালীন ব্যাধি।

[১৯৩৪]

সম্পদ্ সম্বন্ধে

আমার এই দৃঢ় প্রতীতি হয়েছে যে, অত্যন্ত নিষ্ঠাশীল কর্মীর হাত দিয়ে ব্যয় হলেও কোন জাগতিক ধনসম্পদ্ মানবতার প্রগতি সাধন করতে পারে না। মহান্ ও পবিত্র চরিত্রের উদাহরণই একমাত্র বস্তু, যা সৎ ভাবনা ও মহান্ কর্মের জন্ম দিতে পারে। অর্থ শুধু স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করে ও সর্বদা এর মালিককে এর অসদুপযোগ করার জন্য দুর্নিবার ভাবে প্ররোচিত করে।

মোজেস, যীশু বা গান্ধীর হাতে কার্নেগীর টাকার থলি রয়েছে—এ কথা কি কেউ কখনও কল্পনা করতে পারে?

[১৯৩৪]

বিজ্ঞানের দুর্দশা

জার্মানভাষী দেশসমূহ এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। তাই এ সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তিদের প্রবলভাবে এর প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা কর্তব্য বলে আমি মনে করি। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যে আর্থিক বিপর্যয় জড়িত, তা সকলকে সমভাবে আঘাত করে না। যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র-নির্ভর, তারাই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশী। বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মীরা এই শ্রেণীতে পড়েন। অথচ এদেরই কার্যকলাপের উপর শুধু বিজ্ঞানের প্রগতি নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার মর্যাদা বহুলাংশে নির্ভর করে।

অবস্থার গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সংকট কালে মানুষ সাধারণতঃ একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের গণ্ডীর বহির্ভূত সবকিছু বিস্মৃত হয়। যে কাজের দ্বারা প্রত্যক্ষ ধনসম্পদ্ সৃষ্টি হয় তার জন্য তারা অর্থ ব্যয় করবে। কিন্তু বিজ্ঞানকে যদি সমুন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তবে তার কোন প্রত্যক্ষ লক্ষ্য রাখলে চলে না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বিজ্ঞান যে জ্ঞান ও পদ্ধতির আবিষ্কার করে, তা শুধু পরোক্ষ ভাবেই বাস্তব লক্ষ্য সিদ্ধির সহায়ক হয় এবং তা-ও বহুক্ষেত্রে হয় কয়েক পুরুষ পরে। বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করার ফল হচ্ছে পরবর্তী কালে বুদ্ধিজীবী কর্মীর অভাবের পথ প্রশস্ত করা। অথচ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারধারার প্রসাদে এঁরা শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে নূতন নূতন আবিষ্কার যোজনা করতে এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারতেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পথে বাধা পড়লে জাতির বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ধারা রুদ্ধ হয়। এর অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যৎ উন্নতির বহু সম্ভাবনার অকালমৃত্যু। এ ব্যাপার আমাদের বন্ধ করতে হবে। অরাজনৈতিক কারণের জন্য রাষ্ট্র এখন দুর্বল হওয়ায় সমাজের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা দানের জন্য আগুয়ান হয়ে বৈজ্ঞানিক জীবনের অবনতির গতি রোধ করা।

[১৯৩৪]

আমেরিকার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন

অতীব চমৎকার ভাবে আজ আমাকে আপনারা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছেন। এর যতটুকু ব্যক্তিগত ভাবে আমার উদ্দেশ্যে, তার জন্য আমি বড় সংকোচ বোধ

করছি। তবে একজন বিশুদ্ধ (pure) বিজ্ঞানের প্রতিনিধি হিসাবে আমার যে অভ্যর্থনা হয়েছে, তার জন্য আমি সাতিশয় পুলকিত। আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে যে, পৃথিবী যে আর আধিভৌতিক ক্ষমতা ও সম্পদকে চরম কাম্য বলে বিবেচনা করতে প্রস্তুত নয়—এই জনসমাবেশই তার বাহ্য ও দৃষ্টিগোচর চিহ্ন। এ কথা স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করার জন্য মানুষের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে দেখে বড় তৃপ্তি পাচ্ছি।

এই সৌভাগ্যশালী দেশে আপনাদের ভিতর মনোহর স্মৃতি বিজড়িত যে দুই মাস কাল কাটাবার সুযোগ আমার হয়েছে, তাতে নানা উপলক্ষ্যে এই বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি যে এ দেশের কর্মী-পুরুষ এবং বাস্তব জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিজ্ঞানের প্রচেষ্টাকে কত উচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে তো নিজেদের বিত্ত ও কর্মক্ষমতার একটা বিশিষ্ট অংশ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সেবায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন এবং এইভাবে এ দেশের সমৃদ্ধি ও গৌরবের পথ সুগম করেছেন।

এই সুযোগে সকৃতজ্ঞ চিত্তে একটা কথা উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। আমেরিকার বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা এ দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সমগ্র সভ্য জগতই বৈজ্ঞানিক প্রগতির ক্ষেত্রে আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির অকৃপণ সহায়তা পাওয়ায় উৎফুল্ল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ ঘটনা আপনাদের প্রত্যেকের পক্ষে শ্লাঘনীয় ও গৌরবজনক।

আন্তর্জাতিক চিন্তা ও আন্তর্জাতিকতা বোধের এই সব প্রতীক বিশেষ রূপে অভিনন্দনযোগ্য। কারণ বিশ্বকে এক শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ভবিষ্যতের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে হলে এর প্রধান প্রধান রাষ্ট্র ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে আন্তর্জাতিক চিন্তা ও আন্তর্জাতিকতা বোধের অনুশীলনের প্রয়োজন সকল যুগ অপেক্ষা একালে অধিক। আমার মনের একটি আশা আপনাদের কাছে ব্যক্ত করব এবং তা হচ্ছে এই যে, যে সুমহান্ দায়িত্বজ্ঞান থেকে আমেরিকান জাতির ভিতর এই আন্তর্জাতিকতা বোধের উদ্রেক হয়েছে, শীঘ্রই তা যেন রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়।

[১৯৩৪]

জনৈক সমালোচকের প্রতি অভিনন্দন বাণী

নিজের চোখে সব কিছু দেখা, সমসাময়িক কালের ফ্যাসানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতগর্ভ (suggestive) শক্তির কাছে পরাজয় বরণ না করে নিজে সব কিছু অনুভব করা ও বিচার করা, এবং ছোট্ট একটি বাক্যে বা সুচতুর শব্দে নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ব্যক্ত করা কি মহৎ ব্যাপার নয়? এ কি অভিনন্দনযোগ্য নয়?

[১৯৩৪]

সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধি

তীব্র রাজনৈতিক সংকট মানবসভ্যতার বিকাশকে কি ভাবে অবরুদ্ধ করেছে তা খতিয়ে দেখার পূর্বে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, একমাত্র সুকুমার চারাগাছের সঙ্গেই উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃতির তুলনা করা চলে এবং এর অস্তিত্ব নির্ভর করে অনেকানেক সূক্ষ্ম অবস্থার উপর ও কোন বিশেষ কালে মাত্র কয়েকটি স্থানেই এর বিকাশ সম্ভবপর হয়। সংস্কৃতির অভিব্যক্তির জন্য প্রথমতঃ কিছুটা সমৃদ্ধি প্রয়োজন, যাতে দেশের কিছু সংখ্যক লোকের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর প্রত্যক্ষ উৎপাদন কার্যে আত্মনিয়োগ না করলেও চলে। দ্বিতীয়তঃ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও অবদান সমূহকে শ্রদ্ধা করার মত নৈতিক ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন। কারণ এরই বলে অন্যান্য শ্রেণী এই শ্রেণীকে জীবনধারণোপযোগী উপকরণ সমূহ সরবরাহ করে থাকে।

মানবসমাজ সংস্কৃতির যতটুকু মর্যাদা দেবে, সাংস্কৃতিক দৈন্য অপনোদনের জন্য তার ততটা ইচ্ছা হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানবসমাজ প্রত্যাসন্ন সংকটে সাধ্যমত সাহায্য করবে এবং উচ্চস্তরের সামূহিক জীবনকে নূতন করে জাগিয়ে তুলবে। আজ জাতীয় অহমিকার জন্য এই ভাবনাকে পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে। এই সামূহিক ভাবনারি এক মানবীয় মূল্য আছে এবং তা রাজনীতি ও ভৌগোলিক সীমান্তের বহু উর্ধ্বে। তা হলে ভবিষ্যতে এ এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজে সহায়ক হবে যাতে প্রত্যেক জাতি স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার উপযুক্ত ও সভ্যতার অবদানের বৃদ্ধি ঘটানোর মত অবকাশ পাবে।

[১৯৩৪]

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হেয় দৃষ্টিতে দেখা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পক্ষে আজ এক সর্বজনমান্য প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেহাকৃতি যদি আবার ভিন্ন প্রকারের হয়, তা হলে তো আরও পোয়াবারো। সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা স্বতঃই যে অবিচারের পেষণ-চক্রে নিষ্পেষিত হয় তাতেই কেবল এই বিয়োগান্ত ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটে না। প্রকৃত প্রস্তাবে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ইঙ্গিতবহ (suggestive) প্রভাবের দরুন অধিকাংশ নিপীড়িত ব্যক্তিই আবার সংখ্যাগুরুদের কুসংস্কারের শিকার হয়ে নিজেদের স্বজনদের হীন জ্ঞান করে। শেষোক্ত এবং বস্তুতঃ অধিকতর অশুভসম্ভাবনাযুক্ত সমস্যার এই অংশের সমাধান সম্ভব সংখ্যালঘুদের ভিতর সংহতি স্থাপন ও জ্ঞান বিস্তারের দ্বারা। তাদের আধ্যাত্মিক মুক্তির পথও এই।

আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায় এই ক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টা করছেন তা সত্য সত্যই অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সর্ববিধ সহায়তা পাবার উপযুক্ত।

[১৯৩৪]

জীবনের অর্থ

মনুষ্যজীবন বা যাবতীয় জৈব জীবনের অর্থ কি ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে ধর্মের কথা স্বভাবতঃই এসে পড়ে। আপনারা তা হলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে এ-জাতীয় প্রশ্নের কি কোন অর্থ আছে ? আমার উত্তর হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি নিজ এবং তার সমগোত্রীয় জীব সমূহের জীবন অর্থহীন বলে মনে করেন, তিনি শুধু দুর্ভাগা নন, তিনি জীবন ধারণের অযোগ্যও বটেন।

[১৯৩৪]

বিজ্ঞান ও সমাজ

দুটি পদ্ধতিতে বিজ্ঞান মানবসমাজের কার্যকলাপ প্রভাবিত করে। প্রথমটি সকলের নিকট সুপরিজ্ঞাত : প্রত্যক্ষ ভাবে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় পরোক্ষ ভাবে বিজ্ঞান এমন সব সহায়তা দিয়ে থাকে, যার ফলে মানবের অস্তিত্বের ধারা সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষাগত। মনের উপর এর ক্রিয়া। সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রভাব অপেক্ষাকৃত মৃদু মনে হলেও প্রত্যুত প্রথমোক্ত পদ্ধতির চেয়ে তা কোন অংশেই কম প্রখর নয়।

বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা বাস্তব দৃষ্টিগোচর প্রভাব হচ্ছে জীবনকে যে সকল বস্তু সমৃদ্ধ করে তাদের নির্মিতি সম্ভবপর করে তোলা। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এর ফলে জীবন জটিলতাপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাষ্পীয় এঞ্জিন, রেলগাড়ী, বৈদ্যুতিক শক্তি ও আলোক, টেলিগ্রাফ, রেডিও, মোটর গাড়ী, বিমান পোত ও ডিনামাইট ইত্যাদির আবিষ্কার এই পর্যায়ভুক্ত। এর সঙ্গে আবার প্রাণী-বিজ্ঞান ও ভেষজ বিজ্ঞানের প্রাণ রক্ষাকারী কৃতি সমূহকেও যোগ করতে হবে। ব্যথা বেদনা উপশমকারী ঔষধাবলীর উৎপাদন এবং খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাত করার পদ্ধতির আবিষ্কার বিশেষ ভাবে এই তালিকার ভিতর ধর্তব্য। আমার মতে মানুষের কাছে এই সকল আবিষ্কারের সর্বাপেক্ষা বাস্তব সুফল হচ্ছে এই যে, এর ফলে মানুষ অত্যধিক ও নীরস দৈহিক শ্রমের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। একদা নিছক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এই-জাতীয় অমানুষিক পরিশ্রম অপরিহার্য ছিল। আজ দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে বলে দাবি করার মত অবস্থায় আমরা যদি উপনীত হয়ে থাকি, তা হলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে বিজ্ঞানের বাস্তব পরিণামের কারণেই এই প্রথার উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে।

অন্যদিকে যন্ত্রকৌশল বা ফলিত বিজ্ঞান মানব জাতিকে অতীব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন করেছে। মানব জাতির অস্তিত্বই এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের উপর নির্ভর করছে। এ সমস্যা হচ্ছে নবাবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির উপযুক্ত সামাজিক সংগঠন ও ঐতিহ্য রচনা করা। এ না হলে সদ্য-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি নিঃসংশয়ে প্রচণ্ডতম বিপর্যয় ঘনিয়ে তুলবে।

অসংগঠিত অর্থ-ব্যবস্থার আওতায় যদি যান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার শরণ নেওয়া যায় তা হলে তার পরিণামে উৎপাদন ক্রিয়ায় মানব সমাজের এক মুখ্য অংশের প্রয়োজন আর থাকবে না এবং এই ভাবে তারা আর্থিক সঞ্চালনের (Circulation) সম্বন্ধবিবর্জিত হয়ে পড়বে। অত্যধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ক্রয়-ক্ষমতার অপহ্নব এবং শ্রমের মূল্য হ্রাস—এই হচ্ছে এর আশু পরিণতি। এরই ফলে আবার পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঘন ঘন ভয়ঙ্কর নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়। অন্য দিকে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ভীষণ ভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত কোন রক্ষাকবচের সাধ্য নেই যে ক্ষমতার এই অমিত কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে পাল্লা দেয়। মানব জাতি এই অভিনব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য সংগ্রামরত। আমাদের কাল যুগোপযোগী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারলে এই সংগ্রাম সত্যকার মুক্তি আনয়নে সমর্থ হতে পারে।

যন্ত্রকৌশলের দৌলতে এক দিকে দূরত্বকে জয় করা হয়েছে, অন্য দিকে এমন সব অভিনব ও অসাধারণ মারণাস্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে যেগুলি অনিয়ন্ত্রিত স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার রাষ্ট্র সমূহের হাতে পড়ায় মানব সমাজের নিরাপত্তা এমন কি অস্তিত্বের পক্ষে সংকটের কারণস্বরূপ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতির হাত থেকে ত্রাণ পেতে হলে আমাদের এই সমগ্র গ্রহের জন্য একটি মাত্র শাসন ও বিচার বিভাগীয় সত্তার প্রয়োজন। অথচ জাতীয় ঐতিহ্য এই রকম কেন্দ্রীয় শক্তির সৃষ্টির পথে ভয়ানক বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও আমরা এমন এক সংগ্রামের ঘূর্ণাবর্তে পড়েছি, যার পরিণাম আমাদের সকলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

সর্বশেষে, বিচারধারা প্রচারের উপায় সমূহ—অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র এবং বেতার—আধুনিক মারণাস্ত্রের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে মানবের দেহ ও আত্মাকে এক কেন্দ্রীয় শক্তির পদানত করে ফেলেছে। এইখানে মানব জাতির তৃতীয় বিপদ দেখা দিয়েছে। এ যুগের উৎপীড়কদের ক্রিয়াকলাপ ও তার ধ্বংসাত্মক পরিণাম স্পষ্ট ভাবে আমাদের এই পরিণাম দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বিজ্ঞানের পূর্বোক্ত অবদান সমূহকে প্রতিষ্ঠানগত ভাবে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য নিয়োগ করার ব্যাপারে আমরা কত পিছনে পড়ে আছি। অবস্থা দৃষ্টে বোঝা যায় যে, এ ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক সমাধান প্রয়োজন। অথচ এ-জাতীয় সমাধানের অনুকূল মনস্তাত্ত্বিক আধার এখনও রচিত হয় নি।

এবার বিজ্ঞানের ফলে যে মননগত পরিণাম হয় তার কথা বিবেচনা করা যাক। প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগে সমগ্র মানব সমাজ যাকে সুনিশ্চিত ও প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করে নেবে, এমন কোন পরিণামে কেবল চিন্তা দ্বারা উপনীত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। আর প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনাই যে অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন—এ বিশ্বাস তো আরও কম ছিল। আদিম পর্যবেক্ষক প্রাকৃতিক নিয়মের যে টুকরো টুকরো জ্ঞান লাভ করত, তাতে ভূত প্রেত ইত্যাদি অতি-প্রাকৃত শক্তির উপরই আস্থা বৃদ্ধি পেত। এই কারণে অদ্যাবধি আদিম সংস্কারে লালিত মানব নিত্য এই ভীতি দ্বারা তাড়িত হয় যে অতি-প্রাকৃত এবং স্বৈরতন্ত্রী শক্তি সমূহ তার বিধিলিপিতে হস্তক্ষেপ করবে।

একে বিজ্ঞানের চিরস্থায়ী কৃতিত্ব আখ্যা দিতে হবে যে, মানবমনে ক্রিয়ারত থেকে বিজ্ঞান মানুষের নিজের এবং প্রকৃতির সম্মুখে তার নিরাপত্তাহীনতার ভাব দূর করেছে। প্রাথমিক গণিতের সৃষ্টি করে গ্রীকরা এমন একটা চিন্তা-পদ্ধতির জন্ম দিয়েছিল, কারও পক্ষেই যার পরিণাম এড়ানো সম্ভবপর নয়। তারপর রেনেসাঁসের যুগের বিজ্ঞানীরা গাণিতিক পদ্ধতির সঙ্গে বিধিবদ্ধ গবেষণাকে সংযুক্তকরণের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। এই সংযুক্তকরণের প্রক্রিয়ার ফলে প্রাকৃতিক নিয়ম নির্ধারণের ব্যাপার এত সঠিক হয়ে গেল এবং অভিজ্ঞার সঙ্গে নিয়মকে মিলিয়ে নেবার কাজও এত অভ্রান্ত প্রমাণিত হল যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর মৌলিক মতভেদের কোন অবকাশ রইল না। সেই থেকে প্রতি যুগ নিত্য নব নব অধ্যায়ের সংযোজনে জ্ঞান ও বোধের ঐতিহ্যসৌধ গড়ে তুলছে। সমগ্র সৌধের আধার বিশ্লিষ্ট হবার তিল মাত্র আশঙ্কা আর নেই।

সাধারণ মানুষ অবশ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্যের খুঁটিনাটির খুব সামান্যই বুঝতে পারবে। তা হলেও তাদের একটি অতীব মহান্ ও গুরুত্বপূর্ণ লাভ হয়েছে। তাদের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুষের চিন্তা-প্রণালীর উপর ভরসা করা যায় এবং প্রাকৃতিক নিয়ম বিশ্বজনীন সত্য।

[১৯৩৫]

আপন কথা

মানুষ কদাচিৎ নিজের অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে এবং অপর কাউকে এ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত করা তো চলেই না। সমগ্র জীবন ধরে মাছ যে-জলে সাঁতার কাটে, সে জল সম্বন্ধে তার জ্ঞান কতটুকু ?

কটু ও মধুর বাইরে থেকে আসে এবং কঠিনের আবির্ভাব হয় ভিতর থেকে, অর্থাৎ মানুষের নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টা এর জনক। আমার স্বভাব আমাকে যে কার্যে

প্রবৃত্ত করায়, প্রধানতঃ আমি সেই সব কাজই করি। এর জন্য এত অধিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাই বলে আমি বড় বিব্রত বোধ করি। অবশ্য আমার দিকে ঘৃণার বাণও নিক্ষেপ করা হয়েছে; তবে আমি এতে কোন আঘাত পাই নি। কারণ কি জানি কেন মনে হয় যে ওসব এমন এক অচেনা রাজ্যের জিনিস, যার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

আমি এক নিঃসঙ্গতার সাম্রাজ্যে বাস করি। এ একাকিত্ব যৌবনে পীড়াদায়ক; কিন্তু পরিণত বয়সে অতীব মনোহর।

[১৯৩৬]

শতাব্দীর অভিশাপ

সৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট মনের প্রাচুর্যহেতু আমাদের যুগ সমৃদ্ধিশালী। এইসব সৃষ্টি-শক্তিবিশিষ্ট মনের আবিষ্কার-কৃতি আমাদের জীবনযাত্রাকে যথেষ্ট সুগম করতে পারত। বাষ্প-শক্তির সহায়তায় আমরা দুস্তর-সাগর অতিক্রম করছি এবং মানব সমাজকে ক্লান্তিকর পেশী-শ্রম থেকে মুক্তি দেবার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি সহায়ে মানুষ বিবিধ উৎপাদন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করতে সক্ষম। আমরা নভোমণ্ডলে উড়তে শিখেছি এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সহায়তায় অক্লেশে এই বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে চক্ষের নিমেষে সংবাদ আদান প্রদান করতে পারি।

কিন্তু প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা একেবারেই অব্যবস্থিত। এইজন্য প্রত্যেকের মনেই আর্থিক চক্র থেকে স্থানচ্যুত হবার ভয় ও এই ভাবে সকলে যাবতীয় জিনিসের অভাবের কারণে পীড়িত। এতদ্ব্যতিরেকে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা মাঝে মাঝে পরস্পরের বক্ষে ছুরিকা হানে এবং তাই ভবিষ্যৎ-চিন্তাকারীকে আতঙ্ক ও ভীতির মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়। এর কারণ হচ্ছে এই যে, মুষ্টিমেয় যে কয়জন সমাজের পক্ষে মূল্যবান কোন অবদান সৃষ্টি করতে পারে, তাদের তুলনায় জনগণের বুদ্ধিবৃত্তি এবং চরিত্রশক্তি অতিশয় নিম্নস্তরের।

[১৯৩৯]

বারট্রাণ্ড রাসেলের জ্ঞান সম্বন্ধীয় মতবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য

বারট্রাণ্ড রাসেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের কারণে আমি তাঁর সম্বন্ধে এই রচনা লিখতে প্রলুব্ধ হই। রাসেলের রচনাবলীর রসাস্বাদন করতে করতে বহু সময় আমি আনন্দে মগ্ন থেকেছি। এক থরষ্টিন ভেবলেন ছাড়া আর কোন সমসাময়িক বিজ্ঞান বিষয়ক লেখকের রচনা সম্বন্ধে আমি এ কথা বলতে পারি না। দার্শনিক এবং প্রজ্ঞাতত্ত্ববেত্তা (epistemologist) রাসেল সম্বন্ধে লিখব বলে মনস্থ

করেছিলাম। বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়েই কাজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু অচিরাৎ বুঝতে পারলাম যে আমি এক পিচ্ছিল পথে পা দেবার দুঃসাহস করে ফেলেছি। এযাবৎ নিজেকে আমি কেবল পদার্থবিদ্যার গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ রাখায় এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার অভাব আছে বলে বুঝতে পারলাম। বিজ্ঞানের বর্তমান অসুবিধা সমূহের দরুন তা পদার্থবিজ্ঞানীকে পূর্বতন যে কোন যুগের তুলনায় অধিকতর মাত্রায় দার্শনিক সমস্যাবলীর এলাকায় অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য করে। এই প্রবন্ধে অবশ্য বিজ্ঞানের সেই সব অসুবিধার কথা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। তবে এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ওই সব অসুবিধা নিয়ে আমি যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছি এবং প্রধানতঃ এর জন্যই আমার পূর্বকথিত অবস্থা।

শত শত বৎসরের দার্শনিক চিন্তার ক্রমবিকাশের ফলে নিম্নোক্ত প্রশ্ন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে; ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ শুদ্ধ চিন্তা দ্বারা কোন জ্ঞান লাভ সম্ভব কি? এ-জাতীয় কোন জ্ঞান সত্য সত্যই আছে কি? তা যদি না থাকে তবে ইন্দ্রিয়-দ্বার সাহায্যে আহৃত বিষয়সমূহ এবং ওই সকল বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান—এতদুভয়ের মধ্যে সঠিক পারস্পরিক সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্ন এবং এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত আরও কয়েকটি প্রশ্ন সম্বন্ধে দার্শনিকদের জগতে মতবৈষম্যের এই রকম সীমাহীন বিভ্রান্তি বিরাজিত। অবশ্য এই প্রায়-নিষ্ফল অথচ বলিষ্ঠ প্রয়াসের ভিতর একটি সুশৃঙ্খল বিকাশের ধারা পরিদৃষ্ট হয়। শুদ্ধ চিন্তা দ্বারা "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত" অথবা "ভাব জগতের" বিপরীত যে "বস্তু জগত" বিদ্যমান সে সম্বন্ধে কোন সঠিক জ্ঞান লাভ সম্ভব কিনা এ সম্বন্ধে মানুষের মনে ক্রমেই সন্দেহ বেড়ে চলেছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে, সত্যকার দার্শনিকের মতন উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহার করলেও এ ক্ষেত্রে বস্তুতঃ এক অযুক্তিসিদ্ধ ভাবকে পাঠকের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। দার্শনিক পুলিশের চক্ষে এই ভাব সন্দেহজনক হলেও এখনকার মত পাঠককে এই শব্দগুলির প্রচলন স্বীকার করে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

দর্শনশাস্ত্রের শৈশবাবস্থায় সাধারণতঃ মনে করা হত যে, কেবল অনুধ্যান (reflection) দ্বারা জ্ঞাতব্য সব কিছু জানা সম্ভব। এক মুহূর্তের জন্য আজ পরবর্তী যুগের দর্শনশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রে লব্ধ শিক্ষার কথা বিস্মৃত হলে পূর্বোক্ত ধারণার ভীষণ ভ্রান্তি আমাদের চোখে পড়বে। প্লেটো যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বস্তু অপেক্ষা "ভাবকে" উচ্চতর পর্যায়ের বাস্তবতা মনে করতেন, তা জেনে তখন আর আমরা বিস্ময় বোধ করব না, এমনকি স্পিনোজা এবং প্রায় আধুনিক যুগের দার্শনিক হেগেলের ভিতরও এই গোঁড়ামি জীবনী-শক্তির মত কাজ করেছে এবং তাঁদের ভিতর মনে হয় প্রবলতম বৃত্তি ছিল এই শক্তি। কেউ হয়তো

এই প্রশ্নও করতে পারেন যে, এই-জাতীয় কোন মায়া ছাড়া দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে মহৎ কোন-কিছু লাভ করা সম্ভব কি? তবে আমরা এখন এই প্রশ্নের পর্যালোচনা করব না।

চিন্তার অসীম শক্তি সম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত মায়ার প্রতিরূপ হচ্ছে অকপট বাস্তবতার মায়া। এতদনুযায়ী আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা "বস্তুর" যে রূপ অনুভূত হয়, তাই তার সত্য স্বরূপ। এই মায়া মানব এবং প্রাণী-জগতের দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রভুত্ব করছে এবং সকল বিজ্ঞান, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল নীতিও এই।

এই দুই মায়াবাদ স্বতন্ত্র ভাবে জয় করা যায় না। নিছক বাস্তবতাকে জয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। রাসেল তাঁর 'অ্যান ইনকোয়ারী ইনটু মিনিং অ্যাণ্ড ট্রুথ' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় অত্যন্ত চমৎকার ও সংক্ষিপ্ত ভাবে এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করেছেন :

> নিছক বাস্তবতা অর্থাৎ বস্তুসমূহকে যেমন দেখায় তাদের স্বরূপ ঠিক তেমনি—এইখান থেকে আরম্ভ করা যাক। আমাদের ধারণায় ঘাস সবুজ, পাথর শক্ত এবং বরফ ঠাণ্ডা। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান আমাদের বলে যে, ঘাসের হরিতাভা, প্রস্তরের কাঠিন্য এবং বরফের শীতলতা আমাদের অভিজ্ঞতার হরিতাভা, কাঠিন্য বা শীতলতা নয়; এ সব তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। পদার্থ-বিজ্ঞানকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তা হলে বলতে হবে যে, কোন ব্যক্তি যখন একটি প্রস্তরখণ্ড দেখছে বলে মনে করে, বস্তুতঃ তখন সে নিজের উপর প্রস্তর-খণ্ডটির প্রতিক্রিয়াই অবলোকন করছে। এই ভাবে মনে হয় যে বিজ্ঞান যেন নিজের বিরুদ্ধেই লড়াই করছে। বিজ্ঞান যখন খুব জোরের সঙ্গে বিষয়মুখ হতে চায়, তখনই দেখা যায় যে স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিজ্ঞান আত্মমুখিতার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেছে। নিছক বাস্তবতা পদার্থবিজ্ঞানের রাজত্বে নিয়ে যায় এবং পদার্থবিজ্ঞান সত্য হলে তার মতে নিছক বাস্তবতা ভ্রান্ত। সুতরাং নিছক বাস্তবতা সত্য হলেও ভ্রান্ত; অর্থাৎ নিছক বাস্তবতা ভ্রান্ত। (পৃঃ ১৪-১৫)

উপরিউক্ত ছত্রগুলি শুধু অতিশয় সুনিপুণ ভাবে গ্রথিত হয় নি, বলতে কি এই ছত্রগুলির বক্তব্যের তাৎপর্য ইতঃপূর্বে আমার মনে উদিত হয় নি। কারণ বাহ্যতঃ দেখতে গেলে বার্কলে এবং হিউম কথিত চিন্তাধারা যেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চিন্তাধারার বিরোধী বলে মনে হয়। যাই হোক, এই মাত্র রাসেলের যে-মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল, তাতে এতদুভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়। বার্কলের মতে আমরা বহির্জগতের "বস্তু সমূহের" প্রত্যক্ষ ধারণা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লাভ করি না; এক মাত্র বস্তু সমূহের অস্তিত্বের সঙ্গে নৈমিত্তিক সম্বন্ধ যুক্ত ঘটনাবলী

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামে উপনীত হয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানানুগ চিন্তাধারা থেকে এই অভিমতের পরিপুষ্টি হয়। কারণ কেউ যদি সাধারণ ভাবেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-সম্মত চিন্তাধারার প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন, তা হলে দৃষ্ট বস্তু ও দর্শন ক্রিয়ার মধ্যে এমন কোন বস্তু প্রক্ষেপ করবার প্রয়োজন হয় না যা দৃষ্ট বস্তু এবং দ্রষ্টার ভিতর পার্থক্য সৃষ্টিকারী এবং যার ফলে "বস্তুর অস্তিত্বই" সংশয়াত্মক হয়ে যায়।

অবশ্য এই প্রকৃতি-বিজ্ঞান-সম্মত চিন্তাধারা এবং তার সাফল্যই আবার শুদ্ধ মনঃকল্পিত চিন্তা দ্বারা সব কিছুর স্বরূপ এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ উপলব্ধি করার সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস রাখার প্রবৃত্তিকে শিথিল করেছে। ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে, বস্তু সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান নিছক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-অনুভূতি-লব্ধ তথ্যাবলীর ক্রিয়াকলাপ মাত্র। সাধারণ অর্থে (ইচ্ছা করেই ব্যাপারটা একটু অস্পষ্ট রাখা হল) সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত বাক্যটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আজ সকলে স্বীকার করেন। তবে এই বিশ্বাসের পিছনে এ কথা ধরে নেওয়া হয় নি যে, কেবল মনঃকল্পিত চিন্তার সহায়তায় সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা অসম্ভব এই তথ্য কারও দ্বারা সত্য সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। বরং এই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, কেবলমাত্র পরীক্ষা-সিদ্ধ (empirical) (উপরিউক্ত অর্থে) পদ্ধতিতেই জ্ঞান লাভ করা যায় বলে কার্যতঃ দেখা গেছে। সর্বপ্রথম গ্যালিলিও এবং হিউম এই আদর্শের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন।

হিউম দেখলেন, কার্য-কারণ সম্বন্ধ জাতীয় অপরিহার্য ধারণা সমূহ ইন্দ্রিয়দত্ত উপাদান থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। এই পরিজ্ঞান তাঁকে যে কোন প্রকারের জ্ঞান সম্বন্ধে কেমন যেন সন্দিগ্ধমনা করে তুলল। হিউমের রচনাবলী পাঠ করার পর এই ভেবে বিস্ময় জাগে যে, তাঁর পর বহু এবং এমনকি অত্যন্ত প্রখ্যাত দার্শনিকরাও কি করে এত সব স্ফীতকায় দুর্বোধ্য গ্রন্থমালা রচনা করে গেছেন এবং আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, এ সব গ্রন্থের ধৈর্যশীল পাঠকও তাঁরা পেয়েছেন। হিউম তাঁর পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকদের বিকাশকে স্থায়ী ভাবে প্রভাবিত করে গেছেন। রাসেলের দর্শন সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণের মধ্যে হিউমের গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং প্রকাশভঙ্গীর প্রসাদগুণ আমাকে হিউমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নিশ্চিত জ্ঞানলাভের জন্য মানবের মনে উদগ্র পিপাসা বিদ্যমান। অথচ হিউম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, আমাদের জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস ইন্দ্রিয়ানুভূতি-সঞ্জাত উপাদানরাজি অভ্যাসের ফলে আমাদের কেবল বিশ্বাস ও অনুমানের রাজত্বে পৌঁছে দিতে পারে ; ইন্দ্রিয়ানুভূতির পথে বস্তুসমূহের বিধিবদ্ধ

সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করা তো দূরের কথা, তার জ্ঞানই হয় না। সুতরাং হিউমের এই কথা শুনে মানুষ ভীষণভাবে দমে গেল। অতঃপর কাণ্ট রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। অবশ্য তিনি যে রূপে তাঁর ভাবধারা উপস্থাপিত করেছিলেন তা একেবারে গ্রহণযোগ্য না হলেও হিউম বর্ণিত সমস্যা (জ্ঞানরাজ্যের যতটুকু পরীক্ষাসিদ্ধ, সেটুকু নিশ্চিত জ্ঞান নয়) সমাধানের পথে অবশ্যই তাকে এক কদম এগিয়ে যাওয়া বলতে হবে। সুতরাং আমাদের সুনিশ্চিতভাবে নিশ্চিত জ্ঞান পেতে হলে যুক্তিকে তার ভিত্তি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধের বেলায় এই মতবাদ কার্যকারী বলে ধরে নেওয়া হয়। প্রত্যুত এইগুলি ও এই-জাতীয় আরও কয়েক ধরনের জ্ঞান চিন্তা-শক্তিরই অংশ বিশেষ এবং এই জন্য এসব অর্জন করতে কোনরকম পূর্বতন ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যের জ্ঞান প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ এসব হচ্ছে সহজাত জ্ঞান (*a priori* knowledge)। আজ অবশ্য সকলেই জানেন যে, উল্লিখিত ধারণাগুলিতে কাণ্ট যে-জাতীয় নিশ্চয়তা বা অন্তর্গূঢ় প্রয়োজনীয়তার সম্পর্ক আরোপ করেছিলেন তা তাদের ভিতরে নেই, তবে এ সমস্যা সম্বন্ধে কাণ্টের উক্তির নিম্নোক্ত অংশ সঠিক বলে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়:

> যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবস্থা অবলোকন করলে দেখা যাবে যে, চিন্তা করার সময় আমরা, যেন আমাদের সহজাত অধিকার বলে এমন সব ধারণা ব্যবহার করি, ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ উপকরণাবলীর সাহায্যে যার ভিতর আমরা প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারি না।

বস্তুতঃ আমি এ-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় যে, এর চেয়েও অনেক বেশী এগিয়ে যেতে হবে : যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে আমাদের মনন এবং ভাষাগত অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত যাবতীয় ধারণাই হচ্ছে চিন্তার স্বাধীন সৃষ্টি এবং আরোহ-প্রণালী (inductive) দ্বারা ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে এই জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। সহজে এটা চোখে পড়ে না। না-পড়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা কতক ধারণা এবং তৎসম্পর্কিত সম্বন্ধকে (প্রতিজ্ঞাকে) কতিপয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে এমন সুনির্দিষ্টভাবে সংযুক্ত করতে অভ্যস্ত যে, আমরা ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতের সঙ্গে চিন্তা, ধারণা এবং প্রতিজ্ঞার জগতের এই যে ব্যবধান রয়েছে, সে সম্বন্ধে সচেতন হই না। বস্তুতপক্ষে এই ব্যবধান আদপেই ঘোচানো যায় না।

উদাহরণস্বরূপ গণিতশাস্ত্রের পূর্ণসংখ্যার (integers) কথা ধরা যাক। এটা সন্দেহাতীত রূপেই মানবমনের সৃষ্টি। এই স্বয়ংরচিত উপাদান কতিপয় ইন্দ্রিয়ানুভূতি-লব্ধ অভিজ্ঞতার ক্রমিক বিন্যাসকে সরল করে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি-লব্ধ ভূয়োদর্শন হতে এই ধারণা সৃষ্টি হবার উপায় নেই। ইচ্ছা করেই আমি এখানে

সংখ্যার উদাহরণ নির্বাচন করেছি। কারণ প্রথমতঃ এ ধারণা প্রাক্-বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার যুগের এবং দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পূর্বেকার যুগের হওয়া সত্ত্বেও এখনও সহজেই এর গঠনমূলক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। অবশ্য যতই আমরা দৈনন্দিন জীবনের আদিমতম ধারণার দিকে দৃষ্টিপাত করি, দীর্ঘকালস্থায়ী বদ্ধমূল অভ্যাস সমূহের ভিতর লালিত হবার কারণে ততই চিন্তাশক্তির স্বাধীন সৃষ্টি হিসাবে এই সকল ধারণার সনাক্তকরণ কঠিন হয়ে পড়ে। এইভাবে সেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ (এখনকার অবস্থা বোঝাবার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলছি) ধারণার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, যে মতানুসারে "সংক্ষেপণ" প্রণালীতে অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ পরিণামের অংশবিশেষকে বর্জন করেই প্রত্যয়ের (concept) সৃষ্টি হয়। কেন এই ধারণা আমার কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, এইবার তার কারণ আমি ব্যক্ত করব।

হিউমের রচনাবলী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হবার পর সহজেই বিশ্বাস করতে হয় যে, যে সকল ধারণা ও প্রতিজ্ঞা ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ উপাদান থেকে অবরোহিত নয়, অধিবৈজ্ঞানিক (metaphysical) স্বভাববিশিষ্ট হবার দরুন তাদের চিন্তারাজ্য থেকে অপসারণ করা বিধেয়। কারণ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধের মাধ্যমেই যাবতীয় চিন্তা রূপ পরিগ্রহ করে। এই পরবর্তী প্রতিজ্ঞা আমি সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নিচ্ছি ; কিন্তু আমার মতে এই প্রতিজ্ঞার আধারে চিন্তার জন্য যে ব্যবস্থা-পত্র রচিত হয়েছে, তা ভ্রান্ত। কারণ এই দাবিকে যদি সঙ্গত ভাবে অগ্রসর হতে দেওয়া যায়, তবে শেষ অবধি তাবৎ চিন্তাকেই "অধিবৈজ্ঞানিক" বলে বর্জন করতে হবে।

চিন্তা যাতে জাতিচ্যুত হয়ে "অধিবিজ্ঞান" বা শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বরে পরিণত না হয়, তার জন্য ধারণা-প্রণালীর উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিজ্ঞাকে সুদৃঢ়ভাবে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সুশৃঙ্খল ও পর্যবেক্ষণ করার নিজস্ব কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে ধারণা-প্রণালীকে যথাসম্ভব সুসঙ্গত ও বাহুল্যবর্জিত হতে হবে। এর বাইরে অবশ্য ধারণা-প্রণালী (যুক্তিবিদ্যার দিক দিয়ে) হল যুক্তিবিদ্যার কতকগুলি সাংকেতিক শব্দ নিয়ে অবাধ ক্রীড়া। দৈনন্দিন জীবনের নিত্যকার চিন্তাধারা এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের অপেক্ষাকৃত সচেতন ও বিধিবদ্ধভাবে রচিত চিন্তাপ্রণালী—উভয়ের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম সমভাবে (এবং সমপ্রক্রিয়ায়) প্রযোজ্য।

এইবার আমি যদি নিম্নলিখিত উক্তি করি তবে তার অর্থ বোধগম্য হবে : হিউম তাঁর প্রাঞ্জল রচনাবলী দ্বারা দর্শনশাস্ত্রকে শুধু নিশ্চিত ভাবে এগিয়েই দেন নি ; নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি দর্শনশাস্ত্রের জন্য এক বিপদ সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। তাঁর রচনার সূত্র ধরে দর্শনশাস্ত্রের রাজ্যে এক অদ্ভুত "অধিবিজ্ঞানের আতঙ্ক" দেখা দিয়েছে এবং এই আতঙ্ক সমসাময়িক পরীক্ষাসিদ্ধ দার্শনিকতার ক্ষেত্রে এক ব্যাধির

মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরাকালের যে শূন্যবিহারী দার্শনিকতা মনে করত যে ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিকে উপেক্ষা ও বর্জন করা যায়, এ ব্যাধি তারই প্রতিরূপ।

অর্থবোধ (meaning) ও সত্য সম্বন্ধে রাসেল তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে যে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, যতই তার প্রশস্তি করা যাক না কেন, তবুও আমার মনে হয় যে ওইখানেও অধিবিজ্ঞানের আতঙ্কের অপচ্ছায়া কিছুটা অনিষ্ট সাধন করেছে। আমার মনে হয় এই আতঙ্কের কারণেই "বস্তুকে" "গুণরাজির সমষ্টি" বলে কল্পনা করা হয়েছে এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতিগত উপাদানকেই "গুণের" উৎস রূপে বিবেচনা করা হয়েছে। আমরা জানি যে দুটি জিনিসের গুণাগুণ একেবারে অভিন্ন হলে তারা একই জিনিস হয়ে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুসমূহের জ্যামিতিক সম্বন্ধকে গুণগত বলেই বিবেচনা করতে হয়। (নচেৎ প্যারিসের ইফেল টাওয়ার ও নিউ ইয়র্কের স্কাইস্ক্রাপারকে "অভিন্ন বস্তু" মনে করতে হয়)।* আমি অবশ্য বস্তুকে (অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্রব্যকে) ধারণা-প্রণালীর ভিতর উপযুক্ত দেশ-কালিক (spatio-temporal) কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে এক স্বাধীন প্রত্যয় হিসাবে মেনে নেবার ভিতর কোন রকম "অধিবৈজ্ঞানিক" বিপদের সম্ভাবনা দেখতে পাই না।

এই সকল উদ্যমের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় লক্ষ্য করে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। পুস্তকটির শেষ অধ্যায়ে অবশেষে স্বীকার করা হয়েছে যে "অধিবিজ্ঞান" বর্জন করে শেষ অবধি চলা সম্ভব নয়। শুধু যে ব্যাপারে আমার আপত্তি, তা হচ্ছে এই যে রচনার কোথাও কোথাও বিচারের অস্পষ্টতা প্রকট হয়েছে।

[১৯৪৪]

সমাজবাদ কেন ?

আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে যে বিশেষজ্ঞ নয়, তার পক্ষে সমাজবাদ সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করা কি যুক্তিযুক্ত ? কয়েকটি কারণে আমার বিশ্বাস যে এ রকম করা অসমীচীন।

প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিক থেকে বিষয়টির পর্যালোচনা করা যাক। হয়তো মনে হবে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে কোন মৌলিক পদ্ধতিগত পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ যথাসম্ভব সহজ-বোধ্য করার জন্য তাদের অন্তর্নিহিত সর্বজনমান্য সূত্রসমূহের আবিষ্কারের প্রয়াস

---

* রাসেলের 'অ্যান নকোয়ারী ইনটু মিনিং অ্যাণ্ড ট্রুথ'-এর সঙ্গে তুলনীয়। "প্রপার নেমস" শীর্ষক অধ্যায়ে পৃঃ ১১৯-২০ দ্রষ্টব্য।

করেন। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এই-জাতীয় পদ্ধতিগত পার্থক্যের অস্তিত্ব রয়েছে। পর্যবেক্ষিত আর্থিক বিষয়াবলী প্রায়ই এমন সব অদৃষ্টপূর্ব ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার পৃথক্ ভাবে মূল্যায়ন করা অসম্ভব এবং এই জন্য আর্থিক ক্ষেত্রে সাধারণ সূত্রের আবিষ্কার-কার্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এতদ্ব্যতিরেকে এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মানবেতিহাসের তথাকথিত সভ্য যুগের সূচনা থেকে অদ্যাবধি যে অভিজ্ঞতা-সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে তা মুখ্যতঃ এমন সব কারণের দ্বারা প্রভাবিত ও সীমিত হয়েছে, যাকে কোন মতেই নিছক আর্থিক কারণ বলা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ ইতিহাসের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির কথা ধরা যেতে পারে। এগুলির অস্তিত্ব প্রধানতঃ সামরিক বিজয়াভিযানের ফলে সম্ভব হয়েছে। বিজয়ী শক্তি বৈধানিক ও আর্থিক দৃষ্টিতে বিজিত দেশের উপর বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী রূপে জেঁকে বসে। তারা একচেটিয়া ভূম্যধিকারী হয়ে পড়ে এবং নিজেদের মধ্য থেকে যাজক-সম্প্রদায় নিয়োগ করে বিজিত জাতির উপর চাপিয়ে দেয়। শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী এইসব যাজকবর্গ সমাজের শ্রেণীবিভাগকে স্থায়ী রূপদান করে এবং এমন এক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে, যার পরিণামে জনসাধারণ তারপর থেকে, প্রধানতঃ অচেতন ভাবে, তাদের সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়।

তবে সত্য কথা বলতে কি, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এই সেদিনকার ব্যাপার। কুত্রাপি আমরা সত্য সত্যই থরষ্টিন ভেবলেন কথিত মানব-বিকাশের "লুণ্ঠক অধ্যায়ের" ঊর্ধ্বে উঠতে পারিনি। পরিদৃশ্যমান আর্থিক তথ্যাবলী সেই অধ্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত এবং এর থেকে লব্ধ সূত্রাবলীর অপরাপর অধ্যায়ে প্রয়োগ হয় না। সমাজবাদের যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে মানব-বিকাশের এই লুণ্ঠক অধ্যায়ের ঊর্ধ্বে আরোহণ করে আরও অগ্রসর হওয়া এবং তাই বর্তমান ধন-বিজ্ঞান ভবিষ্যতের সমাজবাদী সমাজের উপর খুব কমই আলোকসম্পাত করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবাদ এক সামাজিক ও নৈতিক লক্ষ্যাভিমুখে সঞ্চরণশীল। কিন্তু বিজ্ঞান লক্ষ্য নির্ধারণ করতে অপারগ, শুধু তাই নয়, তার পক্ষে মানুষের মনে আদর্শবাদের প্রেরণা সৃষ্টি আরও অসম্ভব। বিজ্ঞান বড় জোর লক্ষ্যে উপনীত হবার সাধন সরবরাহ করতে পারে মাত্র। পক্ষান্তরে লক্ষ্যবস্তুটি স্বয়ং সুমহান্ নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ মহামানবগণ কর্তৃক প্রতীত হয় এবং এই সব লক্ষ্য যদি মৃতপ্রাণ না হয় পরন্তু জীবনী-শক্তিতে দুর্দম ও গতিশীল হয়, তা হলে এই সব মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা সে লক্ষ্য অবলম্বন করে এগিয়ে চলেন ও এই রূপে তাঁরা অর্ধ-চেতন ভাবে সমাজের ধীরগতি উদ্বর্তনের কর্ণধার হয়ে থাকেন।

এই সব কারণে মানবীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত যে, আমরা যেন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে অহেতুক উচ্চমূল্য না দিই, এবং

আমরা যেন ধরে না নিই যে সমাজ-সংগঠন সম্পর্কিত বিষয়াবলী সম্বন্ধে একমাত্র বিশেষজ্ঞদেরই অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার আছে।

কিছুকাল যাবৎ অসংখ্য কণ্ঠে এই অভিমত ঘোষিত হচ্ছে যে, মানবসমাজ এক সংকটের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে এবং এর ফলে এর স্থায়িত্ব-ক্ষমতা ভীষণ ভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছে। এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি-মানব তার লীলাক্ষেত্র ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন আকারেরই গোষ্ঠী হোক না কেন, তার প্রতি উদাসীন, এমনকি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। আমার উক্তির অর্থ প্রাঞ্জল করার জন্য এখানে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করছি। সম্প্রতি জনৈক বুদ্ধিমান ও সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে আর একটি মহাযুদ্ধের আশঙ্কা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলি যে, আমার মতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিলে মানবজাতির অস্তিত্ব সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন হবে এবং তাই আমি এই অভিমত প্রকাশ করি যে একমাত্র কোন রাষ্ট্রোত্তর সংগঠনই সম্ভাব্য সর্বনাশ থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারে। আমার বক্তব্য শুনে সেই ভদ্রলোক অত্যন্ত শান্ত ও নির্বিকার স্বরে উত্তর দিলেন, "আপনি কেন মানবজাতির অস্তিত্ব বিলোপনের এত বিরোধী?"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মাত্র এক শতাব্দীকাল পূর্বেও কেউ এত লঘু ভাবে এ-জাতীয় মন্তব্য করতে পারতেন না। এ এমন একজন ব্যক্তির উক্তি, যিনি নিজের মনে একটা ভারসাম্য বিধানের ব্যর্থ চেষ্টা করে এখন মোটামুটি সাফল্য লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েছেন। আজ অনেকে ভীষণ ভাবে যে বেদনাদায়ক নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব বোধ করছেন, এ তারই নিদর্শন। এর কারণ কী? আর এর সমাধানই বা কী?

এ সব প্রশ্ন উত্থাপন করা সহজ; কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণ নিশ্চিত ভাবেও সেগুলির উত্তর দেওয়া দুরূহ। তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমি অবশ্য জানি যে আমাদের অনুভূতি-শক্তি ও কর্ম-প্রচেষ্টা প্রায়শঃ পরস্পরবিরোধী ও অস্পষ্ট হয়, তাই তাদের সরল সূত্রাকারে ব্যক্ত করা যায় না।

মানব একাধারে একাকিত্ব-প্রিয় ও সামাজিক জীব। একাকিত্বপ্রেমী হিসাবে মানুষ নিজের ও তার আপনজনদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস করে, তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির প্রযত্ন করে ও তার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশের চেষ্টা করে। সামাজিক জীব হিসাবে সে তার সহধর্মী মানবের কাছ থেকে স্নেহ, ভালবাসা ও স্বীকৃতি আশা করে। সে তাদের সুখের অংশীদার হতে চায়, তাদের দুঃখে সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছা পোষণ করে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে চায়। এই বহুমুখী, প্রায়শঃ পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির অস্তিত্বের কারণে মানুষ তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে ও এই সকল প্রবৃত্তির মধ্যে কে কতটা সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছে

তার দ্বারা মানুষ কতটা আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে ও সমাজ-কল্যাণে সহায়তা করতে পেরেছে, বোঝা যায়। এই দুই শক্তির আপেক্ষিক বল খুব সম্ভব মূলতঃ বংশানুক্রমিকতা দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে শেষ অবধি যে ব্যক্তিত্ব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তার মূলাধার হচ্ছে মানুষের পরিবেশ। মানুষ যে পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠে, তার গঠন, তার ঐতিহ্য ও সেই সমাজের বিশেষ প্রকারের চিন্তা-ভাবনা মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল উপাদান হয়। ব্যক্তি-মানবের চিত্তে সমাজের যে বিমূর্ত ধারণা বিদ্যমান, তা হচ্ছে তার সমসাময়িক ও পূর্বসূরীদের সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধের যোগফল। ব্যক্তি স্বতঃচালিত হয়ে চিন্তা, অনুভব, প্রযত্ন ও কর্ম করতে পারে। কিন্তু তাঁর শরীর বুদ্ধি ও প্রক্ষোভগত অস্তিত্ব এমন ভীষণ ভাবে সমাজনির্ভর যে সমাজের কাঠামোর বাইরে তার কথা চিন্তা করা যায় না বা তাকে বুঝে ওঠা যায় না। সমাজই মানুষকে অন্ন, বস্ত্র, আবাস, কাজ করার হাতিয়ার, মুখের ভাষা, চিন্তা-প্রণালী ও চিন্তার অধিকাংশ উপাদান দিয়ে থাকে। "সমাজ" নামক ছোট্ট শব্দটির পিছনে প্রচ্ছন্ন অতীত ও বর্তমানের বহু লক্ষ মানবের পরিশ্রম ও অবদানের ফলে তার জীবনযাত্রা নির্বাহ সম্ভবপর হয়।

সুতরাং অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাচ্ছে যে, পিপীলিকা এবং মধুমক্ষিকার মতই ব্যক্তি-মানবের সমাজ-নির্ভরশীলতা এক অপরিহার্য প্রাকৃতিক ধর্ম। তবে পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার সমগ্র জীবনপদ্ধতির একেবারে তুচ্ছতম খুঁটিনাটিও জন্মগত সহজ প্রবৃত্তি দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষের সামাজিক কাঠামো ও পরস্পর-সম্বন্ধ বিচিত্র ও বহুমুখী এবং অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। স্মৃতিশক্তি, নিত্য নব সমন্বয়ের যোগ্যতা ও ভাষা দ্বারা ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতার ফলে মানুষের ভিতর এমন সব বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে, যা জৈব প্রয়োজন-তাড়িত নয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের গঠন ও পরিচালন-পদ্ধতিতে ; সাহিত্য, বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের অবদানে এবং শিল্পকৃতিতে এই-জাতীয় বিকাশের স্বরূপ পরিদৃষ্ট হয়। মানুষ বিশেষ অর্থে নিজ আচরণ দ্বারা কি ভাবে তার জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে, এর দ্বারা তা বোঝা যায় এবং এ প্রক্রিয়ায় চৈতন্যযুক্ত চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

বংশানুক্রমিকতার মাধ্যমে জন্মমুহূর্তেই মানুষ এমন একটা জৈব ধাত পেয়ে থাকে, যাকে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নিতে হবে। মানবপ্রজাতির বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক প্রবণতাসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতিরেকে সমাজে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ও অন্যান্য বহুবিধ প্রভাবের ফলে মানুষ তার জীবৎকালে একটা সাংস্কৃতিক স্বরূপও পেয়ে থাকে। এই সাংস্কৃতিক স্বরূপ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে থাকে এবং ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণের ক্ষেত্রে

এর প্রভাব গভীর। তথাকথিত আদিম সংস্কৃতির তুলনামূলক অনুসন্ধানের দ্বারা আধুনিক নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে, প্রচলিত সাংস্কৃতিক কাঠামো ও সমাজের মুখ্য গঠন-পদ্ধতি অনুসারে মানুষের সামাজিক আচরণও বহুল পরিমাণে বিভিন্ন হয়ে থাকে। মানুষের ভাগ্যের উন্নতি সাধনে যাঁরা প্রযত্নশীল তাঁরা এরই উপর আশা রাখতে পারেন। জৈব গঠন-প্রণালীর কারণে পরস্পরকে ধ্বংস করা বা এই হেতু এক নিষ্ঠুর স্বতঃসৃষ্ট ভবিতব্যেরও মুখাপেক্ষী হওয়া মানবজাতির বিধিলিপি নয়।

মানবজীবনকে যথাসম্ভব তৃপ্ত, সমৃদ্ধ করার জন্য সমাজ সংগঠন ও মানবের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণের কি রকম পরিবর্তন সাধন করা উচিত—এই প্রশ্ন নিজেকে করার সময় আমাদের সদাসর্বদা এই বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন যে, এ ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি স্থিতি রয়েছে, যার পরিবর্তন করা আমাদের সাধ্যাতীত। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মানবের জৈব প্রকৃতির সত্যকার কোন রকম পরিবর্তন বিধান সম্ভব নয়। এ ছাড়া বিগত কয়েক শতাব্দীর যন্ত্রকৌশলের প্রগতি ও জন-সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার পরিণামে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাও ধরাতলে স্থায়ী হবে। অপেক্ষাকৃত ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অতীব ব্যাপক শ্রম বিভাজন ও চূড়ান্ত কেন্দ্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। পিছনের দিকে ফিরে তাকালে যতই সে দৃশ্য নয়নাভিরাম মনে হোক না কেন, আর কোন দিনই সে যুগ ফিরে আসবে না, যখন ব্যক্তি বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন মানবগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে স্বরাট্ হতে পারবে। আজই মানবজাতি উৎপাদন ও উপভোগের ক্ষেত্রে এক গ্রহ-বিস্তীর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে গেছে বললে অতিরঞ্জন হবে না।

এইবার আমি এমন একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, যখন আমি যাকে এ যুগের সংকট মনে করি তার মূল সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যেতে পারে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এই সংকট দেখা দিয়েছে। পূর্বের যে-কোন যুগের তুলনায় ব্যক্তি-মানব আজ তার সমাজ-নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে অধিক মাত্রায় সচেতন হয়েছে। তবে এই নির্ভরশীলতা তার কাছে এক ধনাত্মক সম্পদ্‌রূপে প্রতিভাত হয় না। একে সে এক সজীব বন্ধন, রক্ষক-শক্তিরূপে অনুভব না করে বরং তার স্বাভাবিক অধিকারের, এমনকি তার অর্থনৈতিক অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক শক্তি মনে করে। তাছাড়া সমাজে তার অবস্থা এমন যে এর ফলে একদিকে তার অহম্ প্রবৃত্তি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যদিকে তার স্বভাবতঃ দুর্বল সামাজিক প্রবণতা ক্রমশঃ ক্ষীণবল হচ্ছে। সকল মানুষই, তা তাদের সামাজিক মর্যাদা যা-ই হোক না কেন, এই ক্ষয়িষ্ণু পদ্ধতির শিকার। মানুষ অজ্ঞাতসারে স্বীয় অহমিকা-

বোধের নিগড়ে বন্দী হয়ে নিজেকে নিরাপত্তাবিহীন, নিঃসঙ্গ এবং জীবনের অনাড়ম্বর ও সহজ সরল আনন্দ-রসবঞ্চিত মনে করছে। জীবন সংক্ষিপ্তকাল স্থায়ী ও বিপজ্জনক হবার আশঙ্কা থাকলেও, একমাত্র সমাজকল্যাণার্থ নিজেকে উৎসর্গ করেই মানুষ তার এই জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে পারে।

আমার মতে পুঁজিবাদী সমাজের বর্তমান আর্থিক অরাজকতাই অনর্থের মূল উৎস। চোখের সামনে আমরা এমন এক বিরাটায়তন উৎপাদক গোষ্ঠী দেখতে পাচ্ছি, যার সদস্যরা তাদের সকলের সম্মিলিত শ্রমলব্ধ ফল থেকে পরস্পরকে বঞ্চিত করার জন্য অবিরত চেষ্টা করে চলেছে। শক্তি প্রয়োগে নয়, মুখ্যতঃ আইনসংগত বিধিবিধান ভক্তিভরে পালন করেই তারা এই কার্য করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে এই বিষয়টি উপলব্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, উৎপাদনের সাধন—অর্থাৎ মূলধনী সামগ্রী (capital goods) এবং উপভোগ্য উপকরণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উৎপাদিকা শক্তি আইন মুতাবিক (এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যসত্যই) ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে।

আলোচনা সহজবোধ্য করার জন্য প্রচলিত অর্থের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় ঘটিয়ে অতঃপর আমি "শ্রমিক" বলতে তাদের সকলেরই কথা ধরছি, যারা উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক নয়। উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করার সামর্থ্য রাখে। উৎপাদন-যন্ত্র ব্যবহার করে শ্রমিক নূতন নূতন পণ্য উৎপন্ন করে এবং এইগুলি পুঁজিপতির সম্পত্তি হয়। এই পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে যথার্থ মূল্যের আধারে পরিমিত শ্রমিকের উৎপাদন ও তৎ-বিনিময়ে প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের সম্বন্ধ। শ্রমের "স্বাধীন চুক্তি"র ক্ষেত্রে শ্রমিক যা পায়, তা উৎপন্ন পণ্যের যথার্থ মূল্যের দ্বারা নিরূপিত হয় না। শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজন এবং কর্মপ্রাপ্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতারত শ্রমিকদের যোগান অনুযায়ী পুঁজিপতির চাহিদার অনুপাতে শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়। এ কথা প্রণিধান করা প্রয়োজন যে, এমনকি কাগজে-কলমেও শ্রমিককে পারিশ্রমিক দানের ক্ষেত্রে তার দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের মূল্যকে আধার-স্বরূপ বিবেচনা করা হয় না।

দুটি কারণে ব্যক্তিগত পুঁজি মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রিত হয়। প্রথমতঃ পুঁজিপতিদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং দ্বিতীয়তঃ যান্ত্রিক প্রগতি ও তজ্জনিত ক্রমবর্ধমান শ্রমবিভাজক প্রক্রিয়া ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-কেন্দ্রগুলিকে বিনষ্ট করে তৎস্থলে বৃহত্তর উৎপাদন-কেন্দ্র সৃষ্টিকে প্রোৎসাহিত করে। এবংবিধ বিকাশের পরিণাম হচ্ছে ব্যক্তিগত পুঁজির স্বৈরতন্ত্র এবং এর প্রচণ্ড শক্তিকে এমনকি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুসংগঠিত রাজনৈতিক সমাজের পক্ষেও কার্যকর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এর কারণ হচ্ছে এই যে, বিধান পরিষদের সদস্যগণ মূলতঃ

পুঁজিপতিদের অর্থানুকূল্যে পুষ্ট বা তাঁদের দ্বারা অন্যভাবে প্রভাবিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হন এবং এই সব পুঁজিপতি কার্যতঃ বিধান পরিষদ থেকে নির্বাচনকারীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। এর পরিণামে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা জনগণের অনগ্রসর অংশের স্বার্থ বাস্তব ক্ষেত্রে যথাযথভাবে রক্ষা করেন না। উপরন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজিপতিরা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংবাদপ্রাপ্তির সূত্রসমূহ (সংবাদপত্র, বেতার ও শিক্ষাব্যবস্থা) নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে কোন নাগরিকের পক্ষে কোন বিষয়ে বিষয়মুখ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে নিজ রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করা দুষ্কর, এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রথমতঃ উৎপাদনের সাধন (পুঁজি) ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন এবং মালিক যথাভিরুচি এর বিলিব্যবস্থা করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এ ব্যবস্থায় স্বাধীন শ্রমচুক্তি হয়। অবশ্য এই অর্থে বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী সমাজ বলতে কিছুর অস্তিত্ব নেই। বিশেষতঃ এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দীর্ঘকালীন কঠিন রাজনৈতিক সংগ্রাম দ্বারা শ্রমিকবর্গ কয়েক শ্রেণীর শ্রমিকের জন্য কথঞ্চিৎ উন্নত ধরনের "স্বাধীন শ্রমচুক্তির" অধিকার লাভে সমর্থ হয়েছে। তবে সমগ্র ভাবে বিচার করলে, বর্তমান অর্থনীতির সঙ্গে 'বিশুদ্ধ' পুঁজিবাদের বিশেষ পার্থক্য নেই।

উৎপাদন উপভোগের জন্য হয় না, হয় মুনাফার জন্য। এমন কোন ব্যবস্থা নেই যাতে কর্মকরণক্ষম তথা কর্মকরণেচ্ছুক প্রতিটি ব্যক্তি সর্বদা কাজ পেতে পারে। প্রায় সর্বদাই এক বিশাল "কর্মহীনের বাহিনী" পরিদৃষ্ট হয়। শ্রমিক সর্বদাই কর্মচ্যুতির আশঙ্কায় বিবশ থাকে। কর্মহীন ও স্বল্প পারিশ্রমিকে কর্মরত শ্রমিকদল লাভজনক বাজার বলে বিবেচিত হয় না বলে উপভোগ্য উপকরণের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ফলে প্রচণ্ড দুরবস্থা দেখা দেয়। যন্ত্রকৌশলের প্রগতি সকলের জন্য কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে প্রায়ই অধিকতর মাত্রায় বেকার সৃষ্টি করে। পুঁজিপতিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুনাফাবৃত্তি পুঁজির সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার জন্ম দেয় এবং এর পরিণামে ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর মন্দা দেখা দেয়। অনিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা শ্রমশক্তির বিপুল অপচয়ের কারণ হয় এবং অবশেষে ব্যক্তি-মানবের সামাজিক চেতনাকে পঙ্গু করে দেয়, যার কথা আমি পূর্বেই বলেছি।

আমার মতে ব্যক্তি-মানবের সামাজিক চেতনার এই অপহ্নবই হচ্ছে পুঁজিবাদের সর্বাপেক্ষা ভীষণ কুফল। আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা এই রোগে আক্রান্ত। ছাত্রদের ভিতর এক অতিরঞ্জিত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোবৃত্তি অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে

দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রাপ্তিমূলক (acquisitive) সাফল্যের উপাসনা করতে শেখানো হয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সব ভীষণ বিপত্তি পরিহারের একটি মাত্র পন্থা বিদ্যমান। এর জন্য সমাজবাদী অর্থনীতি ও তৎসহিত সামাজিক মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্যে চালিত নবীন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করতে হবে। এবংবিধ অর্থনীতিতে উৎপাদনের সাধনের কর্তৃত্ব থাকবে স্বয়ং সমাজের উপর এবং সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে এর প্রয়োগ হবে। সুপরিকল্পিত অর্থনীতি সমাজের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে উৎপাদন-ব্যবস্থার সংগতি বিধান করে প্রয়োজনীয় কার্য প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির ভিতর বিভাজন করে দেবে এবং প্রত্যেকটি নর, নারী ও শিশুকে জীবিকানির্বাহের নিশ্চয়তা দেবে। শিক্ষা ব্যক্তি-মানবের সহজাত দক্ষতার বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—দক্ষতা ও সাফল্যের গুণ-কীর্তনবৃত্তির অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তি-মানবের ভিতর তার ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার প্রয়াস করবে।

অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে, পরিকল্পিত অর্থনীতি মাত্রেই সমাজবাদ নয়। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা হয়তো ব্যক্তি-মানবকে সম্পূর্ণ ভাবে দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলতে পারে। কতিপয় অত্যন্ত দুরূহ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের উপর সমাজবাদের সাফল্য নির্ভর করছে। রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতার সুদূর-প্রসারী কেন্দ্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে কি ভাবে আমলাতন্ত্রকে সর্বশক্তিমান ও আত্মম্ভরী হওয়া থেকে নিবৃত্ত রাখা যায়? ব্যক্তি-মানবের অধিকার কি ভাবে রক্ষা করা যায় ও কি ভাবে ব্যক্তির অধিকাররূপী গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার অপহ্নব ঘটানো যায়?

[১৯৪৯]

রাষ্ট্র এবং মানবীয় বিবেক

প্রিয় সহকর্মী ও বৈজ্ঞানিকবৃন্দ,

মানুষ কি ভাবে নিজ রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বা স্বীয় সমাজের মনোবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করে নিজ বিবেক অনুযায়ী চলতে পারে এ সমস্যা বস্তুতঃ বহু পুরাতন। ব্যক্তি তার সমাজের উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভরশীল এবং সেইজন্য তার বিধিবিধান তাকে মেনে নিতেই হবে—এই কারণ দেখিয়ে এ কথা বলা খুবই সহজ যে, অপ্রতিরোধ্য জবরদস্তির দরুন কোন মানুষকে যা করতে হয়েছে তার জন্য তাকে দায়ী করা চলে না। তবে এই-জাতীয় একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে বলেই এই ধারণার সঙ্গে ন্যায়-বিচারবোধের দ্বন্দ্ব কোথায়, তা দেখিয়ে দেওয়া আরও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বাইরের জোর-জবরদস্তি ব্যক্তির দায়িত্ব কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করতে পারে; কিন্তু তদ্দরুন কদাচ সে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হতে পারে না। নুরেমবার্গ বিচারে এই দৃষ্টিকোণকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। আইন কানুন ইত্যাদি যা-কিছু আমাদের সামাজিক সংগঠনের ভিতর ন্যায়তঃ গুরুত্বপূর্ণ, তার উদ্ভবের মূলসূত্র হচ্ছে যুগ-যুগের অসংখ্য ব্যক্তির ন্যায়বিচারবোধের ভাষ্য। জীবিত ব্যক্তিরা যদি দায়িত্ববোধ চালিত হয়ে সামাজিক সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি না করেন, তবে ন্যায়তঃ সে সমাজকে অথর্ব বলতে হবে। ব্যক্তির ভিতর এই দায়িত্ববোধ জাগ্রত ও দৃঢ়মূল করার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহেই মানবতার অপরিসীম সেবা।

এ যুগে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রকলাবিদ্‌দের বিশেষ ধরনের নৈতিক দায়িত্ব আছে। কারণ ব্যাপক গণহত্যালীলার সামরিক কৌশলের উন্নয়ন তাদের কার্যপরিধির মধ্যে পড়ে। সেইজন্য "সোসাইটি ফর সোশাল রেসপনসিবিলিটি ইন সায়েন্স" (বিজ্ঞানে সামাজিক দায়িত্ব স্বীকারকারী সমিতি) গঠন দ্বারা একটি অতি প্রয়োজনীয় অভাব মোচন হবে বলে মনে করি। মূল সমস্যাবলী আলোচনার দ্বারা এই সমিতি ব্যক্তির মনের স্পষ্টীকরণ করতে সাহায্য করবে এবং এইভাবে ব্যক্তি তার স্বকীয় কর্তব্য কি হওয়া উচিত তা প্রাঞ্জল ভাবে উপলব্ধি করবে। বিবেকের নির্দেশে চলার দরুন যাঁরা বিপদের সম্মুখীন হবেন তাঁদের ভিতর পারস্পরিক সহায়তা দানের রেওয়াজ গড়ে ওঠা দরকার।

[১৯৫০]

নৈতিক সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা

আপনাদের 'নীতি চর্চা সমিতির'* বার্ষিকোৎসব উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে আমার তরফ থেকে অভিনন্দন প্রেরণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। এ কথা অবশ্য সত্য যে বিগত পঁচাত্তর বৎসরের চেষ্টায় নৈতিক স্তরে যেটুকু কাজ হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। কারণ কেউ এ কথা বলবে না যে, সাধারণ ভাবে মানুষের নৈতিক স্তর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের চেয়ে খুব একটা উন্নত হয়েছে।

সেকালে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, নির্ণেয় বৈজ্ঞানিক তথ্যের ক্ষেত্রে জ্ঞানালোক লাভ এবং গোঁড়ামি ও কুসংস্কার জয় করতে পারলেই সব হয়ে যাবে। অবশ্য এই সবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন মানবের চরমারাধ্য। বিগত পঁচাত্তর বৎসরে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জিত হয়েছে এবং সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ দ্বারা তা বিকীর্ণও হয়েছে। কিন্তু পথের বাধা অপসারিত হলে সমাজ ও ব্যক্তিজীবন

* নিউ ইয়র্ক শহরের একটি পুরাতন সংস্থা।

স্বতঃই মহত্তর হয়ে ওঠে না। কারণ এই নীতিমূলক ফললাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে একটা নৈতিক আকার দেবার সদর্থক আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস ভাস্বর হয়ে ওঠা অতীব প্রয়োজন। এখানে কোন বিজ্ঞানই আমাদের রক্ষা করতে পারে না। এমনকি আমার ধারণা যে, আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কেবল ব্যাবহারিক ও তথ্য-মূলক বিষয়াভিমুখী নিছক বুদ্ধিবাদী মনোভাবের উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত জোর দেবার ফলে প্রত্যক্ষ ভাবে নৈতিক মূল্যবোধের অপহ্নব ঘটেছে। যন্ত্রকৌশলের প্রগতির ফলে মানবজাতির সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত হয়েছে আমি সে সম্বন্ধে ততটা ভাবছি না। "নির্জলা বাস্তব" মার্কা মনোবৃত্তি ও চিন্তাধারার স্ফীতি ঘটে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর তা প্রাণঘাতী তুষারঝটিকা-প্রবাহের মত যেভাবে চড়াও হয়েছে, তারই কথা আমি চিন্তা করছি।

নৈতিক এবং কান্তি-বিদ্যার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ বিজ্ঞান অপেক্ষা সুকুমার কলার অধিকতর সন্নিকটবর্তী লক্ষ্য। অবশ্য অপরাপর মনুষ্যের প্রতি সংবেদনা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তবে এই সংবেদনা তখনই সার্থক হয়, যখন অন্যের সুখে দুঃখে সহানুভূতি সূচক আচরণ দ্বারা তা বিধৃত হয়। কুসংস্কার থেকে বিশোধন করলে ধর্মের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে এই অতীব মহত্বপূর্ণ নৈতিক আচরণের অনুশীলন। এই অর্থে ধর্ম শিক্ষা-ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অথচ শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্ম অল্পমাত্রায় স্বীকৃতি পায় এবং যেটুকু পায় তাও প্রণালীবদ্ধ নয়।

আমাদের সভ্যতা ধর্মের প্রতি এইরকম উপেক্ষা প্রকাশ করে যে পাপ করেছে তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থার আতঙ্কজনক সংকটের ভিতর। "নৈতিক সংস্কৃতির" অনুশীলন ব্যতিরেকে মানুষের মুক্তির নান্য পন্থাঃ।

[১৯৫১]

চিরায়ত সাহিত্য সম্বন্ধে

যিনি শুধু সংবাদপত্র বা বড় জোর সমসাময়িক লেখকদের রচনাবলী পাঠ করেন, তাঁকে আমার অতীব সঙ্কীর্ণদৃষ্টি সম্পন্ন ও চশমার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষাকারী ব্যক্তি বলে মনে হয়। তিনি কদাচ অন্য কিছু দেখতে বা শুনতে পান না বলে সম্পূর্ণ ভাবে নিজ কালের গোঁড়ামি এবং রীতি-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। অপরের চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা কিছুমাত্র উদ্দীপ্ত না হয়ে যিনি শুধু নিজের বলেই চিন্তা করেন, একেবারে প্রথম শ্রেণীর হলেও তাঁর চিন্তাধারা বস্তুতঃ অকিঞ্চিৎকর এবং গতানুগতিক হয়ে থাকে।

এক একটি শতাব্দীতে মাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক মনীষী দীপ্ত মন, শৈলী ও সুরুচির

আধাররূপে বিরাজ করে থাকেন। তাঁদের কৃতির নিদর্শন মানবসমাজের অমূল্য সম্পদ্ বিশেষ। মধ্যযুগের লোকেরা যে পূর্ববর্তী পাঁচশত বৎসর কালেরও অধিক প্রাচীন জীবনকে আচ্ছন্নকারী কুসংস্কার ও অজ্ঞতার ঘন জলদজালের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছিলেন, তার মূলে আছে প্রাচীনকালের কতিপয় লেখকের অবদান।

আধুনিকপন্থীদের অন্তঃসারহীন ফ্যাসান-প্রীতির অবসান ঘটাবার জন্য এরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

[১৯৫২]

মানবতার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য

দেশালাইয়ের আবিষ্কারের ফলে মানবসভ্যতা যখন বিধ্বস্ত হয় নি, তখন নিউক্লিয়র চেন রিয়্যাকশানের আবিষ্কারের ফলেও মানবসভ্যতা ধ্বংস হওয়া উচিত নয়। আমাদের শুধু সর্বশক্তি প্রয়োগে এর দুরুপযোগ বন্ধ করতে হবে। যান্ত্রিক উন্নতির বর্তমান অবস্থায় একমাত্র যথেষ্ট শক্তি বিশিষ্ট কোন রাষ্ট্রোত্তর প্রতিষ্ঠানই আমাদের রক্ষা করতে পারে। কেবল এইটুকু আমাদের মাথায় ঢুকলে মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ কণ্টকমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় স্বার্থত্যাগ করার শক্তি আমরা খুঁজে পাব। সময়ে লক্ষ্যে উপনীত হতে না পারলে প্রত্যেকেরই দোষ আছে বুঝতে হবে। প্রত্যেকে অলসভাবে নিজের পরিবর্তে অপরের পদক্ষেপের প্রতীক্ষা করছে—বিপদ এইখানে।

প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিঃসন্দেহে এই শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রগতির প্রশস্তি গাইবেন। এমনকি যাঁরা একমাত্র যন্ত্রকৌশলের ক্ষেত্রে মাঝে-মধ্যে বৈজ্ঞানিক অবদানের পরিচয় পেতে অভ্যস্ত, তাঁরাও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের পূজারী। অবশ্য বিজ্ঞানের মৌলিক সমস্যাবলীর কথা স্মরণ রাখলে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক কৃতিকে অন্যায়ভাবে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হবে না। রেলগাড়িতে চড়ে যতক্ষণ শুধু একেবারে কাছের বস্তু দেখতে থাকব ততক্ষণ মনে হবে যে আমরা অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছি। তবে আমরা যদি উচ্চ পর্বত জাতীয় কোন নৈসর্গিক দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তা হলে সে দৃশ্য অত্যন্ত মন্থরগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হবে। বিজ্ঞানের মৌলিক সমস্যাবলী সম্বন্ধেও ওই একই কথা প্রযুজ্য।

আমার মতে 'আমাদের' বা রাশিয়ানদের 'জীবনযাত্রা পদ্ধতি'—এই-জাতীয় কথা না বলাই ভাল। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা এমন সব ঐতিহ্য ও প্রথা নিয়ে কারবার করছি, যা সমগ্রতার অধিকারী নয়। কোন্ প্রথা ও ঐতিহ্য মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং কোন্‌গুলি উপকারী, কোন্‌টা জীবনকে সুখী করবে এবং

কোন্‌টা দুঃখের কারণ হবে—এ কথা জিজ্ঞাসা করার অবশ্য একটা অর্থ আছে। বর্তমান মুহূর্তে আমাদের দেশে বা অন্য কোথাও মূর্ত হয়েছে, এসব বিবেচনা না করে যে প্রথা আমাদের কল্যাণকর বলে মনে হবে, আমরা তাকেই গ্রহণ করার প্রযত্ন করব।

এবার শিক্ষকদের বেতনের কথা আসে। সজীব সমাজে প্রতিটি প্রয়োজনীয় কার্যের বিনিময়ে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে। যে-কোন সমাজ-হিতকর কার্য সম্পাদন করার ফলে একটা মানসিক তৃপ্তি পাওয়া যায়; তবে এটা বেতনের অংশ নয়। মানসিক তৃপ্তি দিয়ে শিক্ষক মহাশয় তাঁর ছেলেমেয়েদের পেট ভরাতে পারেন না।

[১৯৫৩]

মানবের মূল্যায়ন

জীবনের এই মায়াজালে আপাদমস্তক আবদ্ধ আমাদের মত মানবকুল জীবনের মূল তথ্য সম্বন্ধে কদাচিৎ গভীরভাবে চিন্তা করে। আমরা জানি যে প্রত্যেক বৎসর সাত কোটি মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং এর দুই চার গুণ নবজাতক ধরণীর আলোক দর্শন করে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন এই অনন্ত জীবনপ্রবাহের অর্থ জানার প্রয়াস করেন? ধ্বংস হবার পরও কেন এই শরীর বার বার এই পৃথিবীতে আসে?

কয়েক বৎসর যাবৎ আমার মনে এই প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অবশেষে ১৯৫১ সনে আমি যখন প্যালেস্টাইনে যাই, তখন আকস্মিক ভাবে একটি ছোট্ট উপকথার ভিতর আমি এই প্রশ্নের জবাব পেলাম। সেই কাহিনীটির বক্তব্য হচ্ছে "পরমেশ্বর যে ছাঁচে এই ধরিত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, সেই ছাঁচেই মনুষ্যদেহ নির্মিত। উভয়ের ধর্মও অভিন্ন—অপরকে সহ্য করা এবং নিজেকে নিঃশেষ করা।"

এই কাহিনী আমার মনের সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। বাস্তব পক্ষে কে এই ধর্ম কতখানি পালন করছে এবং কতখানি সহ্য করছে ও নিজেকে কতটুকু উৎসর্গ করছে, তারই উপর তার দেহের যথার্থ মূল্যায়ন নির্ভর করে।

একটি সাক্ষাৎকার

আইনস্টাইন আমাদের সঙ্গে বসলেন এবং তাঁর একান্ত-সচিব চা এনে দিলেন। অধ্যাপকের প্রাথমিক প্রশ্নের পর আমাদের আলোচনা শুরু হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাত্মা গান্ধীর নিধন সংবাদ পেয়ে আমি বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম।

সমগ্র বিশ্বই এ ঘটনায় শোকাভিভূত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর হত্যাকারী এই উন্মাদ যুবক কে?" আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম ভারত ব্যবচ্ছেদের ফলে এক শ্রেণীর হিন্দু কিরকম উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তানে যখন হিন্দুদের নির্মমভাবে হত্যা ও লুণ্ঠন করা হচ্ছিল, ভারতবর্ষে গান্ধীজী তখন মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করছিলেন। তাই ভারতের এই মারমুখী হিন্দুর দল মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। এই দলের জনকয়েক যুবক মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে এবং অবশেষে তাদের পৈশাচিক পরিকল্পনা সফলও হয়।

ভারাক্রান্ত চিত্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আইনস্টাইন বললেন, "গান্ধী যেন এক জাদুকর ছিলেন। তাঁর কথা লোকরঞ্জন করবে কিনা তার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কখনও তিনি পুলিশের কাছে সহায়তা যাজ্ঞা করেন নি। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, ইতিপূর্বে তাঁকে আঘাতের প্রয়াস হয় নি। মহাপুরুষদের প্রতি এই-জাতীয় ঘৃণ্য ও শোকাবহ আচরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু গান্ধীর মৃত্যুই তাঁর শ্রেষ্ঠতম বিজয়-কীর্তি!"

স্বল্পকালীন বিরতির পর অধ্যাপক আইনস্টাইন আমাকে প্রশ্ন করলেন, "আর্থিক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী যে বিকেন্দ্রিত কুটীর-শিল্পের কথা বলতেন, তা কি মুখ্যতঃ ভারতের প্রতিই প্রযুজ্য, না তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য বিকেন্দ্রিত অর্থ-ব্যবস্থার কল্পনা করতেন?"

"আমি যতদূর জানি, গান্ধীজী চাইতেন যে সমগ্র পৃথিবীই বিকেন্দ্রিত আর্থিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গ্রহণ করুক। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, অহিংস সমাজের পক্ষে বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য।" শ্রীমণিলাল গান্ধী আমার বক্তব্যের সমর্থনে মাথা নাড়লেন। আইনস্টাইন কতকটা স্বগতোক্তির মত বলতে লাগলেন:

"আমিও বিশ্বাস করি যে, বিকেন্দ্রীকরণই সমাজের ভবিষ্যৎকাঠামো হবে। তবে কি ভাবে যে এ হবে, তা আমি জানি না। কেন্দ্রিত শাসক শক্তির তরফ থেকে অত্যাচার হবার সম্ভাবনা সদাই বিদ্যমান। বিশালকায় কেন্দ্রিত নগর ও শহর আমার কাছে একেবারে মারাত্মক বলে মনে হয়। আমি মনে করি যে স্থানীয় কেন্দ্রীকরণ সম্ভবপর। প্রত্যেককে তার জীবিকার জন্য কাজ করতে হবে। সমাজবাদে আমি গভীর ভাবে বিশ্বাসী।"

শ্রীমতী অগ্রবাল প্রশ্ন করলেন, "মানব ও মানব সমাজের নৈতিক স্তর উন্নত করার উপায় কি?"

আইনস্টাইন উত্তর দিলেন, "এর কোন শাশ্বত বিধান হয় না। প্রত্যেক নর নারীকে নিজের নৈতিক মান উন্নত করা আরম্ভ করতে হবে। আজ আমরা আত্মত্যাগের পরিবর্তে সাফল্যের গুণগান করি। আর এই জন্যই মানুষ উচ্চাভিলাষী

হয়ে পড়ে। এই মহত্বাকাঙ্ক্ষাই মানুষের চরম বৈরী। আমাদের সেবা করতে শিখতে হবে, টাকা রোজগারের দুষ্টচক্রে পড়লে চলবে না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন সংসাধন করার ব্যাপারে বিদ্যালয় সমূহ যথেষ্ট কাজ করতে পারে এবং এই ভাবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উন্নততর ও আনন্দময় হওয়া সম্ভব।"

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যার আলোচনা শোনার জন্য শ্রীমণিলাল গান্ধী বেসরকারী প্রতিনিধি হিসাবে আমেরিকায় এসেছিলেন। তিনি তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অধ্যাপক আইনস্টাইনের অভিমত জানতে উৎসুক ছিলেন।

"আপনি কি মনে করেন যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান তেমন কোন কাজ করতে সক্ষম হবে?"

আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন, "এর দোষ-ত্রুটীর কারণ এর জন্মকুণ্ডলীর মধ্যে নিহিত। এর স্রষ্টা হচ্ছে বিভিন্ন দেশের সরকার এবং সেগুলি কতিপয় বাধা ও সীমারেখার মধ্যে কাজ করে। তবে এই সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান কেন যে ভাল কাজ করতে পারবে না, তার কোন কারণ নেই।"

কয়েক মুহূর্ত থেমে তিনি আবার বলতে লাগলেন, "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের ভিতর যদি সত্যকার শান্তি সংবর্ধনকারী বেশ কিছু লোক থাকেন, তা হলেই এর সাফল্যের সম্ভাবনা। তবে সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, এই-জাতীয় সদভিপ্রায়যুক্ত ব্যক্তিদের উপরও প্রতিনিয়ত তাঁদের দেশের সরকারের চাপ পড়ে।"

শ্রীযুক্ত মণিলাল প্রশ্ন করলেন, "পরবর্তী যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?"

আইনস্টাইন বিষন্ন কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, "কে জানে কি হবে? তবে আমি জানি যে সমস্ত দেশের অধিকাংশ জনসাধারণই যুদ্ধ চায় না। সেনা বিভাগীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা যুদ্ধ ত্বরান্বিত হয় এবং আমি সত্য সত্যই বিশ্বাস করি যে এঁরা বিকৃতমস্তিষ্ক। কিন্তু এই সব পাগলের দল কি করে এমন চমৎকার ভাবে রাজ-নীতির খেলা খেলেন, সেইটাই আশ্চর্যের বিষয়।"

তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ অথচ সরস উক্তিতে আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।··· আমার স্ত্রী তাঁর য়্যালবামে আইনস্টাইনের হস্তাক্ষর ও একটি বাণী প্রার্থনা করলেন। তিনি নিম্নোদ্ধৃত অতীব তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যটি তাঁর য়্যালবামে লিখে দিলেন: "মানুষের কাছে মানুষের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই নেই।" *

---

* ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যক্ষ শ্রীমন নারায়ণজী ১৯৪৯ সনে তাঁর বিশ্বভ্রমণের সময় আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ শ্রীমন নারায়ণজীর 'দি টু ওয়ার্লডস' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হল।

স্বাধীনতা

ঘোষণাপত্র

যতদিন পর্যন্ত নিজের রুচি অনুযায়ী চলতে পারব, ততদিন আমি এমন এক দেশে বসবাস করব, স্বাভাবিক নিয়মে যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সহনশীলতা এবং আইনের চক্ষে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা বিদ্যমান। রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিতর মৌখিক এবং লিখিত ভাবে নিজ রাজনৈতিক অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার অন্তর্নিহিত এবং সহনশীলতা বলতে যাবতীয় ব্যক্তিগত মতের প্রতি শ্রদ্ধা বোঝায়।

আজকের জার্মানীতে এ অবস্থা নেই। আন্তর্জাতিক সদ্ভাবনা স্থাপনে যাঁরা সর্বাধিক প্রযত্ন করেছেন (এবং এঁদের ভিতর কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীও আছেন), তাঁদের আজ জার্মানীতে অযথা পীড়ন করা হচ্ছে।

দুঃখ কষ্টের পেষণে ব্যক্তি বিশেষের মত যে-কোন সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্জীবনও পর্যুদস্ত হয়ে যেতে পারে। সমগ্র জাতির পক্ষে অবশ্য এই বিপর্যয় সামলে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। আমি আশা করি যে শীঘ্রই জার্মানীতে আবার সুস্থ অবস্থা ফিরে আসবে এবং ভবিষ্যতে কাণ্ট এবং গ্যেটের মত জার্মানীর মহান সন্তানদের শুধু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে পূজাই হবে না, তাঁরা যে আদর্শ প্রচার করে গিয়েছিলেন জনজীবনে এবং সর্বসাধারণের চেতনায় তার প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে।

[১৯৩৩]

প্রুসিয়ার বিজ্ঞান আকাদমির সঙ্গে পত্রালাপ*

(১৯৩৩ সনের ১লা এপ্রিল আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে আকাদমির ঘোষণা)

ফ্রান্স এবং আমেরিকায় আলবার্ট আইনস্টাইন যে কুৎসা ছড়িয়ে বেড়িয়েছেন, সংবাদপত্র মারফত তার কথা প্রুসিয়ার বিজ্ঞান আকাদমির গোচরীভূত হয়েছে। এর জন্য অবিলম্বে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। ইতোমধ্যে আইনস্টাইন আকাদমি থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং পদত্যাগের কারণ স্বরূপ ঘোষণা করেছেন যে, বর্তমান শাসকবৃন্দের পরিচালনাধীন প্রুসিয়ান রাষ্ট্রের সেবা করতে তিনি অক্ষম। তিনি

---

* ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং বিচার-স্বাতন্ত্র্যের কণ্ঠরোধকারী নাৎসী রাষ্ট্রনায়কদের কার্যকলাপের সমালোচনা করায় আইনস্টাইনের উপর যে বিবিধ প্রকারের আঘাত আসে, এ-ঘটনা তার অন্যতম। অনুঃ

সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক বলে সম্ভবতঃ প্রুসিয়ার নাগরিকত্বও বর্জন করেছেন। ১৯১৩ সনে আকাদমির পূর্ণ মর্যাদাবিশিষ্ট সদস্য হবার ফলে স্বতঃই তিনি প্রুসিয়ার নাগরিকত্বের অধিকার পেয়েছিলেন।

আইনস্টাইন বিদেশে গিয়ে আন্দোলনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করায় প্রুসিয়ার বিজ্ঞান আকাদমি সবিশেষ দুঃখিত; কারণ আকাদমি এবং তার সদস্যবর্গ বরাবরই প্রুসিয়ান রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ এবং কোন প্রকারের দলগত রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও তাঁরা সর্বদা জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উপর জোর দিয়ে এসেছেন এবং তার অনুগত থেকেছেন। সুতরাং আইনস্টাইনের পদত্যাগ তাঁদের পক্ষে অনুতাপের কারণ হয় নি।

অধ্যাপক ডঃ আর্নেস্ট হেম্যান
স্থায়ী সম্পাদক

প্রুসিয়ান বিজ্ঞান আকাদমি সমীপেষু,

অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে আমি অবগত হয়েছি যে প্রুসিয়ার বিজ্ঞান আকাদমি এক সরকারী বিবৃতিতে "আমেরিকা ও ফ্রান্সে আইনস্টাইনের কুৎসা রটনা কার্যের" উল্লেখ করেছেন।

আমি ঘোষণা করছি যে কোন রকম কুৎসা রটনায় কখনও আমি বিন্দুমাত্র ভাগ নিই নি এবং কুত্রাপি আমি এ-জাতীয় দুরাচারণ দেখিও নি। জনগণ সাধারণতঃ জার্মান সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সরকারী বিবৃতি ও হুকুমনামা পুনরুদ্ধৃত করে এবং তার সমালোচনা করেই যথেষ্ট করা হয়েছে বলে মনে করেছ। জার্মান সরকার কর্তৃক আর্থিক চাপ প্রয়োগ করে জার্মান ইহুদি নির্মূল করার কার্যক্রম সম্বন্ধে তারা আলোচনা করেছে।

সংবাদপত্রে আমি আকাদমির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেবার অভিলায ব্যক্ত করে ও আমার প্রুসিয়ার নাগরিকত্বঅধিকার বর্জন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে বিবৃতি দিয়েছিলাম। এর কারণ স্বরূপ আমি বলেছিলাম যে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি আইনের চক্ষে সমান নয় এবং স্বাধীন ভাবে নিজ অভিমত ব্যক্ত করা ও নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা দেবার স্বাতন্ত্র্য যেখানে নেই, সে দেশে আমি থাকতে চাই না।

এছাড়া, জার্মানীতে অনুষ্ঠিত বর্তমান ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি এই মন্তব্য করি যে, এটা জনসাধারণের মানসিক ব্যাধির পরিচায়ক এবং এর কারণ সম্বন্ধেও কিছু মন্তব্য করি।

"সেমিটিক বিরোধী" আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য যে আন্তর্জাতিক

সজ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি-আকর্ষণ-কার্যে সহায়তা হবে বলে তাদের হাতে আমি একটি লিখিত রচনা দিই; কিন্তু সেটি মোটেই সংবাদপত্রে প্রচারের জন্য রচিত হয় নি। যেসব বিবেকবান ব্যক্তি এখনও সভ্যতার আদর্শে বিশ্বাস করেন এবং মনে করেন যে বর্তমানে সভ্যতা নিতান্ত বিপদাপন্ন, ওই বিবৃতিটিতে আমি তাঁদের এই পাইকারী মানসিক ব্যাধির প্রকোপ রুদ্ধ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হতে আবেদন জানাই এবং যে ভীষণ রোগের উপসর্গ আজ জার্মানীতে অতীব নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা যাতে আর না ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য তৎপর হতে অনুরোধ করি।

আমার সম্বন্ধে আকাদমি যেরকম বিবৃতি প্রচার করেছে, তা করার পূর্বে আমার বক্তব্যের যথার্থ মর্ম সংগ্রহ করা আকাদমির পক্ষে কঠিন হত না। জার্মানীর সংবাদপত্রসমূহ সজ্ঞানে আমার বক্তব্যের বিকৃত বিবরণ পরিবেশন করেছে। অবশ্য আজকালকার সংবাদপত্রসমূহের মুখে কাপড় গোঁজা বলে এর বেশী সত্য ভাষণ তাদের কাছে আশাও করা যায় না।

যে বক্তব্য আমি প্রচার করেছি, তার প্রত্যেকটি কথার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। এর বিনিময়ে আমি আশা করি যে আকাদমি যেন আমার এই বক্তব্য তার সদস্যবর্গ ও যাদের কাছে আমার কুৎসা রটনা করা হয়েছে সেই জার্মান জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়। জনসাধারণের চোখে আমাকে হেয় করার প্রচেষ্টায় আকাদমির হাত আছে বলে বিশেষভাবে এ দায়িত্ব আকাদমির নেওয়া উচিত।

ফ্যাসিবাদ ও বিজ্ঞান

(ইটালীর মন্ত্রী সিনর রোক্কোকে লিখিত পত্র)

সবিনয় নিবেদন,

ইটালীর দুইজন প্রথিতযশা এবং শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞান-সেবক তাঁদের ধর্মসংকটের কথা জানিয়ে আমাকে এই মর্মে অনুরোধ করেছেন যে, সম্ভব হলে আমি যেন ইটালীতে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের উপর যে নিষ্ঠুর নির্যাতনের পালা চলছে, তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করার জন্য আপনাকে লিখি। ফ্যাসিস্ট প্রথার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনার্থ যে শপথ গ্রহণ করার ব্যাপার চলছে, আমি তার কথাই উল্লেখ করছি। আমার অনুরোধের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আপনি দয়া করে সিনর মুসোলিনীকে পরামর্শ দিন যে তিনি যেন ইটালীর বুদ্ধিজগতের এই সব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ঈদৃশ অবমাননার হাত থেকে অব্যাহতি দেন।

আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস যতই পৃথক্ হোক না কেন, আমি জানি একটি বিষয়ে আমরা সহমত। ইউরোপীয় মানসের প্রগতিশীল অবদানসমূহকে আমরা

উভয়েই ভালবাসি ও তার ভিতর বৃহত্তম বৃত্তির অভিপ্রকাশ দেখি। এই সব অবদানের ভিত্তিভূমি হচ্ছে চিন্তা ও শিক্ষণের স্বাধীনতা। সত্যের অনুসন্ধানস্পৃহা অন্য সকল প্রকার স্পৃহার উর্ধ্বে—এই নীতির উপর এর আধার। এই ভিত্তির উপরই গ্রীসে আমাদের সভ্যতার পত্তন হয়েছিল এবং ইটালীতে রেণেসাঁসের যুগে এর পুনর্জন্ম হয়েছিল। হুতাত্মাদের রক্তধারায় এই সুমহান অবদানের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে এবং এই সব শুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদের জন্য আজও ইটালী সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার আকর।

রাষ্ট্রের খাতিরে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কতটা সংকোচন চলতে পারে তা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ লাভালাভের সম্পর্কবিরহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসন্ধিৎসা প্রত্যেক সরকার কর্তৃক পবিত্র বলে বিবেচিত হওয়া বিধেয় এবং সকলের মঙ্গলের জন্য সত্যের খাঁটি সেবকদের শান্তিতে থাকতে দেওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে ইটালীয়ান রাষ্ট্রের হিত এবং বিশ্বের কাছে তার মর্যাদা এতে বৃদ্ধি পাবে।

আশা করি আমার আবেদন বৃথা যাবে না।

[১৯৩৪]

আপনার অনুগত
আলবার্ট আইনস্টাইন

মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকামীদের সম্মেলনে

আজ আমরা এখানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রদত্ত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শিক্ষাদানের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সমবেত হয়েছি। এই সঙ্গে পূর্বোক্ত উভয়বিধ স্বাধীনতা আজ যে চরম সংকটের সম্মুখীন তার প্রতি বুদ্ধিজীবি-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও আমাদের লক্ষ্য।

কেন এ অবস্থার সৃষ্টি হল? কিসের জন্য অতীতের তুলনায় এখনকার সংকট অধিকতর বিপজ্জনক? কেন্দ্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থা আজ এ দেশের অল্প কয়েকজন নাগরিকের হাতে অমিত উৎপাদিকাশক্তি বিশিষ্ট পুঁজি পুঞ্জীভূত করেছে। এই ক্ষুদ্রায়তন ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী দেশের যুবকদের শিক্ষাদানরত প্রতিষ্ঠান এবং বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলির উপর অত্যধিক কর্তৃত্ব করে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উপরও এদের অসীম প্রভাব। কেবল এইটুকুই জাতির মানস-স্বাধীনতার বিকাশের পথে গুরুতর বাধা স্বরূপ। কিন্তু এতদতিরিক্ত অপর একটি প্রশ্নও আছে। অর্থ-ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের এই প্রক্রিয়ার পরিণামে এক অভিনব সমস্যা দেখা দিয়েছে। দেশের কর্মক্ষম শ্রমশক্তির একাংশ স্থায়ী বেকারত্বের করাল গ্রাসে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ-ব্যবস্থার উপর ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রণ জারী করে এ সমস্যার

সমাধানের প্রয়াস করছেন। অর্থাৎ সরকার সরবরাহ ও চাহিদা রূপী মৌলিক অর্থনৈতিক ধারা-প্রবাহের তথাকথিত স্বাধীন ক্রিয়ার প্রভাব হ্রাস করবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু পরিস্থিতি মানুষের চেয়েও বলশালী। অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ওই মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তি ইতোপূর্বে একরকম স্বৈরতন্ত্রী ছিল ও তারা তাদের কার্যকলাপের জন্য কারও কাছে দায়ী ছিল না। তারা এখন জনগণের কল্যাণার্থ তাদের উপর প্রযুক্ত বিধিনিষেধের তীব্র বিরোধিতা করছে। এই ক্ষুদ্রকায় গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের আয়ত্তাধীন যাবতীয় আইনের ব্যবস্থার শরণ নিচ্ছে। এ দেশে জনজীবনের সুষ্ঠু ও শান্তিময় বিকাশের জন্য এই সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান আহরণ তরুণ সম্প্রদায়ের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও তারা যে বিদ্যানিকেতনসমূহ ও সংবাদপত্রের উপর তাদের অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে তরুণ সম্প্রদায়কে এ সম্বন্ধে অচেতন রাখবে—এতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

এই কারণেই আমরা সম্প্রতি পুনঃ পুনঃ দেখতে পেয়েছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীব সুযোগ্য অধ্যাপকদের তাঁদের সহকর্মীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পদচ্যুত করা হয়েছে এবং সংবাদপত্রসমূহ এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে বিশেষ কোন খবর দেয় নি। অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বশালী এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি-গোষ্ঠীর চাপের কারণেই শিক্ষকদের শপথ গ্রহণ করার শোচনীয় প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাদানের স্বাধীনতা সংকুচিত করা। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষাদানের স্বাধীনতা এবং পুস্তক ও সংবাদপত্র ইত্যাদি মারফত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যে কোন জাতির সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে বনিয়াদ স্বরূপ। ইতিহাসের, বিশেষতঃ এর নিতান্ত সাম্প্রতিক অধ্যায়গুলির শিক্ষা এ দিক থেকে অতীব স্পষ্ট। তাই এই স্বাধীনতা রক্ষা ও এর সংবর্ধনের জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রাম করা প্রত্যেকের পবিত্র কর্তব্য। আর প্রত্যাসন্ন সংকট সম্বন্ধে জনমতকে সজাগ রাখার জন্য সর্ববিধ প্রকারে নিজ প্রভাব প্রয়োগ করার দায়িত্বও আমাদের রয়েছে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের সম্মুখস্থ বিরাট আর্থিক সমস্যার সমাধান হলেই কেবল এ সব সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতা বজায় রেখে এর অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। তা ছাড়া চরমতম ক্ষতির সম্ভাবনা রোধ করারও এই একমাত্র পন্থা।

অতএব আমরা সকলে যেন আমাদের শক্তি সংহত করি। আমরা প্রত্যেকে যেন নিরলস সতর্কতার প্রতীক হই। ভবিষ্যতে এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী-সমাজ সম্বন্ধে যেন এ কথা বলার রাস্তা না থাকে যে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া

ঐতিহ্য-সম্পদ্‌কে তাঁরা ভীরুর মত বিনা সংগ্রামে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন ; কারণ এ ঐতিহ্য-সম্পদ্ লাভ করার যোগ্যতা তাঁদের ছিল না।

[১৯৩৬]

স্বাধীনতা সম্বন্ধে

মৌলিক মূল্যবোধ বিচার (Value judgment) সম্বন্ধে তর্ক করতে যাওয়া যে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার এ আমার জানা আছে। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ যদি ধরাতল থেকে মানব জাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে এক আদর্শ বলে গ্রহণ করেন, তবে যুক্তি দিয়ে কেউ তাঁর দৃষ্টিকোণকে নস্যাৎ করতে পারবেন না। তবে কোন বিশেষ আদর্শ বা মূল্যবোধ সম্বন্ধে প্রথমে যদি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তার পর লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থা নিয়ে যুক্তি-প্রমাণ সহযোগে তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে। আমরা তাই প্রথমে দুটি লক্ষ্য নির্ধারণ করব। আশা করা যায় যে এই রচনার প্রায় প্রত্যেকটি পাঠকই এগুলি সম্বন্ধে একমত হবেন।

১। মানবসমাজের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে সব পণ্য প্রয়োজন তা সকলের যথাসম্ভব কম পরিশ্রমে উৎপন্ন করতে হবে।

২। জৈব প্রয়োজন পূর্তি অবশ্যই সন্তোষজনক ভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখার পূর্ব-শর্ত। তবে এ-ই যথেষ্ট নয়। মানুষকে তাই তৃপ্ত হতে হলে স্বকীয় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী তার মানসিক ও শৈল্পিক দক্ষতা বিকাশের চূড়ান্ত সুযোগ দিতে হবে।

উপরিউক্ত লক্ষ্যদ্বয়ের প্রথমটির পরিপূর্তির জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম এবং সমাজ-পদ্ধতির অভিব্যক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞানের পরিপুষ্টি অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সমুন্নতি প্রয়োজন। কারণ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা স্বভাবতঃই অখণ্ড। এর এক অংশ অপর অংশকে এমন ভাবে সহায়তা করে যে বলতে গেলে সে সম্বন্ধে কেউ আগেভাগে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। অবশ্য বিজ্ঞানের প্রগতি বলতে পূর্বেই এ কথা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, জ্ঞানান্বেষণ প্রচেষ্টার যাবতীয় পরিণাম এবং সর্ববিধ বিচারধারা অবাধে সর্বজনসুলভ করা যাবে। অর্থাৎ বুদ্ধিচর্চার সকল ক্ষেত্রে সদাসর্বদা মত-প্রকাশ এবং শিক্ষাদানের স্বাধীনতা থাকবে। স্বাধীনতা বলতে আমি এই বোঝাতে চাই যে, এমন সামাজিক পরিবেশ থাকবে যেখানে জ্ঞানের সাধারণ বা বিশেষ ক্ষেত্রে নিজ মত বা বিশ্বাস অনুযায়ী যে কোন রকম অভিমত ব্যক্ত করার জন্য কাউকে বিপদ বা মারাত্মক অসুবিধায় পড়তে হবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিকাশ ও পরিব্যাপ্তির জন্য এইরকম মতপ্রচারের স্বাধীনতা অপরিহার্য এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে বহু কিছু চিন্তনীয় রয়েছে। প্রথমতঃ আইন দ্বারা এ অধিকার রক্ষার

প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। তবে কেবল আইন প্রণয়ন দ্বারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। কোনরূপ উৎপীড়নের আশঙ্কা না করেই যাতে সকলে স্বাধীন ভাবে মতপ্রকাশ করতে পারে তার জন্য সমগ্র জনসাধারণের ভিতর সহনশীলতাবৃত্তি থাকা প্রয়োজন। এ-জাতীয় বাহ্য স্বাধীনতার আদর্শ কদাচ পূর্ণতঃ রূপায়িত করা সম্ভব নয়; তবে বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং দার্শনিক ও সৃষ্টিধর্মী মননের যথাসাধ্য বিকাশ সাধন করতে হলে এর জন্য অবিশ্রান্ত প্রয়াস করে যেতে হবে।

দ্বিতীয় লক্ষ্য, অর্থাৎ প্রতিটি মানবের আধ্যাত্মিক বিকাশ-সম্ভাবনা কাম্য হলে অন্য এক ধরনের বাহ্য স্বাধীনতা প্রয়োজন। জীবনযাত্রা নির্বাহোপযোগী উপকরণ সংগ্রহের জন্য মানুষকে যেন এতটা পরিশ্রম না করতে হয় যাতে ব্যক্তিগত কার্য-সম্পাদনের জন্য তার সময় বা উদ্যম দুইয়েরই অনটন হয়। এই দ্বিতীয় প্রকারের বাহ্য স্বাতন্ত্র্য ব্যতিরেকে তার কাছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিরর্থক। শ্রম বিভাজনের সমস্যা যুক্তিসঙ্গত ভাবে নিষ্পন্ন করতে পারলে যন্ত্র-কৌশলের প্রগতি এবংবিধ স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে দেবে।

বিজ্ঞান এবং সাধারণভাবে জীবনের সর্ববিধ সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়াকলাপের প্রগতির জন্য এ ছাড়া আর এক ধরনের স্বাধীনতা চাই। একে বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা বলতে বোঝায় শাস্ত্র-শাসন এবং সামাজিক কুসংস্কারজনিত বিধিনিষেধের প্রভাব পরাভূতকারী এবং অদার্শনিকোচিত ছককাটা নিগড় ও গতানুগতিক অভ্যাসের বন্ধন ছিন্নকারী স্বাধীন বুদ্ধিযুক্ত চিন্তা। অন্তর্লোকের এই স্বাধীনতা প্রকৃতির বিরল প্রসাদ এবং ব্যক্তির পক্ষে পরমারাধ্য ধ্যেয়। সমাজ তবু এই অভীষ্ট পরিপূরণার্থ বহুল-পরিমাণ সহায়তা দান করতে পারে—অন্ততঃ এর সম্যক্ বিকাশের পথে বাধাদান করা থেকে বিরত থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বিদ্যালয়সমূহ স্বেচ্ছাচার-মূলক প্রভাব বিস্তার ও বালকবালিকাদের উপর অত্যধিক পরিমাণ আধ্যাত্মিক বোঝা চাপিয়ে অন্তর্লোকের স্বাধীনতা-বিকাশ কার্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে। পক্ষান্তরে স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহিত করে বিদ্যালয় আবার এরূপ স্বাধীনতা বৃদ্ধির সহায়কও হতে পারে। সতত সচেতন ভাবে যদি মানুষের বাহ্য এবং অন্তর্লোকের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করা যায়, মাত্র তা হলেই আধ্যাত্মিক বিকাশ ও পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং শুধু এই পদ্ধতিতেই মানবের বাহ্য ও অন্তর্জীবনের উন্নতি সম্ভবপর।

[১৯৪০]

নিগ্রোদের প্রশ্ন

এ কথা এমন এক ব্যক্তি লিখছে, যে আমেরিকায় আপনাদের সঙ্গে দশ বৎসরেরও কিছু অধিককাল বসবাস করেছে। এবং যথোচিত গুরুত্ব ও সতর্কতার সঙ্গেই

এ কথা লেখা হচ্ছে। অনেক পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, "যে সব ব্যাপার কেবল আমাদেরই বিবেচ্য ও যে বিষয়ে কোন নবাগতের নাক গলানো উচিত নয়, সে সম্বন্ধে ওঁর বলার কি অধিকার আছে?"

আমি এ-জাতীয় দৃষ্টিকোণ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না। কোন এক বিশেষ পরিবেশের ভিতর কেউ মানুষ হলে সেই পরিবেশের অনেক কিছুকেই সে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করে থাকে। পক্ষান্তরে পরিণত বুদ্ধির কোন মানুষ এ দেশে এলে তার পক্ষে এ দেশের বিচিত্র বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সব কিছুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা স্বাভাবিক। আমার মতে এ রকম ব্যক্তি যা দেখছে বা যা অনুভব করছে, তা তার নিঃসংকোচে ব্যক্ত করা উচিত। কারণ এ রকম করলে তার উপযোগিতা সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে।

কোন নবাগন্তক যার জন্য অতি সত্বর এ দেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা হচ্ছে এ দেশবাসীর গণতান্ত্রিক স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। এ দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংবিধান যতই প্রশংসাযোগ্য হোক না কেন, আমি অবশ্য এ ক্ষেত্রে তার কথা চিন্তা করছি না। আমি এখানে ব্যক্তি-মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা বলছি। তাদের পরস্পরের প্রতি যে মনোভাব বিদ্যমান, আমি তার উপরই জোর দিচ্ছি।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেকেই ব্যক্তি হিসাবে তার নিজের যে মূল্য আছে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ বোধ করে। কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর কাছে মস্তকাবনত করতে হয় না। কাঞ্চনকৌলীন্যের দুস্তর পার্থক্য বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রবল প্রতাপ—কোন কিছুই অপরের মর্যাদার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ভাব এবং মানুষের সুস্থ আত্মবিশ্বাসকে শিথিল করতে পারে না।

তবে আমেরিকাবাসীর সামাজিক দৃষ্টিকোণের ভিতর একটি কলঙ্ক-রেখাও আছে। তাঁদের সমতা ভাবনা ও মানব-মর্যাদাবোধ মুখ্যতঃ শ্বেতকায়দের ভিতরই সীমাবদ্ধ। এমনকি শ্বেতকায়দের ভিতরও নানা বাছবিচার করা হয়। ইহুদি হিসাবে আমি এ সম্বন্ধে বেশ ভালভাবেই সচেতন। তবে "শ্বেতকায়রা" তাদের সাথী-নাগরিক কৃষ্ণকায়দের প্রতি, বিশেষতঃ নিগ্রোদের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করেন, তার তুলনায় এ ব্যাপার কিছুই নয়। নিজেকে আমি যতই অধিক মাত্রায় আমেরিকাবাসী বলে ভাবি, ততই এ ব্যাপারের জন্য সমধিক পীড়া বোধ করি। একমাত্র এ সম্বন্ধে যদি আমি মন খুলতে পারি, তা হলেই কেবল পাপের ভাগী হবার ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব।

অনেক সৎ ব্যক্তি বলতে পারেন, "এ দেশে নিগ্রোদের সঙ্গে একত্র থাকার পরিণামে যে দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তারই ফলে আমাদের নিগ্রো

সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ গড়ে উঠেছে। বুদ্ধিবৃত্তি, দায়িত্ববোধ বা সততা—কোন দিক থেকেই নিগ্রোরা আমাদের সমকক্ষ নয়।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পূর্বোক্ত ধারণা দ্বারা চালিত প্রতিটি ব্যক্তিই এক মারাত্মক ভ্রমের শিকার। আপনাদের পূর্বপুরুষরা এই সব কৃষ্ণকায়দের জোর করে তাদের বাস্তুভিটা থেকে টেনে নিয়ে এসেছিলেন এবং শ্বেতকায়দের অর্থলালসা ও বিলাস-ব্যসনপূর্ণ জীবনের খোরাক জোটাবার জন্য এদের নির্মম ভাবে পদদলিত করে রাখা হয়েছে এবং এদের সর্বপ্রকারে শোষণ করে ঘৃণ্য কৃতদাসের পর্যায়ে টেনে নামানো হয়েছে। নিগ্রোদের বিরুদ্ধে আজকে যে গোঁড়ামি দেখা যায়, তা এই অগৌরবজনক অবস্থা বজায় রাখার অভিসন্ধি মাত্র।

প্রাচীন কালের গ্রীকদেরও কৃতদাস ছিল। তবে তারা নিগ্রো ছিল না, তারা ছিল যুদ্ধবন্দী শ্বেতকায় মানব। তাদের ক্ষেত্রে বর্ণগত গুণাগুণের পার্থক্যের কথাই উঠতে পারে না। অথচ অ্যারিস্টটলের মত একজন অনন্যসাধারণ গ্রীক দার্শনিক কৃতদাসদের নিম্ন শ্রেণীর জীব বলে অভিহিত করেন এবং তাঁর মতে তাদের স্বাধীনতা হরণ করে অবদমিত করে রাখা সঙ্গত কার্য ছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই ক্ষেত্রে তিনি এক সুপ্রাচীন কুসংস্কার ও গোঁড়ামির জালে আবদ্ধ ছিলেন এবং অলোক-সামান্য প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে এই পূর্ব-সংস্কার-বন্ধন-মুক্ত-হওয়া সম্ভব হয় নি।

শৈশবকালে আমাদের পরিবেশ থেকে যে সব বিচারধারা ও প্রক্ষোভ (emotions) আমরা অচেতন ভাবে গ্রহণ করি, বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকাংশই তদনুযায়ী গঠিত হয়। অর্থাৎ জন্মগত প্রবণতা (aptitude) ও গুণাবলীর কথা বাদ দিলে পরিবেশলব্ধ সংস্কারই আমাদের বর্তমান স্বরূপ গড়ে তোলে। আমাদের আচরণ ও বিশ্বাসের উপর সংস্কারের শক্তিশালী প্রভাবের তুলনায় সচেতন চিন্তার প্রভাব কত ক্ষীণবল—এ কথা আমরা কদাচিৎ বিচার করি।

অবশ্য সংস্কারকে তুচ্ছজ্ঞান করা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ নয়। তবে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বর্তমানাপেক্ষা কল্যাণকর আদর্শাভিমুখে নিয়ে যেতে হলে আমাদের ক্রম-বর্ধমান আত্মচেতনা ও বর্ধিষ্ণু বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় সংস্কারকে বল্গাবদ্ধ করে একে ক্রমশঃ বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে চালিত করতে হবে। প্রচলিত সংস্কারের ভিতর যা কিছু আমাদের ভবিষ্যৎ ও মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকারক তাকে চেনার চেষ্টা করতে হবে এবং তার পর আমাদের জীবনের নব রূপায়ণের প্রয়াস করতে হবে।

আমার বিশ্বাস, যে-কেউ সততা সহকারে এ সব বিষয়ে চিন্তা করবেন তিনিই অনতিবিলম্বে উপলব্ধি করবেন যে, নিগ্রোদের বিরুদ্ধে এই চিরাচরিত সংস্কার কী রকম অগৌরবজনক এবং কী মারাত্মক ব্যাপার।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই দৃঢ়মূল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সদিচ্ছা-প্রণোদিত ব্যক্তির কর্তব্য কি? কথায়-এবং কাজে স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবার সংসাহস তাঁর থাকা চাই এবং তাঁর সন্তানসন্ততি যাতে বর্ণবৈষম্যের এই বিষাক্ত প্রভাবের শিকার না হয় তার প্রতি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

এই গভীরমূল পাপ দূরীকরণের কোন সহজ পন্থা আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে এই লক্ষ্যের পরিপূর্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন ন্যায়বিচারক ও সদিচ্ছাপ্রবণ ব্যক্তির কাছে এই বোধের চেয়ে অধিকতর সন্তোষজনক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না যে, তাঁর কর্মশক্তির শ্রেষ্ঠতম অংশ এক মহান্ আদর্শের সেবার জন্য তিনি উৎসর্গ করেছেন।

[১৯৪৬]

মানবীয় অধিকার

ভদ্রমহোদয় এবং মহোদয়াগণ,

মানবীয় অধিকারের সমস্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য আজ আপনারা এখানে একত্র হয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে আপনারা আমাকে পুরস্কৃত করতে মনস্থ করেছেন। আপনাদের এই সিদ্ধান্তের কথা প্রথম যখন আমি জানতে পারি তখন কেমন যেন হতোৎসাহ বোধ করেছিলাম। এ সম্মান পাবার যোগ্যতর কোন প্রার্থী আমাদের সমাজে নেই জেনে মনে হল যে আমাদের সমাজের আজ কী ভীষণ দুরবস্থা!

জীবনের দীর্ঘ কাল আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাকৃতিক সত্তার গঠন সম্বন্ধে কিছুটা গভীরতর পরিজ্ঞান লাভের সাধনা করেছি। জীবনে কদাচ আমি বিধিবদ্ধ ভাবে মানুষের ভাগ্যের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা করি নি বা অবিচার, দমন-নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হই নি। চিরাচরিত মানবীয় সম্পর্কের উন্নতি সাধনকল্পেও আমি উল্লেখযোগ্য কিছু করি নি। একমাত্র কাজ যা আমি করেছি তা হচ্ছে এই যে, দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে মাঝে মাঝে আমি সর্বসাধারণের শুভাশুভের সঙ্গে জড়িত সমস্যাবলী সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছি। যখন আমার মনে হয়েছে যে এখনও নীরব থাকার অর্থ হচ্ছে দুষ্কর্মের পাপের ভাগী হওয়া, তখনই মাত্র আমি মুখ খুলেছি।

মানবীয় অধিকারের অস্তিত্ব এবং ন্যায্যতা নক্ষত্রমণ্ডলীর বক্ষে উৎকীর্ণ নেই। ইতিহাসের গতিপথে মানুষের পারস্পরিক আচরণের আদর্শ এবং মানবসমাজের গঠনপদ্ধতির বাঞ্ছিত রূপ প্রজ্ঞাদৃষ্টি সম্পন্ন মহাপুরুষদের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়েছে এবং তাঁরা এর পাঠও দিয়ে গেছেন। সৌন্দর্য ও শান্তির জন্য আকুল অভিলাষ জনিত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফলে পূর্বোক্ত যে সব আদর্শ এবং বিশ্বাস মানব-সমাজ কর্তৃক অন্ততঃ নীতিগত ভাবে আশু গৃহীত হয়েছে, জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় তাকেই

আবার যুগে যুগে সেই সব মানুষ নির্মম ভাবে পদদলিত করেছে। সুতরাং ইতিহাসের এক প্রধান অংশ পূর্বোক্ত মানবীয় অধিকার রক্ষার সংগ্রামের বিবরণে পরিপূর্ণ। শাশ্বত কালের এই সংগ্রামে কোনদিনই চূড়ান্ত বিজয় লাভ করা যাবে না। কিন্তু সে সংগ্রামে ক্ষান্তি দেবার অর্থ মানবসমাজকেই ধ্বংস হতে দেওয়া।

মানবীয় অধিকার বলতে আজ আমরা মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত দাবিগুলির প্রতি ইঙ্গিত করছি ঃ মানুষের অধিকার হরণের জন্য ব্যক্তিবিশেষ বা সরকারের স্বেচ্ছাচার-মূলক ক্রিয়াকলাপের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা; কাজ করার এবং কাজ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক পাবার অধিকার; আলোচনা এবং মত প্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতা; রাষ্ট্র পরিচালন ব্যাপারে ব্যক্তির যথোচিত অধিকার। এই সকল মানবীয় অধিকার আজ কাগজে কলমে স্বীকৃত। তবে মাত্র একপুরুষ কাল পূর্বের তুলনায় আজ এসব অধিকার বহুবিধ নিয়মতান্ত্রিক এবং বৈধানিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে ভীষণভাবে বিড়ম্বিত। আর একটি মানবীয় অধিকার রয়েছে, যার কথা খুব বেশী উল্লিখিত না হলেও ভবিষ্যতে এই অধিকারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে অনুমিত হয়। এর নাম হচ্ছে অসহযোগিতা করার অধিকার বা কর্তব্য। অর্থাৎ যে সকল কাজ ভ্রান্ত বা ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হবে তার সঙ্গে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকার অধিকার। সৈনিক হিসাবে কাজ করতে অস্বীকার করাকে এই তালিকার শীর্ষে স্থান দিতে হবে। আমি এমন বহু উদাহরণ জানি যে-ক্ষেত্রে অসাধারণ নৈতিক ও চারিত্র শক্তির অধিকারী ব্যক্তিদের শুধু এই কারণে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারার্থ গঠিত নুরেমবার্গ আদালত কার্যতঃ যে নীতির স্বীকৃতির উপর আধারিত ছিল তা হচ্ছে এই যে, সরকারের হুকুমে অনুষ্ঠিত হলেও পাপাচার ক্ষমার্হ নয় এবং বিবেক রাষ্ট্রীয় আইনেরও উর্ধ্বে।

আমাদের যুগে প্রধানতঃ রাজনৈতিক বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য এবং বিচার বিনিময় ও গবেষণা আর শিক্ষাদানের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম চলছে। সাম্যবাদের আতঙ্কে এদেশে এমন সব কার্যকলাপ চলেছে সভ্য জগতের কাছে যা বুদ্ধিরও অগম্য এবং এর ফলে আমাদের দেশকে বিদ্রূপাস্পদ হতে হচ্ছে। আর কতদিন আমরা এই সব ক্ষমতা-ক্ষুধা লোলুপ রাজনীতিকদের বরদাস্ত করব?

[১৯৫৪]

রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে

আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের অবস্থা সম্বন্ধে আপনাদের পত্রিকায় যে প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার অভিমত জানতে চেয়েছেন। এ সমস্যার বিস্তারিত পর্যালোচনার পরিবর্তে আমি বরং একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দ্বারা আমার

মনোভাব ব্যক্ত করব : আজ যদি আমি কোন তরুণ যুবক হতাম এবং আমাকে যদি ভবিষ্যতের পেশা নির্বাচন করতে হত, আমি তা হলে বৈজ্ঞানিক, গবেষক বা অধ্যাপক হতাম না। বর্তমানের এই অবস্থায় যেটুকু নামমাত্র স্বাধীনতা এখনও পাওয়া সম্ভব, তার আশায় আমি বরং কর্মকার বা ফেরীওয়ালার বৃত্তি বেছে নিতাম।

[১৯৫৪]

অহিংস অসহযোগই নিষ্কৃতির একমাত্র পথ

এদেশের বুদ্ধিজীবীদের সম্মুখে আজ এক গুরুতর সমস্যা সমুপস্থিত। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিশারদরা জনসাধারণের চোখের সামনে এক বহিরাগত বিপদের আতঙ্ক ঝুলিয়ে রেখে যাবতীয় মানসিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে একটা সন্দেহের ভাব সৃষ্টিতে সফলকাম হয়েছেন। এই ভাবে সাফল্য অর্জন করার পর তাঁরা এবার শিক্ষাদানের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন। অর্থাৎ যাঁরা আনুগত্যের প্রমাণ দিতে পারবেন না, তাঁদের ভাতে মারার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

এই পাপের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর কি করণীয়? সত্য কথা বলতে কি, আমি গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগের বৈপ্লবিক পন্থা ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখি না। যে-কোন বুদ্ধিজীবীকে এই সব সাক্ষ্য কমিটীর* কাছে হাজির হতে বলা হোক না কেন, তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করবেন। অর্থাৎ তাঁকে কারাবরণ করতে এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রে উৎসন্নে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সংক্ষেপে তাঁকে নিজ দেশের সাংস্কৃতিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত মঙ্গল বলি দিতে হবে।

অবশ্য সাক্ষ্যদানে ওই অস্বীকৃতি সম্ভাব্য আত্ম-দোষ এড়ানোর চেষ্টার উপর আধারিত হবে না। এই অস্বীকৃতির মূলে রয়েছে এই কথা সপ্রমাণ করার প্রয়াস যে, কোন নির্দোষ নাগরিকের পক্ষে এই জাতীয় তদন্ত কমিটীর সামনে সাক্ষ্য দেওয়া লজ্জার বিষয় এবং এইরূপ তদন্ত সংবিধানের আদর্শের পরিপন্থী।

যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি এই সুকঠিন পন্থা অবলম্বন করলে তাঁদের সাফল্য অবধারিত। নচেৎ এদেশের বুদ্ধিজীবীদের কপালে দাসত্ব ছাড়া আর কিছু লেখা নেই এবং তা-ই তাঁদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা।

[১৯৫৩]

---

* বিগত দশকে আমেরিকায় কমিউনিস্ট ভীতি এত প্রবল হয় যে সে দেশের কোন কোন রাজনৈতিক নেতা যাঁরই উপর কমিউনিস্টপন্থী বলে সন্দেহ হত তাঁকেই বিভিন্ন সাক্ষ্য কমিটীর সামনে হাজির করে নানাবিধ জেরা করতেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কমিউনিস্ট নন এ কথা প্রমাণ করার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করা হত। পরলোকগত সিনেটর ম্যাক্কার্থী এই সব "আমেরিকানবিরোধী" ক্রিয়াকলাপ তদন্ত কমিটীর একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।—অনুবাদক

ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র

আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ

(আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়ের মধ্যে ১৯৩০ সনের ১৪ই জুলাই একটি সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনা হয়। 'The Religion of Man' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট রূপে তার একটি অনুলেখন সংকলিত আছে। উক্ত অনুলেখন—সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লিখিত মন্তব্য সহ বাংলা অনুবাদে নিম্নে মুদ্রিত হল।)

"প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তখন আমি বলেছিলাম, আর আজও আমি বিশ্বাস করি, যন্ত্রবিদ্যার এই উন্নতি আসলে আমাদের শারীরিক কল্যাণ-বিধানের অনুকূল—বিশেষতঃ, এই উন্নতির প্রতিরোধ যখন অসম্ভব, তখন প্রয়োজনের তাগাদায় মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি জীবনে যে সুবিধার সৃষ্টি করেছে, তার সুচিন্তিত সদ্ব্যবহার করাই তো আমাদের কর্তব্য। সভ্যতার যে স্তরে মানুষ আজ উন্নীত, তাতে যেমন আঙুলে জমি আঁচড়ে চাষ করার কথা ভাবা যায় না, তেমনি হস্তপদ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় যেখানে পরাজিত, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যন্ত্র সৃজন করে সেখানে আমাদের অক্ষমতা ঘুচিয়ে চলেছে। আইনস্টাইন আর আমার মধ্যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের মিল হল যে, নূতন নূতন যন্ত্রাবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ্ আহরণ করতে হবে।

"গত বৎসরের গ্রীষ্মে আবার যখন জার্মানীতে যাই, বার্লিনের অদূরে Kaputh-এ আইনস্টাইনের নিজের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম। দু দিন আগে অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতামালায় যা বলেছিলাম, তা The Religion of Man নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে গ্রথিত করতে তখন ব্যস্ত ছিলাম, সেই ভাবনায় আমার মন তখন ভরপুর। আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাতেই বুঝলাম যে তিনি ধরে নিয়েছেন, 'আমার বিশ্ব' মানবিক ধ্যানধারণা দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব। এ দিকে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি এই যে, মানুষের মন বুদ্ধির নাগালের বাইরেও আছে এক সত্য। আমার বিশ্বাস, ব্যষ্টি-মানব ঐক্যসূত্রে বাঁধা সেই দিব্য মানবের সঙ্গে, যিনি আমাদের অন্তরে, আবার বাইরেও। অনন্তের ভূমিকায় বিরাজিত মানুষ, সেই অনন্ত মূলতঃই মানবিক। আমাদের ধর্মসাধনা নয় বিশ্বভৌমিক, আমাদের যে সজীব ব্যষ্টিসত্তা নিয়ে তার করণ-কারণ, তার আছে শুভাশুভের আদর্শভাবনা। স্বভাবের মধ্যে ওই প্রকার শুভাশুভের নীতি বা নন্দনীয়তা বিজ্ঞানের স্বীকার্য নয়; নিরাবরণ নিরাভরণ 'অস্তি' নিয়েই তার কারবার। বিজ্ঞানে ব্যক্তিসত্তার কোন উপযোগিতা নেই।

অথচ, অধ্যাত্ম পথে বা ধর্মসাধনায় নিছক বাস্তব তথ্য বা তৎসম্পর্কিত তত্ত্ব কোন কাজে লাগে না।

"একক নিঃসঙ্গ মানুষ বলে আইনস্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বইকি। তাঁর জড়বাদকে তুরীয়ই বলা চলে, দার্শনিক ধ্যানধারণার সীমান্ত-চুম্বী সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে—জগৎ থেকে—নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে, বিজ্ঞান এবং আর্ট দুটিই মানুষের স্বরূপপ্রকৃতির প্রকাশ, জৈবিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তার অপরিসীম এক সার্থকতা আছে।"—রবীন্দ্রনাথ।

আইনস্টাইন॥ সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ভগবৎ-সত্তায় আপনার বিশ্বাস আছে কি?

রবীন্দ্রনাথ॥ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের **অপ্রমেয় সত্তায়** নিখিল বিশ্বের ধ্যান ও ধারণা। মানুষী সত্তায় গৃহীত হতে পারে না এমন কিছুই তো দেখা যায় না; কাজেই বিশ্বের যা সত্য তা মানবসত্য। একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা যাক।—জড় পদার্থ যে-সব প্রোটন ও ইলেকট্রনে গঠিত তার মাঝে মাঝে আছে অবকাশ, কিন্তু জড় বস্তু তবু ফাঁপা দেখায় না, কঠিন ও সংহত বলেই মনে হয়। তেমনি অগণ্য ব্যষ্টির সমাবেশে সমষ্টিমানব, মানবিক সম্পর্কের প্রসাদে পরস্পর তারা যুক্ত, আর সেই কারণেই মানুষের সংসার একটি জীবন্ত সংহতি। মনুষ্যেতর বিশ্বভুবনও একই প্রকারে মানুষের সঙ্গে যুক্ত। এ হল মানবিক ভুবন। আমার এই ভাবনা-সূত্রের সত্যতা ও সার্থকতা আমি দেখেছি সাহিত্যে, শিল্পে আর মানবজাতির অধ্যাত্মচেতনায়।

আইনস্টাইন॥ বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে পৃথক্ দুটি ধারণা রয়েছে—১. সৃষ্টি হল মানব-নির্ভর একটি সংহতি আর ২. সৃষ্টির আছে একটি স্বতন্ত্র সত্তা, মানব-অতিরিক্ত।।

রবীন্দ্রনাথ॥ আমাদের এই সৃষ্টি যখন মানুষের নিত্যসত্তারই সুরে বাঁধা থাকে তখনই তাকে আমরা সত্য বলে জানি, সুন্দর বলে বোধ করি।

আইনস্টাইন॥ সৃষ্টি সম্পর্কে এটি 'নির্ভেজাল' মানুষী ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ॥ অন্যরূপ ধারণার সম্ভাবনা কোথায়? এই বিশ্বভুবন যে মানবিক বিশ্বভুবন; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি পর্যন্ত বিজ্ঞানী মানুষেরই দৃষ্টি। বিচার এবং বোধের একটি কোন নীতি অনুযায়ী তার সত্যতা, নিত্যমানবেরই সেই নীতি; নিত্যমানবের জীবন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে।

আইনস্টাইন॥ এ হল মানবিক সত্তার আত্ম-আবিষ্কার।

রবীন্দ্রনাথ॥ হাঁ, নিত্যমানব-সত্তার। আমাদের আবেগ-অনুভূতিতে তার

অনুভব, কর্মের ভিতরে ভিতরে তার ক্রিয়া। আমরা জানি সেই পরাৎপর মানব ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রকাশিত, অথচ সকল প্রকার ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত। বিজ্ঞানের বিষয় হল তা-ই, যা ব্যক্তিগত নয়; নৈর্ব্যক্তিক মানবভুবনের সত্যই তার সত্য। ধর্মসাধনার পথে এই সত্যই আমাদের সত্তার গূঢ় গভীর প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে থাকে, সত্য সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা ও উপলব্ধি একটি সার্বভৌমিকতায়, সার্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সত্যের বিশেষিত মূল্য বা তাৎপর্য আছে, সত্যের সঙ্গে আপনাকে স্বরে বেঁধে সত্যকেই কল্যাণ বলে জানা যায়।

আইনস্টাইন॥ সত্য বা সুন্দর তবে তো মানব-অতিরিক্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথ॥ না।

আইনস্টাইন॥ সৃষ্টি থেকে মানুষ যদি লোপ পেয়ে যায়, অপরূপ অ্যাপোলো মূর্তির সৌন্দর্য বা অপরূপতা সেই সঙ্গেই লোপ পাবে?

রবীন্দ্রনাথ॥ হাঁ।

আইনস্টাইন॥ সুন্দর সম্পর্কে এ উক্তি আমি মেনে নিই, কিন্তু সত্য সম্পর্কে না।

রবীন্দ্রনাথ॥ নয় কেন? মানুষের মধ্য দিয়েই তো সত্যের ধ্যান-ধারণা।

আইনস্টাইন॥ আমার বিশ্বাসের অনুকূলে কোন প্রমাণ আমি দিতে পারিনে, তবু এই বিশ্বাসই আমার ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ॥ এক দিকে পরিপূর্ণ সমন্বয়ের বা সংগীতির যে কল্পরূপ বিশ্বসত্তায় উদ্ভাসিত, নিখিল সৌন্দর্যের সেই হেতু, অন্য দিকে বিশ্বমনের নিখুঁত ও সম্পূর্ণ যে ধারণা, তারই নাম সত্য। মনে মনে আমরা ব্যক্তিগত ভুল-ভ্রান্তির ভিতর দিয়ে, সঞ্চীয়মান অভিজ্ঞার সাহায্যে, ব্যক্তিচৈতন্যের আলো জেলে, ওই সত্যের দিকে অগ্রসর হই—সত্যকে জানবার অন্য উপায় কি আছে?

আইনস্টাইন॥ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রমাণ করতে পারিনে যে, মানুষকে বাদ দিয়েও সত্য থাকে, এমন ভাবেই সত্যকে ধারণা করা চাই—তবু এরই অনুকূলে আমার সুদৃঢ় প্রতীতি। দৃষ্টান্তচ্ছলে বলা যায়, জ্যামিতিতে পীথাগোরাসের উপপত্তিটি (The Pythagorean Theorem) এমন একটি তত্ত্বকে উপস্থিত করছে, যা বিশ্ব-সংসারে মানুষ থাক্ বা না-থাক্ সত্য হবার বাধা নেই। মোট কথা, মানুষ থেকে স্বতন্ত্র কোন 'সৎ' যদি থাকে, তৎসম্পর্কিত সত্যও নিশ্চয়ই আছে; আর অমানব 'সৎ' যদি না থাকে, তেমন সত্যও কিছু নেই।

রবীন্দ্রনাথ॥ সত্য আর বিশ্বসত্তা একই—সেটি হল মানবিক। না হলে ব্যক্তিগত হিসাবে সত্য বলে যা কিছু জানছি তার সত্যতা কোথায়—অন্ততঃ, বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হতে গেলে তো যুক্তিবিচার অপরিহার্য, অর্থাৎ মানবিক

মনের মধ্যস্থতা অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বলেন, ব্রহ্মই নির্বিশেষ সত্য, ব্যক্তিমন তাকে আলাদা করে ধারণা করতে অক্ষম। বাক্যে তার বর্ণনা হয় না, কেবল তার আনন্দে আপনাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে ব্যক্তি তাই হতে পারে। কিন্তু এই সত্য তো বিজ্ঞানের এলাকায় নেই। আমরা আলোচনা করছি প্রতীয়মান সত্য নিয়ে—মানুষের মনের কাছেই যার সত্যতা, অতএব যা মানবিক, যাকে আমরা মায়াও বলি।

আইনস্টাইন॥ তা হলে আপনার মতে, অথবা ভারতীয় মতে, এ মায়া বা 'স্বপ্ন' ব্যষ্টিমনের নয়, সমগ্র মানবজাতির ?

রবীন্দ্রনাথ॥ বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল এই যে, ব্যক্তিগত সীমা ও সংকীর্ণতা, ত্রুটী ও ভ্রান্তি, বাদ দিতে দিতে, বিশ্বমানবের মনে সত্যের যে ধারণা সম্ভব সেই দিকেই আমরা যেতে চাই

আইনস্টাইন॥ সমস্যা তো এইখানে, সত্য আমাদের জ্ঞান বা চেতনা-নিরপেক্ষ কি না।

রবীন্দ্রনাথ॥ আমরা যাকে সত্য বলি, সে হল সৎ-বস্তুর ব্যক্তিগত আর বিষয়গত দুটি দিকের যুক্তিযুক্ত একটি সমন্বয়ে বা সংগতিতে, তার যথার্থ স্থান ব্যক্তি-অতীত মানবে।

আইনস্টাইন॥ আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও, আমাদের ব্যবহারের জিনিস-গুলিতেও, মানুষ-নিরপেক্ষ একটি বাস্তবতা আমরা স্বীকার না করে পারিনে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যুক্তিসিদ্ধ একটি সম্পর্কে ও শৃঙ্খলায় বাঁধতে হলে এ দরকার। ধরুন-না কেন, বাড়িতে কেউ রইল না, ঘরের টেবিল তবু তো ঘরেই থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ॥ হাঁ, ব্যক্তিমনের বাইরে পড়ে রইল টেবিলটা, বিশ্বমনের বাইরে নয়। আমার জ্ঞানগোচর টেবিলটা আমার জ্ঞানের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

আইনস্টাইন॥ মানুষ-নিরপেক্ষ সত্য সম্পর্কে মানুষের সহজ স্বাভাবিক ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায় না, প্রমাণ করা যায় না মানি, তবু এটি সব মানুষেরই ধারণা—আদিবাসীরাও বাদ যায় না। সত্যে মানব-অতিরিক্ত বাস্তবতা আমরা অবশ্যই কল্পনা করি ; আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের মন, এ-সবের অতীত একটি সত্যবস্তু না হলে আমাদের চলেই না—কেন, কী অর্থে, তা অবশ্য বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ॥ বিজ্ঞান প্রমাণ করছে, টেবিল যে একটা কঠিন পদার্থ এটা ইন্দ্রিয়ের অনুমান মাত্র। মানুষের মন যদি না থাকে, মানুষের মনের ধারণায় ধরা সাধারণ টেবিলটাও থাকে না। কী থাকে ? এটাও তো বলতে হবে, ও যে কেবল

অচিন্ত্যবেগবান্ ইলেক্‌ট্রন-প্রোটন-পুঞ্জেরই ঘূর্ণাবর্ত, টেবিল সম্পর্কে, তার 'শেষ সত্য' সম্পর্কে, এই অ-সাধারণ ধারণাটিও মানবমনেরই সৃষ্টি।

সত্যের অবধারণ ব্যাপারে বিশ্বমানবমন আর ব্যক্তিত্বে-বদ্ধ মন দুয়ের একটি চিরদ্বন্দ্ব আছে। তারই চিরসমাধান হয়ে চলেছে মানুষের বিজ্ঞানে, দর্শনে, ধর্ম-নীতিতে। সে যাই হোক, একেবারেই মানুষের কোন অপেক্ষা নেই এমন কোন সত্যবস্তু যদি বা থাকে, আমাদের কাছে তা একেবারেই না-থাকা।

এমন মনের কল্পনা করা কঠিন নয়, যার সামনে বস্তুপারম্পর্য নেই দেশ জুড়ে, আছে কেবল ঘটনার পরম্পরা কালের ভিতরে। স্বরের বিন্যাস যেমন সংগীতে। এরূপ মনে সত্যের সত্যতা-বোধ সুরের বোধের সঙ্গেই তুলনীয়; সেখানে পীথাগোরীয় জ্যামিতির কোন অর্থ আর থাকে না। কাগজের বাস্তবতা আর কাগজে-ছাপা সাহিত্য-বস্তু উভয়ের মধ্যে অপরিসীম ব্যবধান। গ্রন্থকীট কাগজ বা বই পুরোপুরি চিবিয়ে খেলেও, সাহিত্যের অস্তিত্ব তার কীট-মনের কাছে কোনখানে নেই; অথচ মানুষের মনের কাছে তো কাগজের তুলনায় (হরফেরও তুলনায়) সাহিত্য শতগুণ বেশী করেই আছে। তেমনি, মানুষের মনের কাছে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হিসাবে হোক আর যুক্তিপ্রমাণসিদ্ধ ধারণা রূপে হোক, গোচর নয় এমন কোন সত্য থাকলেও সে নেই যতক্ষণ আমরা মানুষ আছি।

আইনস্টাইন ॥ তা হলে দেখছি আস্তিক্যবুদ্ধি তো আপনার থেকে আমারই বেশী।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমার ব্যক্তিসত্তাটি ব্যক্তি-অতীত মানবে, শাশ্বত মানবে মেলানো—এই নিয়েই আমার আস্তিক্যবুদ্ধি বা অধ্যাত্মবিশ্বাস। এইটেই আমি 'মানুষের ধর্ম' বলে ব্যাখ্যা করেছি।

[১৯৩০]

ধর্ম ও বিজ্ঞান

মানবজাতি এ যাবৎ যা কিছু করেছে বা ভেবেছে, তার লক্ষ্য ছিল অনুভূত প্রয়োজনের তৃপ্তি সাধন ও বেদনাবোধের নিবৃত্তি। আধ্যাত্মিক আন্দোলন ও তার বিকাশ সম্বন্ধে বুঝতে হলে এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যে রকম মহান্ বেশেই আমাদের কাছে উপস্থাপিত করা হোক না কেন, মানুষের যাবতীয় কর্ম-প্রচেষ্টা ও সৃষ্টির পিছনে প্রেরণাশক্তি রূপে কাজ করছে এই অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা। তা হলে দেখা যাক ব্যাপক অর্থে ধর্মীয় ভাব ও বিশ্বাস বলতে যা বোঝায় তার পিছনে মানুষের কোন্ অনুভূতি ও প্রয়োজনের তাগিদ সক্রিয় ছিল। যৎকিঞ্চিৎ চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, ধর্মীয় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার মূলে বহু বিচিত্র আবেগের

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। আদিম মানবের কাছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ সৃষ্টির পিছনে মূল তাগিদ ছিল ভয়। ক্ষুধা, বন্য জন্তু, মারী, মৃত্যু ইত্যাদির ভীতি তার ভিতর ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করত। এই অবস্থায় বিভিন্ন ঘটনার কারণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান স্বভাবতঃই স্বল্প মাত্রায় বিকশিত থাকে বলে মানুষের মন নিজের জন্য মোটামুটি নিজেরই মত এমন এক পুরুষের কল্পনা করে নেয়, যার ইচ্ছা ও কর্মের উপর প্রাগুক্ত ভীতিজনক ঘটনাবলী নির্ভরশীল। এবার মানুষের লক্ষ্য হয় পূজা করে বা বলি ইত্যাদি দিয়ে ওই সব পুরুষের অনুগ্রহ লাভ করা। এই ভাবে পুরুষানুক্রমে এই বিশ্বাস সঞ্চারিত হয় যে, এঁদের মানুষের প্রতি অনুকূল বা প্রেমময় করা যায়। আমি একে ভীতিমূলক ধর্ম বলছি। এক বিশেষ পুরোহিত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব এই ধারণার সৃষ্টি না করলেও এর স্থিতি বিধানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক প্রমাণিত হয়। এঁরা জনসাধারণ এবং তাদের ভীতিস্থল—কল্পিত পুরুষের মাঝখানে মধ্যস্থের কাজ করেন এবং এর ভিত্তিতে নিজেদের এক নেতৃত্ব সৃষ্টি করেন। বহুক্ষেত্রে যেসব শাসক বা নেতা বা কোন একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষের পদমর্যাদা অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তাঁরা নিজ পদকে অধিকতর সুরক্ষিত করার জন্য নিজেদের ধর্ম-নিরপেক্ষ পদের সঙ্গে পুরোহিতের এই কার্যভারও গ্রহণ করেন। অনেক সময় রাজনৈতিক শাসক এবং পুরোহিত সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জোট বাঁধে।

ধর্মের দানা বেঁধে ওঠার আর একটি কারণ হচ্ছে সামাজিক বোধ। পিতা, মাতা এবং বৃহদায়তন মানবগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই মরণশীল এবং ভ্রান্তিশীল। নির্দেশ লাভের বাসনা এবং প্রেম ও সহযোগিতা প্রাপ্তির ইচ্ছা সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে ঈশ্বর-ধারণার কারণ হয়। ইনিই হচ্ছেন প্রজাপালক ঈশ্বর, যিনি সকলকে রক্ষা করেন, সকলের মঙ্গল বিধান করেন এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে থাকেন। ভক্তের বিশ্বাসের তারতম্য অনুযায়ী ইনি ভক্ত বা তার গোষ্ঠী অথবা সমগ্র মানবসমাজের জীবনকে ভালবাসেন বা তার শুভাশুভ দেখে থাকেন। ইনি অতৃপ্ত বাসনা ও দুঃখের সান্ত্বনা এবং মৃতের আত্মা সংরক্ষণকারী। এই হচ্ছে ভগবানের সামাজিক বা নৈতিক কল্পনা।

ভয়ের ধর্ম থেকে নৈতিক ধর্মে উন্নতির কাহিনী ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। নিউ টেস্টামেণ্টে এরই জের চলেছে। প্রত্যেক সভ্য জাতি, বিশেষতঃ প্রাচ্য দেশবাসীর ধর্ম মূলতঃ নৈতিক পর্যায়ের। ভয়ের ধর্ম থেকে নৈতিক ধর্মের স্তরে উন্নীত হওয়া কোন জাতির জীবনে মহত্ত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে আদিম মানবের ধর্ম একান্তভাবে ভীতিভিত্তিক আর সভ্য মানুষের ধর্ম কেবল নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—এই মনোভাব এমন একটি অন্ধ সংস্কার, যার বিরুদ্ধে আমাদের

সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, সব ধর্মেই ভীতি এবং নৈতিকতার মিশ্রণ বিদ্যমান। বিশেষত্ব এইটুকু যে, সমাজজীবনের উচ্চ স্তরে নৈতিকতার ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে।

তবে পূর্বোক্ত সকল ধারারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈশ্বরের মানবীয় ধারণা। একমাত্র অলোকসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বা সুউচ্চ মানসলোকচারী মানবগোষ্ঠীই সাধারণতঃ এই পর্যায়ের উর্ধ্ব স্তরে উঠতে সক্ষম হয়। কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতির তৃতীয় একটি স্তর বিদ্যমান এবং ক্বচিৎ-কখনও তা শুদ্ধতম রূপে পরিদৃষ্ট হলেও সকল শ্রেণীর ভিতরই এর দর্শন হতে পারে। একে আমি মহাজাগতিক ধর্মীয় ভাবনা আখ্যা দেব। এর উপলব্ধি যাঁর ভিতর আসেনি, তাঁকে এ বোঝানো খুব কঠিন। কারণ এর সঙ্গে ঈশ্বরের মানবীয় কল্পনার কোন সংস্রব নেই।

মানুষ তার কামনা-বাসনা ও লক্ষ্যের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করে। বিশ্ব-প্রকৃতি ও ভাবরাজ্যের মহিমান্বিত মনোহর রূপ তার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। নিজের অস্তিত্ব তার কাছে কতকটা বন্দিদশার মত প্রতীয়মান হয় এবং বিশ্ব-চরাচরকে সে এক তাৎপর্যপূর্ণ অখণ্ড সত্তা রূপে সমগ্র ভাবে বুঝতে চায়। বিকাশক্রমের প্রথম যুগেই, যেমন ডেভিড ও অন্যান্য মহাপুরুষদের পবিত্র গাথায়, এই মহাজাগতিক ধর্মীয় ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। শোপেনহাওয়ারের অপূর্ব রচনার মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যে ধারণা পাওয়া যায় তাতেও দেখা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্মের ভিতর এর প্রবল প্রভাব ছিল।

সর্বকালের ধর্মীয় মহাপুরুষদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই-জাতীয় ধর্মীয় ভাবনা। এই ভাবনার মধ্যে কোন রকম সংকীর্ণ গোঁড়ামি নেই এবং ভগবানকে মানুষের প্রতিরূপ রূপে কল্পনারও স্থান নেই। সুতরাং এই আদর্শের আধারে কোন রকম ধর্মীয় সম্প্রদায় বা পন্থ গড়ে ওঠে নি। তাই মুখ্যতঃ প্রত্যেক যুগের অবিশ্বাসীদের ভিতরই আমরা এমন সব লোক পেয়েছি, যাঁদের ভিতর উচ্চতম ধর্মীয় ভাবনার সমাবেশ দেখা গিয়েছে। সমসাময়িক যুগ এঁদের কখনও কখনও সাধুসন্তের মর্যাদা দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁদের নাস্তিক বলেই বিবেচনা করা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ডেমোক্রেটাস, ফ্রান্সিস অফ অ্যাসিসি এবং স্পিনোজা ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সদৃশ।

মহাজাগতিক ধর্মীয় ভাবনায় ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই বা এর কোন তত্ত্বদর্শন নেই। এমতাবস্থায় এই ভাবনাকে কি ভাবে এক জনের মন থেকে অপর এক জনের মনে সঞ্চারিত করা যায়? আমার মতে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এই ভাবকে জাগিয়ে তোলা ও যাঁরা এর যোগ্য, তাঁদের অন্তরে এর বর্তিকাকে সদা দেদীপ্যমান রাখা।

সুতরাং বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বিপরীত এক সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির বিচার করতে গেলে অতীব সুসঙ্গত কারণেই বিজ্ঞান ও ধর্মকে পরস্পরবিরোধী বিষয় বলে মনে হয়। কারণতা প্রকল্প (causality hypothesis) যার নিকট সত্য সত্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং যে ব্যক্তি কারণত্বের (causation) ক্রিয়ার বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী, সে কিছুতেই এক মুহূর্তের জন্যও এ ধারণার প্রশ্রয় দিতে পারে না যে, ঘটনাপ্রবাহে হস্তক্ষেপকারী কোন বাহ্য সত্তার অস্তিত্ব আছে। ভীতিমূলক ধর্মের কোন সার্থকতা তার কাছে নেই এবং সামাজিক ও নৈতিক ধর্মের প্রয়োজনীয়তাও তার কাছে সামান্য। শাস্তি ও পুরস্কারদাতা ঈশ্বরের কল্পনা তার কাছে ধারণাতীত ব্যাপার। এর সহজ কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের কার্যকলাপের নিয়ামক হচ্ছে তার বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তার তাগিদ। সুতরাং কোন প্রাণহীন পদার্থকে যেমন তার গতির জন্য দায়ী করা অন্যায়, তেমনি ভগবানের চোখে তার কার্যকলাপের জন্য তাকে দায়ী করাও অযৌক্তিক। অতএব বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, বিজ্ঞান নৈতিকতা বোধ ধ্বংস করছে। কিন্তু এ অভিযোগ অন্যায়। মানুষের নৈতিক আচরণের সফল ভিত্তি হবে সংবেদনশীলতা, শিক্ষা ও সামাজিক বন্ধন। এর জন্য কোন ধর্মীয় ভিত্তির প্রয়োজন নেই। মানুষকে যদি পারলৌকিক পুরস্কারের আশা ও শাস্তির ভয় দ্বারা সংযত রাখতে হয় তা হলে তার নিতান্ত দৈন্য-দশা উপস্থিত হয়েছে বুঝতে হবে।

এর থেকেই বোঝা সহজ হবে ধর্ম-জগতের পাণ্ডারা কেন চিরকাল বিজ্ঞানের সঙ্গে লড়াই করেছেন ও বিজ্ঞানানুরাগীদের পীড়ন করেছেন। পক্ষান্তরে আমি বিশ্বাস করি যে, মহাজাগতিক ধর্মীয় ভাবনা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও মহত্তম প্রেরণা। বিশুদ্ধ তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রদূত হবার জন্য কী অপরিসীম কর্মসাধনা ও সর্বোপরি আত্মভোলা নিষ্ঠা প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে তাঁরাই শুধু বুঝতে পারবেন যে মনে কত প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হলে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বাস্তবতার সম্পর্ক রহিত এই-জাতীয় অবদানের জন্ম হতে পারে। বিশ্বচরাচরের ভিতর একটা সুসংবদ্ধ নিয়ম ক্রিয়াশীল, সে সম্বন্ধে কী দৃঢ় প্রত্যয় ও তাকে উপলব্ধি করার জন্য কী গভীর আকূতি! কেপলার ও নিউটনকে মহাকাশচারী গ্রহনক্ষত্রমালার বলবিদ্যা সংক্রান্ত নিয়মাবলীকে সকল প্রকার অবোধ্যতার প্রভাবমুক্ত করার জন্য যে বহু বর্ষব্যাপী নিঃসঙ্গ সাধনা করতে হয়েছিল, তাতে তাঁদের মনের বিশালতার কতটুকুই বা জনসমক্ষে প্রকটিত হয়েছে? সন্দেহ-বাদীদের দ্বারা পরিপূর্ণ পরিবেশের ভিতর যাঁরা সমগ্র পৃথিবী ও সর্বকালের সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পথের নিশানা দেন, তাঁদের মনোভাব সম্বন্ধে সহজেই সেই

সকল ব্যক্তির মনে একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে, যাঁরা মূলতঃ প্রত্যক্ষ ফলের দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুণাগুণ বিচার করেন। এই সব লোকেদের কোন্ মন্ত্র প্রেরণা দিয়েছে ও অগণিত ব্যর্থতা সত্ত্বেও কোন্ শক্তি এঁদের আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার ক্ষমতা জুগিয়েছে তা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন শুধু সেই ব্যক্তি, যিনি একই জাতীয় কার্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। মহাজাগতিক ধর্মীয় ভাবনাই মানুষকে এ শক্তি দেয়। জনৈক সহযোগী অত্যন্ত সঙ্গত উক্তিই করেছেন যে, আমাদের এই জড়বাদী যুগে তন্ময় চিত্তে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিরত ব্যক্তিরাই একমাত্র নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।

[১৯৩০]

বিজ্ঞানের ধর্মীয় ভাব

বিজ্ঞান-জগতের দিক্‌পালদের ভিতর কদাচিৎ এমন কাউকে পাওয়া যাবে, যাঁর ভিতর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত একটা ধর্মীয় ভাব নেই। তবে এটা প্রাকৃতজনের ধর্ম থেকে পৃথক্। সাধারণ লোকের কাছে ঈশ্বর এমন এক সত্তা, যাঁর কৃপাদৃষ্টিতে উপকার হয়ে থাকে এবং যাঁর রোষ আতঙ্কের ব্যাপার। এ জিনিস কতকটা পিতার কাছে সন্তানের আনুগত্যের মত। মনে যথেষ্ট সমীহা থাকলেও এ ব্যাপার হচ্ছে সেই সত্তার সঙ্গে কতকটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মত।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মনে কাজ করে বিশ্বজনীন কারণত্ব। ভবিষ্যতের সবটাই তাঁর কাছে অতীতের মতই প্রয়োজনীয় ও পূর্ব-নির্ধারিত (determined)। নীতিশাস্ত্র মোটেই স্বর্গীয় কিছু নয় ; এ হচ্ছে নিছক মানবীয় ব্যাপার। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সুসংবদ্ধতা দৃষ্টে উদ্ভূত এক বোধাতীত বিপুল বিস্ময়ভাবই হচ্ছে তাঁর ধর্মীয় অনুভূতি। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর ভিতর তিনি এমন এক উচ্চগ্রামের সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় পান, যার তুলনায় মানবের যাবতীয় বিধিবদ্ধ চিন্তা ও কর্ম একান্ত তুচ্ছ প্রতিফলন বলে বোধ হয়। নিজেকে স্বার্থপর বাসনার কবলমুক্ত রাখার কাজে এই বোধই তাঁর জীবন ও কর্মের মুখ্য নিয়ামক হয়। সর্বযুগের ধর্মীয় মহাপুরুষদের যে ভাবনা প্রেরণা দিয়েছে, এ যে তারই একান্ত অনুরূপ, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

[১৯৩৪]

নৈতিকতা ও আবেগ

আমাদের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার দৌলতে আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের কামনা সমূহ এবং ভয় ভীতি থেকেই আমাদের সমুদয় সচেতন কার্য-কলাপের উদ্ভব হয়। অন্তর্জ্ঞান আমাদের এই কথা বলে যে, উপরিউক্ত তথ্য

আমাদের মানবগোষ্ঠী এবং উচ্চস্তরের অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্য। আমরা সকলেই ব্যথা বেদনা ও মৃত্যুর হাত এড়াতে চাই এবং সুখদায়ক অনুভূতি কামনা করি। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা (impulse) সঞ্জাত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা আমরা চালিত হই। এই সব স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা আবার এমন সুসংগঠিত যে, সাধারণতঃ আমাদের কার্যকলাপ আত্মরক্ষা ও সমগ্র প্রজাতির সংরক্ষণের কারণ হয়। আত্ম-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মানবের ব্যক্তিগত সহজ প্রবৃত্তিকে (instinct) চালনাকারী আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের কয়েকটির নাম হচ্ছে ক্ষুধা, প্রেম, বেদনা এবং ভীতি। এর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীব হিসাবে আমরা আমাদের সমধর্মী মানবের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহানুভূতি, গর্ব, ঘৃণা, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, দয়া ইত্যাদি অনুভূতির দ্বারা চালিত হই। এই সব প্রাথমিক আবেগ ভাষায় বর্ণনা করা সহজ না হলেও এরাই হচ্ছে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার উৎস। এই সব বলশালী প্রাথমিক আবেগ আমাদের ভিতর সক্রিয় না থাকলে পূর্বোক্ত সকল প্রকারের কর্যকলাপ বন্ধ হয়ে যেত।

আমাদের আচরণ উচ্চতর পশুপক্ষীর আচার আচরণ থেকে সবিশেষ পৃথক্ মনে হলেও তাদের ও আমাদের প্রাথমিক সহজ প্রবৃত্তির বহুলপরিমাণ সাদৃশ্য রয়েছে। মানুষের ভিতর ক্রিয়াশীল অপেক্ষাকৃত বলশালী কল্পনাশক্তি, চিন্তনক্ষমতা এবং তৎসহ ভাষা ও অন্যান্য সাংকেতিক পদ্ধতির প্রয়োগকুশলতার কারণে মানুষ ও উচ্চতর অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রকট পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। চিন্তাশক্তিই মানবের অভ্যন্তরস্থ সংগঠনী তত্ত্ব, এবং এর স্থান হচ্ছে কারণিক প্রাথমিক সহজ প্রবৃত্তি ও তৎসঞ্জাত পরিণামের মাঝখানে। প্রাথমিক সহজ প্রবৃত্তির সহায় রূপে কল্পনা এবং বুদ্ধি এইভাবে আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করে। তবে এদের হস্তক্ষেপের ফলে আমাদের আচরণে এক বৈশিষ্ট্য আসে। আমরা ক্রমশঃ নিছক তাৎকালিক প্রবৃত্তির নির্দেশ পালন করা থেকে বিরত হই। কল্পনা ও বুদ্ধির মারফত প্রাথমিক সহজ প্রবৃত্তি একটা লক্ষ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় এবং ক্রমশঃ এই লক্ষ্য দূরতর হতে থাকে। সহজ প্রবৃত্তি চিন্তাকে ক্রিয়াশীল করে এবং চিন্তা হৃদয়াবেগ মণ্ডিত হয়ে মধ্যবর্তী কর্মসমূহের সূচনা করে। এই হৃদয়াবেগ অনুরূপভাবে অন্তিম লক্ষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পুনঃ পুনঃ এই প্রক্রিয়ার পুনরাবর্তন হবার ফলে এই পদ্ধতির নিম্নোক্ত পরিণাম হয়। ভাব (idea) ও বিশ্বাস এক বিশেষ কার্য-কুশল ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং ভাব ও বিশ্বাসের জনক পূর্বোক্ত অন্তিম লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে যাবার বহু দিন পরও এই ক্ষমতা অবিকৃত থাকে। এই-জাতীয় ব্যাপক ধার-করা হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতার নিদর্শনও আছে। তখন পূর্বতন যথার্থ অর্থের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়া সত্ত্বেও প্রাচীন বিষয় আঁকড়ে থাকা হয়। একে তখন আমরা জড়বস্তুর উপাসনা আখ্যা দিয়ে থাকি।

এতদ্‌সত্ত্বেও সংবর্ণিত পদ্ধতি সাধারণ জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বস্তুতঃ এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে, এই পদ্ধতির (একে হৃদয়বৃত্তি এবং চিন্তার অধ্যাত্মকরণ আখ্যাও দেওয়া যেতে পারে) কৃপায় মানুষ অতীব সূক্ষ্ম ও পরিশুদ্ধ আনন্দ লাভে সক্ষম। শিল্পসৃষ্টির সৌন্দর্যের আনন্দ এবং চিন্তাধারার যুক্তিপরম্পরা অনুসরণের আনন্দ—এ সবই এই পদ্ধতির অবদান।

আমার দৃষ্টি যতদূর যায়, তাতে যাবতীয় নৈতিক উপদেশাবলীর সূচনাতে একটি বিষয় চোখে পড়ে। মানুষ যদি ব্যক্তি হিসাবে তার প্রাথমিক সহজ প্রবৃত্তির তাড়নার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং কেবল যদি নিজের দুঃখ-দুর্বিপাক এড়াতে চায় ও ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে বেড়ায়, তা হলে তার মোট ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, মানবজাতিকে নিরাপত্তাবিহীন, ভীতিবিহ্বল ও বহুবিধ দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। এর উপর তারা যদি আবার আত্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ স্বার্থপরতার দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগ করে এবং যদি অন্য সকলের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য অস্তিত্বের আনন্দরূপী ভ্রান্তির আধারে নিজ জীবনের সৌধ গড়ে তোলে, তা হলেও অবস্থার কোন উন্নতি হবে না। অন্যান্য প্রাথমিক সহজ প্রবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের তুলনায় প্রেম, করুণা ও বন্ধুত্বের হৃদয়াবেগ অতীব দুর্বল ও মানবসমাজকে একটা মোটামুটি চলনসই অবস্থায় নিয়ে যাবার পক্ষে অপর্যাপ্ত।

সংস্কারমুক্ত চিত্তে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এ সমস্যার সমাধান অতীব সরল ব্যাপার। অতীত যুগের প্রতিটি মনীষী তাঁদের উপদেশাবলীতে একই সুরের প্রতিধ্বনি তুলে বলেছেন যে, সকল মানবের আচরণ একই প্রকার নীতির অনুশাসনে চালিত হওয়া উচিত। আর এই সব নৈতিক অনুশাসন এমন হওয়া চাই, যা অনুসরণের ফলে সকলেই যেন যথাসম্ভব অধিকমাত্রায় নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টি বোধ করতে পারে ও দুঃখ-কষ্টের পরিমাণ যেন যথাসম্ভব অল্প হয়।

অবশ্য উপরি-উক্ত 'সামান্য' (general) চাহিদা একান্তই অস্পষ্ট ধরনের এবং তাই এর থেকে ব্যক্তি-মানবের আচরণের দিগ্‌দর্শনকারী সুনির্দিষ্ট বিধানে উপনীত হওয়া যায় না। এবং এই সব সুনির্দিষ্ট বিধান পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে স্বয়ং পরিবর্তনশীল। এ-ই যদি আমাদের প্রধান অসুবিধা হত, তা হলে মানুষের বিগত সহস্র বৎসরের বিধিলিপি প্রত্যুত অতীত বা বর্তমানের তুলনায় কতই না ভাল হত। মানুষ তা হলে মানুষকে হত্যা করত না, পরস্পর পরস্পরকে উৎপীড়ন করত না এবং দৈহিক শক্তি এবং ছলনা ইত্যাদির সহায়তায় একে অপরকে শোষণ করত না।

সত্যকার অসুবিধা—যে অসুবিধা যুগে যুগে প্রতিটি সাধুস্বভাব ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে—তাকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়: মানুষের হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে আমাদের উপদেশাবলীকে কি ভাবে এমন শক্তিশালী করা যায় যাতে এর প্রভাব

ব্যক্তি-মানবের মৌলিক মনন-ক্ষমতার চাপের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে? অতীতকালের সাধু-সন্তরা ঠিক এইভাবে সজ্ঞানে নিজেদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিনা তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। তবে তাঁরা যে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে গেছেন সে-সম্বন্ধে আমরা জানি।

মানুষ পূর্বোক্ত ধরনের বিশ্বজনীন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্মুখীন হবার মত প্রবীণতা অর্জন করার বহুপূর্বে জীবনে পদে পদে যে-সব সংকট উপস্থিত হত তার ভয়ে ভীত হয়ে সে সবের কারণস্বরূপ বহুবিধ শরীরী সত্তার কল্পনা করেছিল। এই সব সত্তার কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু মানুষ ভাবত এরাই প্রকৃতিতে নানাবিধ বিপর্যয় ঘটায়। মানুষ নৈসর্গিক শক্তিসমূহের প্রকাশকে ভয় করত, আবার হয়তো তাকে স্বাগতও জানাত। মানুষ বিশ্বাস করত যে, সর্বক্ষেত্রে তাদের চিন্তা ও কল্পনার উপর প্রভুত্ববিস্তারকারী ওই সকল সত্তার বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে। তাদের আকৃতি মানুষী প্রতিমূর্তির অনুরূপ, তবে তাদের শক্তি অতি-মানবীয়। এ-ই হচ্ছে ঈশ্বরের কল্পনার আদিম পর্যায়। এইরূপ কোন সত্তার অস্তিত্ব ও তার অমিত শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস মূলতঃ মানবের দৈনন্দিন জীবনের ভয়-ভীতির উপর আধারিত হওয়ায় মানবজীবন ও তার আচার-আচরণের উপর এর প্রভাব অচিন্তনীয় রকমের গভীর-মূল। অতএব সমগ্র মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত এক নৈতিক ভাবধারা প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তারা যে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে নৈতিক ভাবধারাকে ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেছিলেন, এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই, এবং ওই সব নৈতিক বিধান সকল মানুষের পক্ষে অভিন্ন হওয়ার কারণে হয়তো মানুষের ধর্মীয় সংস্কৃতি বহু-ঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে রূপান্তরিত হবার পথে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে বিশ্বজনীন নৈতিক ভাবধারা তার মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক শক্তি সংগ্রহ করেছে। আবার আর এক দিক থেকে দেখতে গেলে, ধর্মের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই নৈতিক ভাবধারার পক্ষে মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছে। একেশ্বরবাদী ধর্ম বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর ভিতর বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই সব পার্থক্য কোনক্রমেই মৌলিক ধরনের না হওয়া সত্ত্বেও শীঘ্রই পারস্পরিক সাদৃশ্যের চেয়ে এই সব পার্থক্যকেই বড় করে দেখা হতে লাগল, এবং এইভাবে ধর্ম বিশ্বজনীন নৈতিক ভাবধারার ভিত্তিতে সমগ্র মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে সময় সময় পারস্পরিক শত্রুতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

অতঃপর প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক বিকাশের সূত্রপাত হল। মানুষের চিন্তা ও দৈনন্দিন জীবনের উপর এর প্রভাব গভীরভাবে পড়ল এবং এর পরিণামে আধুনিক কালে মানুষের ধর্মীয় আবেগ (religious sentiment) আরও শিথিল হয়ে পড়ল।

কারণিক এবং বিষয়মুখ চিন্তা-পদ্ধতির সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তার কোন আবশ্যিক বিরোধ না থাকলেও অধিকাংশ মানুষের মনে এর ফলে গভীর ধর্মীয় ভাবের প্রণোদনার স্থান সংকুচিত হতে লাগল। আর প্রাচীন কাল থেকে ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যে নিকট-সম্পর্ক থাকার দরুন বিগত একশত বৎসর বা তার কাছাকাছি সময়ের মধ্যে চিন্তাধারা ও বিশ্বাস সাংঘাতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমার মতে আজকের দিনের রাজনৈতিক পদ্ধতিসমূহের উপর বর্বরতার ছোঁয়া লাগার এইটেই একটা প্রধান কারণ। যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে নব নব প্রগতির আতঙ্কজনক ধ্বংসসাধনক্ষমতার কথা বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, এই বর্বরতা এখনই সভ্য সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে।

বলা বাহুল্য, এটা আনন্দের বিষয় যে, ধর্ম নৈতিক আদর্শের সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। অথচ নৈতিক অনুজ্ঞা কেবল যজনালয় বা ধর্মের ব্যাপার নয়, সমগ্র মানবসমাজের অত্যন্ত মহার্ঘ্য সনাতন সম্পদ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক ব্যবস্থার ভিত্তিতে চালিত সংবাদপত্র ও বিদ্যালয়ের কথা বিবেচনা করুন। কর্মকুশলতা ও সাফল্যের মানদণ্ডে সকল কিছুর পরিমাপ করা হয়; মানবসমাজের নৈতিক লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তু বা মানুষের মূল্য বিচার করা হয় না। এর সঙ্গে প্রচণ্ড আর্থিক সংগ্রামজনিত নৈতিক অবনতির ব্যাপারটাও হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে।

মানুষ সামাজিক সমস্যাবলীকে আনন্দমণ্ডিত সেবা ও উন্নততর জীবনে উপনীত হবার সাধন স্বরূপ বিবেচনা করবে। অবশ্য ধর্মের এলাকা বহির্ভূত নীতিবোধকে সুপরিকল্পিত উপায়ে পরিপুষ্ট করার প্রয়াস এ কার্যে সাহায্য করবে। কারণ সহজ মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে গেলে, কেবল জীবনের কতকগুলি কাম্য আনন্দ বর্জন করার কঠোর দাবির নামই নৈতিক আচরণ নয়। পক্ষান্তরে নৈতিক আচরণের অর্থ হচ্ছে সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের অবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটাবার জন্য সমবেত আগ্রহ।

এই ধারণার মধ্যে সব ছাড়িয়ে একটি কথা নিহিত রয়েছে—নিজের ভিতর যে সুপ্ত গুণাবলী বিদ্যমান তার বিকাশের জন্য প্রতিটি ব্যক্তির অবাধ সুযোগ থাকা চাই। একমাত্র এই ভাবেই ব্যক্তি-মানবের যথার্থ পরিতৃপ্তি বিধান সম্ভব। এবং শুধু এই পথেই সমাজ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হতে পারে। কারণ যা কিছু সত্যকার মহান্ ও প্রেরণাদায়ী, তার জনক হচ্ছে স্বাধীন পবিবেশের মধ্যে কর্মরত ব্যক্তি-মানব। একমাত্র জৈব অস্তিত্বের নিরাপত্তার খাতিরেই কিছুটা নিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়া যেতে পারে।

পূর্বোক্ত ধারণা থেকে আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কিংবা বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর যে সকল পার্থক্য রয়েছে তা আমরা কেবল সহ্য করেই ক্ষান্ত

হব না ; এ পার্থক্য আমরা কাম্য বলে মনে করব, কেন না এর ফলে আমাদের অস্তিত্ব সমৃদ্ধ হবে। এই হচ্ছে যথার্থ সহনশীলতার মূল কথা। এই রকম ব্যাপক অর্থে সহনশীলতা ব্যতিরেকে সত্যকার নৈতিকতার কথাই উঠতে পারে না।

এখানে সংক্ষেপে যে নৈতিকতার কথা বলা হল, তা কোন বাঁধাধরা বা অনড় পদ্ধতি নয়। একে বরং এমন একটা দৃষ্টিকোণ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে যেখান থেকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সর্ববিধ প্রশ্নের বিচার করা যেতে পারে এবং করা উচিতও। এ এমন এক কর্তব্য, যার পরিসমাপ্তি নেই। এ আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপের প্রেরণার উৎসস্বরূপ এমন এক শাশ্বত মানদণ্ড, যা দিয়ে আমাদের সর্ববিধ বিচারবুদ্ধির পরিমাপ করতে হবে। এই আদর্শে সত্যসত্যই ওতপ্রোত কোন মানুষ কি নিম্নোক্ত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে ?

সে কি পৃথিবীর অধিকাংশ মানবের পক্ষে বরাবর অলভ্য সুখ-সুবিধা এবং ভোগ্যোপকরণ গ্রহণ করতে পারে ?

তার দেশ যেহেতু সাময়িক ভাবে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করছে সেই হেতু কি সে রাষ্ট্রোত্তর নিরাপত্তা বিধান ও বিচার-ব্যবস্থা সৃষ্টি করার পরিকল্পনা থেকে দূরে সরে থাকতে পারে ?

বিশ্বের অন্যত্র যখন নিরপরাধ মানুষের উপর দিয়ে অত্যাচারের রথচক্র নির্মম ভাবে চলছে, তারা যখন তাদের প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এমনকি তাদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হচ্ছে, তখনও কি সে নিষ্ক্রিয় ভাবে ঔদাসীন্য ভরে তাকিয়ে থাকতে পারে ?

এ প্রশ্নগুলি উত্থাপন করার অর্থই হচ্ছে এর উত্তর দেওয়া।

[১৯৩৮]

নৈতিক অধোগতি

সকল ধর্মমত এবং শিল্পকলা ও বিজ্ঞান একই বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা। এদের প্রত্যেকটিরই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজীবনকে মহত্তর করে তোলা এবং নিছক দৈহিক অস্তিত্বের রাজ্য থেকে ব্যক্তি-মানবকে উদ্ধার করে তাকে মুক্তিপথগামী করা। প্রাচীন যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে দেবস্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, এ ঘটনা কিছু আকস্মিক ব্যাপার নয়। ঈশ্বরোপাসনালয়কে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি যথাযথ ভাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে হয় তা হলে ব্যক্তি-মানবের জীবনকে মহত্তর করার দায়িত্ব তাদের নিতেই হবে। নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা প্রচার করে এবং পাশব শক্তির প্রয়োগ বন্ধ করে এরা এই সুমহান্ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মভিত্তিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পরিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে অর্থহীন বিরোধিতার সূত্রপাত হয়। তবে সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য আকৃতির কোন অপ্রতুলতা ছিল না। লক্ষ্যের মহত্ব সম্বন্ধে কারও মনে সংশয় দেখা দেয়নি। কেবল সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থা নিয়ে মতভেদ উপস্থিত হয়েছিল।

কিন্তু বিগত কয়েক দশকের রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব ও জটিলতার কারণে আমাদের সম্মুখে যে সংকট সমুপস্থিত হয়েছে, তা বিগত শতাব্দীর প্রচণ্ডতম নিরাশাবাদীর পক্ষেও স্বপ্নে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। সে যুগে মানুষের আচার-ব্যবহার সম্পর্কীয় বাইবেলের নির্দেশাবলী, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে অবশ্যপালনীয় স্বতঃসিদ্ধ দাবি বলে মেনে নিতেন। বিষয়মুখ সত্য ও জ্ঞানান্বেষণই মানুষের চূড়ান্ত ও শাশ্বত লক্ষ্য বলে স্বীকার না করলে কাউকে সমাজে স্বীকৃতি দেওয়া হত না।

আজ কিন্তু আমাদের সশঙ্ক চিত্তে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, সভ্য মানবের অস্তিত্বের আধাররূপী স্তম্ভগুলি তাদের প্রাচীন শক্তি হারিয়েছে। একদা যে সকল জাতি উন্নতশির ছিল, আজ তারাই অত্যাচারীর দম্ভোক্তির সম্মুখে মস্তক নত করছে। অত্যাচারীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে যে, যা কিছু আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক, তা-ই যথার্থ! সত্যের জন্যই সত্যান্বেষণ করার আর কোন সার্থকতা নেই এবং এ প্রচেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। সেই সব দেশে আজ অবাধে স্বৈরতন্ত্রী শাসন চলছে এবং ব্যক্তিবিশেষ, মতবাদ বা সম্প্রদায়ের উপর প্রকাশ্যে অত্যাচার ও নিগ্রহ করা হচ্ছে এবং এ সবই ন্যায়সঙ্গত বা অপরিহার্য বলে মেনে নেওয়া হচ্ছে।

পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ ধীরে ধীরে নৈতিক অধোগতির এই সমস্ত বাহ্য লক্ষণ সম্বন্ধে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াও আর মানুষের মনে জাগছে না। এবং ন্যায়বিচারের প্রতি আগ্রহও অদৃশ্য হচ্ছে। অথচ মানব-সভ্যতাকে আদিম বর্বরতায় প্রত্যাবর্তন করা থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে একমাত্র এই প্রতিক্রিয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সত্য ও ন্যায়বিচারের উদগ্র কামনা হিসাবী রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির চেয়ে মানুষের অবস্থার উন্নতিকল্পে ঢের বেশী কাজ করেছে। রাজনৈতিক ছলচাতুরী শেষ পর্যন্ত কেবল অবিশ্বাসেরই জন্ম দেয়। এ কথায় কি কেউ সন্দেহ করতে পারেন যে, মানবতার সেবক হিসাবে ম্যাকিয়াভেলীর (Machiavelli) তুলনায় মোজেস অনেক উচ্চস্তরের ছিলেন?

যুদ্ধের সময় জনৈক ব্যক্তি একজন বিখ্যাত ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিককে এই কথা বোঝাবার প্রয়াস করছিলেন যে, মানবজাতির ইতিহাসে "জোর যার মুলুক তার" নীতিরই জয়জয়কার ঘোষিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকপ্রবর উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনার

অভিমতের অভ্রান্ততা খণ্ডন করার সাধ্য আমার নেই। তবে আমি এইটুকু জানি যে, ওই রকম বিশ্বে বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই।”

আমরা যেন আপোষ-নীতি প্রত্যাখ্যান করে চিন্তা ও কর্মে পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের অনুগামী হই। মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করা অপরিহার্য বোধ হলে আমরা যেন লড়াই এড়িয়ে যাবার প্রয়াস না করি। এই পন্থানুসরণ করলে শীঘ্রই এমন অবস্থা আসবে, যখন আমরা মানবসমাজের পরিস্থিতির জন্য গর্ব বোধ করব।

[১৯৩৯]

বিজ্ঞান ও ধর্ম

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক ভাবে এই অভিমত প্রচলিত ছিল যে, জ্ঞান ও বিশ্বাসের ভিতর এমন এক বিরোধ বিদ্যমান, যার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। প্রগতিশীল মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা মনে করতেন যে, এবার ক্রমবর্ধিত হারে জ্ঞানকে বিশ্বাসের স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। তাঁদের মতে, জ্ঞানের আধারবিহীন বিশ্বাস কুসংস্কার মাত্র এবং তাই তার বিরোধিতা করা প্রয়োজন। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে চিন্তা ও জ্ঞানের পথ খুলে দেওয়া এবং গণশিক্ষার মুখ্য বাহন হিসাবে বিদ্যালয়ের কর্তব্য হচ্ছে একান্তভাবে এই লক্ষ্য পরিপূর্তির জন্য কাজ করা।

কদাচিৎ যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিকোণ এরূপ স্থূল ভাবে ব্যক্ত হয়েছে, এমনকি আদপে হয়নি বললেই চলে। কারণ যে কোন কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট মানুষ এক লহমাতেই দেখতে পাবেন যে, পূর্বোক্ত উক্তিতে কী এক-তরফা ভাবেই না অবস্থাকে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে কোন বিষয় সম্বন্ধে মনে স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে এই রকম রূঢ় ও নগ্ন ভাবে নিজ বক্তব্য উপস্থাপিত করাই বোধ করি ভাল।

এ কথা সত্য যে, অভিজ্ঞতা এবং স্পষ্ট চিন্তাই বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই ব্যাপারে অন্ততঃ চূড়ান্ত যুক্তিবাদীর সঙ্গে সকলে নির্দ্বিধায় সহমত হবেন। তবে যুক্তিবাদীদের বক্তব্যের দুর্বল অংশ হচ্ছে এইখানে যে, আমাদের আচরণ এবং বিচারবুদ্ধির মুখ্য নিয়ামক বিশ্বাসসমূহকে কেবল নিরেট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ঘটনাসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও তারা একে অপরের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে, এইটুকু ছাড়া আর কিছুই আমাদের শিক্ষা দিতে পারে না। এই-জাতীয় বিষয়মুখ জ্ঞানার্জনের অভিমুখে অভিযান করার আকাঙ্ক্ষা মানবের উচ্চতম সদ্‌গুণাবলীর মধ্যে পড়ে এবং আমি আশা করি আমার বিরুদ্ধে

এই অভিযোগ আনীত হবে না যে, এই ক্ষেত্রে মানবের অসমসাহসিক প্রচেষ্টাবলী ও মহান্ সাফল্যকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করছি। তবে এ কথা সমভাবেই স্পষ্ট যে, কোন্ বিষয় কি তাই জানলেই কি হওয়া উচিত বোঝার সদর দরজা খুলে যায় না। কোন জিনিসের স্বরূপ সম্বন্ধে কারও মনে অতীব স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র থাকতে পারে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে মানবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বিষয়মুখ জ্ঞান আমাদের হাতে কতকগুলি লক্ষ্যে উপনীত হবার শক্তিশালী সাধন তুলে দেয়; কিন্তু অন্তিম লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার বাসনা অন্য সূত্র থেকে আসে। এবং এ সত্য সম্বন্ধে বোধ হয় তর্ক করাই বাহুল্য যে, এই-জাতীয় কোন লক্ষ্য এবং তদনুরূপ মূল্যবোধ নির্ধারণ ব্যতিরেকে আমাদের অস্তিত্ব এবং যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ অর্থহীন। নিছক বিষয়মুখ সত্যের জ্ঞান চমৎকার কিন্তু জীবনে পথনির্দেশদানের ব্যাপারে তার ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ যে, ওই বিষয়মুখ সত্যের জ্ঞান লাভ করার আকাঙ্ক্ষার মূল্য বা সার্থকতা প্রমাণ করাও তার দ্বারা সম্ভব নয়। এইখানে তাই আমাদের স্বীয় অস্তিত্ব বিষয়ে নিছক যৌক্তিক ধারণার সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়।

তা বলে যেন ধরে নেওয়া না হয় যে, লক্ষ্য নির্ধারণ এবং নৈতিক বিচারবুদ্ধি গঠনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিযুক্ত চিন্তাধারার কোনরূপ ভূমিকা নেই। কেউ যখন উপলব্ধি করেন যে কোন লক্ষ্য পরিপূর্তির জন্য কোন বিশেষ সাধন কার্যকর হবে, তখন সেই সাধনই তার ফলে সাধ্যে পরিণত হয়। বুদ্ধি আমাদের কাছে সাধ্য এবং সাধিত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ সুস্পষ্ট করে তোলে। তবে চরম ও মূলীভূত লক্ষ্য কেবল চিন্তা দ্বারা অধিগত হয় না। আমার মতে বস্তুতঃ মানুষের সামাজিক জীবনে ধর্মের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে এই সব মৌলিক লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ সম্বন্ধে মানুষকে যথাযথ ভাবে সচেতন করে তোলা এবং মানবজীবনের হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে তাদের দৃঢ়সংলগ্ন বা সাকার করা। তবে কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে ওই সব মৌলিক লক্ষ্যের প্রামাণিকতার আধার কোথায়, তা হলে শুধু যুক্তি দিয়ে এর সমর্থন বা বর্ণনা করা যায় না বলে তার উত্তরে কেবল এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, সজীব সমাজে শক্তিশালী ঐতিহ্য রূপে এ সবের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং ওই অবস্থায় এগুলি ব্যক্তি-মানবের আচার, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিচারবুদ্ধির উপর ক্রিয়া করে। এই মৌলিক লক্ষ্যের অস্তিত্বের কোন সুসঙ্গত কারণ অন্বেষণের প্রয়োজন না থাকলেও এরা রয়েছে এবং শুধু রয়েছে নয়, প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা এর অস্তিত্ব অনুভূত হয় না, মহাপুরুষদের মাধ্যমে প্রত্যাদেশের দ্বারা এর অস্তিত্ব প্রকট হয়। এর হেতু অন্বেষণ করার প্রয়োজন নেই। সহজ, সরল এবং স্পষ্টভাবে এর স্বধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে হয়।

আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিচারবুদ্ধির উচ্চতম আদর্শের নিরিখ হচ্ছে ইহুদি-খ্রীষ্টান ধর্মীয় ঐতিহ্য। এ লক্ষ্য অতীব মহান্ এবং আমাদের এই ক্ষীণ শক্তি নিয়ে আমরা নিতান্ত অল্প মাত্রাতেই এর সন্নিকটবর্তী হতে পারি। কিন্তু তবু এই লক্ষ্য আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মূল্যবোধকে সুনিশ্চিত আধারভূমির অবলম্বন দেয়। এই লক্ষ্যকে তার ধর্মীয় পরিবেশ থেকে বিযুক্ত করে যদি কেউ এর মানবীয় দিকটির প্রতিই দৃষ্টিপাত করে, তা হলে সে বোধ হয় এর নিম্নপ্রকারের বর্ণন করবে : সমগ্র মানবজাতির সেবার জন্য ব্যক্তি-মানব যাতে তার ক্ষমতা মুক্ত ভাবে বিনিয়োগ করতে পারে তার জন্য তার অবাধ এবং দায়িত্বপূর্ণ বিকাশ।

এতে কোন ব্যক্তি-বিশেষ তো দূরের কথা, কোন বিশেষ শ্রেণী, গোষ্ঠী বা জাতির উপর দেবত্ব আরোপ করার অবকাশ নেই। ধর্মগ্রন্থ সমূহের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে যে, আমরা সকলেই কি একই পরম পিতার সন্তান নই? প্রত্যুত সূক্ষ্ম ভাবে দেখতে গেলে এই আদর্শ অনুযায়ী সমগ্র ভাবে মানবতার উপরও দেবত্ব আরোপ করা যায় না। একমাত্র ব্যক্তি-মানবই আত্মার অধিকারী এবং ব্যক্তি-মানবের সুমহান্ ভবিতব্য হচ্ছে সেবা করা। শাসন করা বা অন্য কোন উপায়ে নিজেকে কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া তার স্বধর্ম নয়।

বহিরাবরণের পরিবর্তে কেউ যদি মূলবস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে তা হলে দেখা যাবে যে, পূর্বোক্ত উক্তি গণতন্ত্রের মূলনীতি সূচক। যথার্থ গণতন্ত্রপ্রেমী তার নিজ জাতিকে ততটুকু মাত্রই ভজনা করতে পারে, যতটুকু একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। ধর্মপ্রাণ শব্দটিকে এখানে আমাদের দ্বারা নির্ধারিত অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

এ সবের মধ্যে তা হলে শিক্ষা ও শিক্ষানিকেতনের ভূমিকা কি? এই সব শিক্ষা-নিকেতনেরও কর্তব্য হবে তরুণ সম্প্রদায়কে সেইভাবে গড়ে তোলা, যাতে এইসব মৌলিক নীতি তাদের নিকট নিঃশ্বাসবায়ুর তুল্য হয়ে ওঠে। শুধু মৌখিক শিক্ষায় এ কার্য সাধিত হবে না।

এই সব সুমহান্ আদর্শকে চোখের সামনে রেখে যদি আমাদের যুগের জীবনযাত্রা ও গতি-প্রকৃতির সঙ্গে এর তুলনা করা যায় তা হলে বেশ স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়বে যে, সভ্য মানব আজ এক ভীষণ সংকটের সম্মুখীন। সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় খোদ্ শাসকবর্গই মানবতা বৃত্তির বিনষ্টি সাধনের জন্য চেষ্টা করেন। অন্যান্য অপেক্ষাকৃত স্বল্প বিপজ্জনক অঞ্চলে জাতীয়তাবাদ, পরমত-অসহিষ্ণুতা এবং স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের ভাতে মেরে জব্দ করার নীতি এই অমূল্য ঐতিহ্যের কণ্ঠরোধপ্রয়াসী।

ক্রমশঃ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভিতর এই সংকটের গভীরতা সম্বন্ধে সচেতনতা আসছে এবং এই বিপদের সঙ্গে যুঝবার উপযুক্ত হাতিয়ারের সন্ধানও চলছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে, আইনসভার প্রাঙ্গণে এবং সাধারণ ভাবে প্রতিষ্ঠান

সমূহের ভিতর দিয়ে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায়ের অনুসন্ধান চলছে। নিঃসন্দেহেই এ-জাতীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। তথাপি পুরাতনকালের মানুষ এমন একটি জিনিস জানতেন, যা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। পিছনে প্রাণবন্ত প্রেরণা না থাকলে সকল উপায়ই শেষ অবধি মরচে-পড়া হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমাদের ভিতর এই লক্ষ্যে উপনীত হবার আকাঙ্ক্ষা যদি যথেষ্ট সজীব ও সক্রিয় থাকে তা হলে তার উপযুক্ত উপায় আবিষ্কার ও কর্মের মাধ্যমে তাকে মূর্ত করার সময় শক্তির অপ্রতুলতা পরিদৃষ্ট হবে না।

[১৩৩৯]

২

বিজ্ঞান বলতে আমরা কী বুঝি এ সম্বন্ধে একটা সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন নয়। বিজ্ঞান হচ্ছে বিধিবদ্ধ চিন্তা দ্বারা এই বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ বস্তু-নিচয়কে যথাসম্ভব সুসঙ্গত সম্পর্ক-বন্ধনে গ্রথিত করার শতাব্দীব্যাপী সাধনা। আর একটু বলিষ্ঠভাবে বললে বলা যায় যে, বিজ্ঞান হচ্ছে স্বতন্ত্র সত্তাবাদের (Conceptualization) পদ্ধতিতে অস্তিত্বের উত্তরকালীন পুনর্গঠন প্রচেষ্টা। কিন্তু আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে ধর্ম কী, তা হলে এত সহজে তার উত্তর মাথায় আসে না। আর যদিও বা এখনকার মত সন্তোষজনক কোন জবাব মনে জাগে, তবুও আমি ভালভাবেই এ কথা জানি যে, এ সম্বন্ধে যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করে গেছেন, তাঁদের সকলের চিন্তাধারাকে কিয়ৎ পরিমাণেও একত্র সমাবিষ্ট করা আমার পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর নয়।

অতএব ধর্ম কী জিজ্ঞাসা করার পূর্বে সর্বপ্রথম আমি এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা পছন্দ করব যে, যাঁকে ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ বলে আমার মনে হচ্ছে, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার বৈশিষ্ট্য কী? তাঁকেই আমি ধর্মের বিভায় বিভাসিত বলব, যিনি নিজেকে যথাসাধ্য আত্মকেন্দ্রিক কামনা-বাসনার বন্ধনজালবিমুক্ত করে সর্বক্ষণ স্বার্থশূন্য চিন্তা, ভাবনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মগ্ন আছেন। আমার মতে কোন ঐশী সত্তার সঙ্গে যুক্ত করা হোক বা না হোক, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই অন্তর্লীন স্বার্থমুক্ত চারিত্র-ধর্মের শক্তি এবং এর সর্বপ্লাবী অর্থযুক্ততার প্রতি বিশ্বাসের গভীরতা। তা না হলে বুদ্ধ এবং স্পিনোজাকে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলে গণ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে এই ধারণা দ্বারা চালিত যে, তাঁর মনে এই স্বার্থশূন্য আদর্শ ও লক্ষ্যের তাৎপর্য ও মহানতা সম্বন্ধে সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ নেই, যদিও এইসব আদর্শ ও লক্ষ্যের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই বা তা থাকার প্রয়োজনও করে না। তার নিজের অস্তিত্বের মতই এগুলির অস্তিত্ব বাস্তব এবং

স্বতঃপ্রমাণিত। এই অর্থে ধর্ম হচ্ছে এইসব মূল্যবোধ এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণমাত্রায় সচেতন হয়ে প্রতিনিয়ত এর পরিণামকে শক্তিশালী এবং সর্বব্যাপক করার জন্য মানবসমাজের যুগ-যুগান্তের সাধনা। পূর্বোক্ত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী বিজ্ঞান এবং ধর্মের কল্পনা করলে কোনমতেই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না। কারণ বিজ্ঞান শুধু "কি"—তার উত্তর দিতে পারে, "কি হওয়া উচিত"—এ প্রশ্নের মীমাংসা করার সাধ্য বিজ্ঞানের নেই। তাই বিজ্ঞানের পরিধির বাইরেও সর্ববিধ প্রকারের মূল্যবিচারের অবকাশ রয়েছে। অন্যদিকে, ধর্ম শুধু মানুষের চিন্তা ও কার্যের মূল্যায়ন করে। প্রকৃত তথ্য এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্বন্ধে কথা বলার ন্যায়সঙ্গত অধিকার এর নেই। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী অতীতকালের সুপরিজ্ঞাত ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বসমূহকে বাস্তব অবস্থার ভুল ধারণাপ্রসূত ব্যাপার মনে করা উচিত।

এর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বাইবেলে যা কিছু লিখিত আছে তার সম্পূর্ণ অভ্রান্ততা মেনে নেবার জন্য যখন কোন ধর্মসম্প্রদায় পীড়াপীড়ি করে, তখন এক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এর অর্থ হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ধর্মের অহেতুক হস্তক্ষেপ। এই পটভূমিকায় ধর্মগুরুরা গ্যালিলিও এবং ডারুইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। অন্যদিকে আবার বিজ্ঞানের প্রতিনিধিরাও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতে সময় সময় মূল্যবোধ এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে মৌলিক বিচার করার প্রয়াস করেছেন এবং এই ভাবে নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছেন। মারাত্মক ভ্রান্তি থেকে এইসব সংঘর্ষের উদ্ভব।

যদিচ দেখা যাচ্ছে যে, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের বিহারক্ষেত্র পরস্পর থেকে পৃথক্ করে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তথাপি এতদুভয়ের মধ্যে গভীর পারস্পরিক সম্বন্ধ ও নির্ভরশীলতা বিদ্যমান। ধর্ম হয়তো মানবজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে; কিন্তু তা হলেও বিজ্ঞানের (এখানে এর উদারতম অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হল) কাছ থেকে ধর্মকে তৎনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থা সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান শুধু তাঁদের পক্ষেই সৃষ্টি করা সম্ভব, যাঁরা সত্য এবং ধী লাভের আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণভাবে জারিত। অবশ্য অনুভূতির এই উৎসের গোমুখী রয়েছে ধর্মের এলাকায়। এর সঙ্গে রয়েছে এই সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস যে, এই অস্তিত্বময় জগতের মূলে যেসকল কারণ বিদ্যমান তা যুক্তিসম্মত, অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা বোধগম্য। পূর্বোক্ত বিশ্বাসে ওতপ্রোত না হলে কেউ যথার্থ বৈজ্ঞানিক হতে পারেন বলে আমি ধারণা করতে পারি না। অবস্থাটা কতকটা এই ভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে: ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।

পূর্বে যদিও আমি এ কথা বলেছি যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের ভিতর বস্তুতঃ কোন ন্যায়সঙ্গত দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না, তা হলেও এর একটি জরুরী দিক সম্বন্ধে আর

একটু খোলসা করে বলা উচিত বোধ করছি। ঐতিহাসিক ধর্মের সঠিক অন্তর্নিহিত বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই এই সংশোধনী ব্যাখ্যা করব। ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধেই এই সংশোধনী ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মানবসমাজের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির উষালগ্নে মানুষ নিজের মূর্তিতে বহুদেববাদের কল্পনা করেছিল। মানুষ ভেবেছিল যে, দেবতারা তাঁদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে এই বস্তু-জগৎকে নিয়ন্ত্রিত না হলেও অন্ততঃ প্রভাবিত করেন। মন্ত্র-তন্ত্র এবং প্রার্থনা দ্বারা মানুষ এইসকল দেবতার বিধানকে নিজের অনুকূল করার চেষ্টা করত। এ যুগে ধর্মগ্রন্থসমূহের মাধ্যমে যে ঈশ্বরের ধারণা প্রচার করা হয়, তা দেববাদের সেই প্রাচীন ধারণার উদ্‌গতি। ঈশ্বরের এই নরাকৃতিবাদী প্রকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায় মানবের এই আচরণে যে, মানুষ আজও সেই ঐশী সত্তার কাছে প্রার্থনা প্রসঙ্গে নিজ কামনা ও ইচ্ছার পরিপূর্তি যাচ্ঞা করে।

এ কথা নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করবেন না যে, এক সর্বশক্তিমান, ন্যায়বিচারক এবং সর্বমঙ্গলকারী মানুষিক ঈশ্বর মানবকে সান্ত্বনা, সহায়তা এবং পথনির্দেশ দিতে পারেন। এ ছাড়া, সরলধর্মী হবার কারণে এই কল্পনা একান্ত অবিকশিত মনেরও অধিগম্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কল্পনার ভিতর সুস্পষ্ট দুর্বলতাও বিদ্যমান এবং ইতিহাসের সূচনা থেকেই এ কথা বেদনাদায়ক ভাবে অনুভূত হয়েছে। অর্থাৎ এই সত্তা যদি সর্বশক্তিমান হয়, তা হলে মানুষের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ সহ প্রত্যেকটি ঘটনা মানুষের প্রতিটি চিন্তা এবং প্রত্যেকটি মানবীয় হৃদয়াবেগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাও নিশ্চয় সেই পরম পুরুষেরই কৃতি। সুতরাং এরূপ এক সর্বশক্তিমান সত্তার উপস্থিতিতে মানুষকে কি করে তার কার্যকলাপ এবং চিন্তা-ভাবনার জন্য দায়ী করার কথা চিন্তা করা যেতে পারে? মানুষের কোন কৃতকর্মের জন্য শাস্তি বা পুরস্কার দেবার সময় তিনি বহুলাংশে নিজের আচরণ সম্বন্ধেই রায় দিচ্ছেন বলতে হবে। এর সঙ্গে তাঁর কল্যাণকারী রূপ এবং সত্যশীল প্রকৃতির সম্বন্ধ কোথায়?

ধর্ম এবং বিজ্ঞানের পরিধি সংক্রান্ত ইদানীন্তন বিবাদের মূল উৎস হচ্ছে এই মানুষিক ঈশ্বরের কল্পনা। বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে দেশকালের পটভূমিকায় বস্তু এবং ঘটনার পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়কারী 'সামান্য' নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা। এই সব প্রাকৃতিক নিয়ম বা বিধানের জন্য সম্পূর্ণ সাধারণ (general) বৈধ-বলবত্তা প্রয়োজন, এ কথার প্রমাণ দরকার করে না। মুখ্যতঃ এ একটি কার্যক্রম এবং নীতিগত ভাবে একে অধিগত করার প্রত্যয় শুধু আংশিক সাফল্যের উপর আধারিত। কিন্তু সম্ভবতঃ এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যিনি এই আংশিক সাফল্যকে অস্বীকার করবেন ও এ সবের মূলে মানুষের আত্মপ্রতারণা ক্রিয়াশীল বলে অভিযোগ করবেন। আধুনিক মানব এই সব প্রাকৃতিক বিধানের মর্ম খুব সামান্যই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেও তার চেতনায় এই কথা গভীরভাবে দাগ কেটে বসে গেছে যে, এই রকম

বিধানের ভিত্তিতেই আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর কালিক আচরণ সম্বন্ধে অতীব সূক্ষ্ম ও নিশ্চিত ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। সে জানে যে কয়েকটিমাত্র সরল নিয়মের সহায়তায় সৌরজগতের ভিতর অবস্থিত গ্রহনক্ষত্রের গতিপথ অত্যন্ত সঠিকভাবে পূর্ব হতেই গণনা করা যায়। এতটা সূক্ষ্ম রূপে না হলেও এই ভাবে কোন বৈদ্যুতিক মোটরের কার্যবিধি, বেতারের প্রেরকযন্ত্রের (transmission) গতি-প্রকৃতি বা বেতারযন্ত্রের কার্যকলাপ আগে থেকেই হিসাব করা যায়। এগুলির বেলায় কোন অভিনব তথ্যের বিকাশকালেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জটিল বস্তুর (phenomenological complex) উপাদানীভূত অংশগুলির সংখ্যা যখন খুব বেশী হয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অকার্যকারী প্রমাণিত হয়। আবহাওয়ার কথা ধরলেই পূর্বোক্ত বক্তব্য স্পষ্ট হবে। মাত্র কয়েক দিন পরের আবহাওয়া কি রকম হবে, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তবে এ বিষয়ে কেউ সন্দেহ করবেন না যে, এ ক্ষেত্রে আমরা এমন একটা কারণিক সম্বন্ধের সম্মুখীন, যার কারণিক উপাদানাবলী আমাদের কাছে মুখ্যতঃ বিদিত। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলী সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে অসমর্থ হবার কারণ প্রকৃতির মধ্যে বিধিবদ্ধতার অভাব নয়, এর মূলে রয়েছে বহুবিচিত্র হেতুর ক্রিয়াশীলতা।

জীবিত বস্তুসমূহের নিয়মের রাজ্যের ভিতর আমরা অপেক্ষাকৃত অগভীরভাবে প্রবেশ করেছি। তবে অন্ততঃ সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনের নিয়মের আভাস পাবার মত যথেষ্ট গভীরতায় অনুপ্রবেশ করতে আমরা সমর্থ হয়েছি। বংশগতির সুব্যবস্থিত অনুক্রম এবং জৈব সত্তার আচরণের উপর সুরাসার প্রমুখ বিষের ক্রিয়ার কথা চিন্তা করলে পূর্বোক্ত উক্তির সার্থকতা চোখে পড়বে। এক্ষেত্রে সর্ব-সামান্য সম্বন্ধের নিখুঁত ধারণার অভাব রয়েছে ; এদের বিধান সম্বন্ধে জ্ঞানের অপ্রতুলতা নেই।

মানুষ যতই সকল ঘটনার এইরূপ বিধিবদ্ধ নিয়মের ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় ততই তার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় যে, এই সুব্যবস্থিত নিয়মের রাজ্যে অন্যজাতীয় কিছু ঘটার মত কোনরকম ফাঁকের অবকাশ নেই। তার কাছে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী থেকে স্বতন্ত্র কারণ রূপে কোনরকম মানবীয় বা ঐশী ইচ্ছার বিধানের অস্তিত্ব নেই। তবে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপকারী নররূপী ঈশ্বরের ধারণাকে কোনমতেই প্রকৃত দৃষ্টি থেকে বিজ্ঞান দ্বারা খণ্ডন করা যেতে পারে না। কারণ এই মতবাদ চিরকালই সেই জ্ঞানরাজ্যে শরণ নিতে পারে, যেখানে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আজও প্রবেশ করতে পারেনি।

তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্মের প্রতিনিধিদের এবংবিধ আচরণ শুধু অনুপযুক্ত

নয়, মারাত্মকও বটে। কারণ যে মতবাদ স্পষ্ট আলোকে আত্মরক্ষা করতে পারে না, যার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অন্ধকারের শরণ নেওয়া প্রয়োজন হয়, মানবসমাজের উপর থেকে অবশ্যই তার প্রভাব অদৃশ্য হবে। কিন্তু ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেলে মানব-প্রগতির অপ্রমেয় ক্ষতি। নৈতিক মঙ্গলবিধানের সংগ্রামে ধর্মগুরুদের নরাকৃতি ঈশ্বরবাদকে বিসর্জন দেবার মত মহিমা অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ ভয় ও আশার যে উৎস থেকে অতীতে যাজকসম্প্রদায় অমিত ক্ষমতা সংগ্রহ করেছেন, তা বর্জন করতে হবে। ধর্মগুরুদের কর্মপ্রচেষ্টার সহায়ক হবে সেই শক্তি, যা মানুষের ভিতরই ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সত্য শিব সুন্দরের ভাবনার বিকাশসাধনক্ষম। এ দায়িত্ব সম্পাদন করা অপেক্ষাকৃত কঠিন, তবে অনেক বেশী যোগ্যতর, মহত্তর কার্য।* ধর্মগুরুরা উপরি-উক্ত বিশোধন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবার পর নিশ্চয় সানন্দে লক্ষ্য করবেন যে, বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান দ্বারা সত্যকার ধর্ম আরও শ্রীমৎ এবং অতলস্পর্শ হয়েছে।

মানবসমাজকে অহমিকাপূর্ণ কামনা, বাসনা এবং ভীতিবন্ধন থেকে যথাসাধ্য মুক্ত করা যদি ধর্মের অন্যতম লক্ষ্য হয়, তবে আর এক অর্থে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ধর্মের সহায়তা করতে পারে। যদিও এ কথা সত্য যে বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ও তার পরিণাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করণক্ষম নিয়মাবলী আবিষ্কার করা, তথাপি এ-ই তার একমাত্র আদর্শ নয়। আবিষ্কৃত সম্বন্ধাবলীকে বিজ্ঞান যথাসম্ভব স্বল্পসংখ্যক পরস্পর-স্বতন্ত্র ভাবমূলক (conceptual) মৌলিকে পরিণত করার অভিলাষী। বহুর ভিতর এই যুক্তিসম্মত একত্ব-দর্শন-প্রয়াসের ভিতরই এর সর্বোচ্চ সাফল্য পরিদৃশ্যমান। অবশ্য এ কথাও যথার্থ যে, এই প্রচেষ্টাই ভ্রমের শিকার হবার মত প্রচণ্ডতম সংকটের মুখে বিজ্ঞানকে ঠেলে দিতে বাধ্য করে। তবে যে কেউ এই ক্ষেত্রে সাফল্যজনক অগ্রগতির স্বাদ প্রগাঢ়ভাবে আস্বাদন করার সুযোগ পেয়েছেন, তিনিই বিশ্বসত্তার গভীর যৌক্তিকতা এবং নিয়মনিষ্ঠা দেখে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁর ভিতর ধীশক্তির অববাহিকা বেয়ে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার শৃঙ্খল-বন্ধন-মুক্ত সুদূরপ্রসারী নিবৃত্তির আবির্ভাব হবে। এর ফলে তিনি সমগ্র সত্তার ভিতর বিমূর্ত যুক্তি-মহিমার প্রতি একটা অতীব বিনত মানস-দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করবেন। এই যুক্তি-মহিমা অতীব গভীর হলে আর মানুষের অধিগম্য থাকে না। আমার কাছে অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গী ধর্মের উত্তুঙ্গতম স্থিতি বলে মনে হয়। সুতরাং আমার ধারণায় বিজ্ঞান ধর্মকে শুধু ঈশ্বরের নরাকৃতিবাদরূপী খাদ থেকেই মুক্ত করে না, বিজ্ঞান আমাদের জীবনবোধের এক ধর্মীয় অধ্যাত্মীকরণও করে থাকে।

* হার্বার্ট স্যামুয়েলের 'রিলিফ অ্যাণ্ড অ্যাকশান্' নামক গ্রন্থে এই ভাবধারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

মানুষের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই আমার স্থির বিশ্বাস জন্মাচ্ছে যে, জীবন বা মৃত্যুর প্রতি আতঙ্ক বা অন্ধবিশ্বাসের ভিতর যথার্থ ধার্মিকতার পথের নিশানা নেই। এর সন্ধান পাওয়া যাবে যৌক্তিক জ্ঞানলাভের প্রযত্নের ভিতর। এই অর্থে আমি মনে করি যে, ধর্মগুরুকে যদি তাঁর সুমহান্ শিক্ষাগত দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে তাঁকে শিক্ষকও হতে হবে।

[১৯৪১]

ধর্ম এবং বিজ্ঞান : এদের ভিতর সঙ্গতিবিধান করা কি অসম্ভব ?

ধর্ম এবং বিজ্ঞানের ভিতর সত্যসত্যই কি কোন অনতিক্রমণীয় বিরোধ বিদ্যমান? বিজ্ঞান কি ধর্মকে তার মর্যাদাচ্যুত করে সেই স্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর বহু শতাব্দী ধরে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, এমনকি এর ফলে তীব্র বাদ-বিবাদও হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, যদি পক্ষপাতশূন্য বিচার করা যায় তা হলে উভয় ক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহে আমরা নঞর্থক উত্তর পাব। এই বিষয়ে একটা সমাধানে উপনীত হবার পথে বৃহৎ বাধা হচ্ছে এই যে, 'বিজ্ঞান' বলতে কি বোঝায় এ সম্বন্ধে বেশীরভাগ লোক সহমত হলেও 'ধর্মের' সংজ্ঞার্থ নিয়েই তাদের ভিতর মতবৈষম্য হবার সম্ভাবনা বেশী।

আমাদের কাজের জন্য অতি সহজেই আমরা নিম্নপ্রকারে বিজ্ঞানের সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করতে পারি: "বিজ্ঞান হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাবলীর ভিতর সুনিয়ন্ত্রিত সম্বন্ধ-সূত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ চিন্তা।" প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞান জ্ঞানের জনক এবং পরোক্ষভাবে কর্মপদ্ধতির স্রষ্টা। পূর্ব হতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য সুগোচর থাকলে বিজ্ঞান প্রণালীবদ্ধ কার্যক্রমের ইঙ্গিত দেয়। তবে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং মূল্যবোধ নির্ণয় করা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রবহির্ভূত ব্যাপার। এ কথা সত্য যে, বিজ্ঞান তার কারণিক সম্বন্ধের ধারণা-শক্তি অনুযায়ী কোন বিশেষ আদর্শ বা মূল্যবোধের সুসংগতি বা বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেও লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ সম্বন্ধে স্বাধীন ও মৌলিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে থেকেই যায়।

পক্ষান্তরে সাধারণতঃ ধর্ম সম্বন্ধে এ কথা মেনে নেওয়া হয় যে, লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ নিয়েই এর কাজ। মানুষের চিন্তা ও কর্মের হৃদয়াবেগ সঞ্জাত আধারের উপরই মোটামুটি এর অবস্থিতি। তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, মানব-প্রজাতির অপরিবর্তনীয় বংশগত সংস্কারধর্মকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি মানুষের মনোভাব, ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের আদর্শ নির্ধারণ এবং মানবের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রই ধর্মের বিচরণভূমি। মানব-ঐতিহ্যের উপর শিক্ষাগত প্রভাব বিস্তার

এবং মহাকাব্য ও পুরাণ-জাতীয় কতকগুলি সহজলভ্য ভাবধারা ও কাহিনীর প্রচার ও বিকাশ সাধন দ্বারা ধর্ম পূর্বোক্ত আদর্শসমূহ রূপায়ণের চেষ্টা করে। এইসব কার্যসূচীর ফলে পূর্বস্বীকৃত আদর্শ অনুযায়ী মানবের মূল্যায়নক্রিয়া ও কার্যকলাপ প্রভাবিত হতে দেখা যায়।

ধর্মীয় ঐতিহ্যের এই পৌরাণিক, অথবা বলা যেতে পারে, সাংকেতিক অন্তর্গূঢ় বস্তুর সঙ্গেই বিজ্ঞানের সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা। এরকম ঘটে তখনই, যখন এই ধর্মীয় কল্পনারাজি বিজ্ঞানের এলাকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে গোঁড়ামিপূর্ণ উক্তি করে। অতএব ধর্মীয় লক্ষ্যের পরিপূর্তির জন্য বাস্তবিকপক্ষে অপরিহার্য নয় এমন সব বিষয় নিয়ে যাতে এ-জাতীয় বিবাদ উপস্থিত না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখা ধর্মের সত্যকার সংরক্ষণের জন্য অতীব প্রয়োজন।

পৌরাণিক কাহিনীর সংস্রব কাটিয়ে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে তাদের শুদ্ধ স্বরূপে নিরীক্ষা করলে আপেক্ষিকবাদী (relativistic) বা সনাতন রীতিসম্মত বিশ্বাসের প্রবক্তারা এইসব বিভিন্ন ধর্মমতের ভিতর যে পরিমাণ পার্থক্য আছে বলে আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন, আমি কিন্তু তাদের ভিতর তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য খুঁজে পাই না। অবশ্য একে কোনমতেই বিস্ময়কর আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ সমাজ ও তার ব্যক্তি-সদস্যদের মানসিক পবিত্রতা ও সজীবত্ব রক্ষা এবং তার অভিবৃদ্ধিই সর্বদা ধর্ম-আধারিত কোন সম্প্রদায়ের নৈতিক আচরণের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ না হলে সেই সমাজের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। মিথ্যাচার, অপযশ কীর্তন, প্রতারণা এবং হত্যা ইত্যাদিকে সম্মানকারী সমাজ বস্তুতঃ অধিককাল টিকতে পারে না।

ভাল ছবি বা ভাল গান বলতে কি বোঝায় তা বলা যেমন শক্ত, তেমনি কোন বিশেষ ঘটনার সম্মুখীন হলে কি যে কাম্য এবং কি বর্জনীয়, তা স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে বোঝার চেয়ে স্বজ্ঞা দিয়ে অনুভব করা সহজ। অনুরূপভাবে বলা যায়, মানবসভ্যতা যেসব সুমহান্ নৈতিক গুরুর জন্ম দিয়েছে, এক দিক থেকে তাঁদের ভিতর লোকোত্তর শিল্পপ্রতিভা ছিল, অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন জীবন-শিল্পী। জীবন-সংরক্ষণ এবং অহেতুক দুঃখ-জ্বালার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য-চালিত একেবারে প্রাথমিক উপদেশাবলী ছাড়া আরও এমন অনেক বিধান আছে, বাহ্যতঃ যা ওই সব প্রাথমিক উপদেশের সঙ্গে পুরোপুরি তুলনীয় না হলেও আমরা তাদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। এ প্রসঙ্গে সত্যের উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। সত্য পালন ও সত্য সকলের আয়ত্তগম্য করার জন্য মানুষের কষ্টকৃত শ্রম স্বীকারের এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভূত পরিমাণ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকলেও কি বিনা শর্তে সত্যের সাধন করতে হবে?

এইজাতীয় আরও অনেক প্রশ্ন আছে, যৌক্তিক স্থবিধার দিক থেকে সহজে বা মোটেই যার জবাব দেওয়া যায় না। তবুও আমি তথাকথিত আপেক্ষিকবাদী (relativistic) দৃষ্টিকোণকে যথার্থ বলে মেনে নিতে পারি না, এমনকি আরও স্থক্ষ্ম নৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে চর্চা করার সময়ও নয়।

একেবারে প্রাথমিক ধর্মীয় নির্দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক সভ্য মানবের বাস্তব জীবনযাত্রাপদ্ধতি বিবেচনা করলে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে, তার ফলে গভীর বেদনা ও হতাশার ভাব আসতে বাধ্য। কারণ ধর্ম যেখানে ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে পরস্পরের ভিতর ভ্রাতৃজনোচিত প্রেমসম্বন্ধ স্থাপন করার নির্দেশ দিচ্ছে, কার্যতঃ সেখানে ঐকতানের পরিবর্তে মল্লভূমির দৃশ্য চোখে পড়ছে। কি অর্থনৈতিক কি রাজনৈতিক—সর্ব ক্ষেত্রেই মূল নীতি হচ্ছে সঙ্গী-সহচরদের বঞ্চিত করে নিজ সাফল্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব এমনকি বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যেও বাসা বেঁধেছে। এর ফলে মানুষের মন থেকে ভ্রাতৃত্বভাব এবং সহযোগিতার মনোভাব অদৃশ্য হচ্ছে এবং মানুষ স্থষ্টিধর্মী ও মননশীল কার্যের প্রতি আকর্ষণকে সাফল্যের পরিমাপক বিবেচনা করার পরিবর্তে আত্মকেন্দ্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে পড়ার ভয়কে সাফল্যের ভিত্তি জ্ঞান করছে।

দুঃখবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, মানবস্বভাবের মধ্যেই এই রকম অবস্থার বীজ নিহিত রয়েছে। এ-জাতীয় মতবাদ প্রচারকারীরা সত্যকার ধর্মবিশ্বাসের বৈরী। কারণ তাঁদের বক্তব্যের পরোক্ষ তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ধর্মের শিক্ষাসমূহ উচ্চাদর্শের অলীক কল্পনা মাত্র এবং মানবীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে পথনির্দেশের অনুপযুক্ত। কয়েকটি তথাকথিত আদিম সংস্কৃতির সমাজগঠনপ্রণালী অনুধাবন করার পর এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, এই-জাতীয় পরাজিতের মনোভাব গ্রহণ করার পিছনে আদৌ কোন যুক্তি নেই। এই সমস্যার (ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করতে গেলে এই কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে পেবলো ইণ্ডিয়ানদের সমাজ-গঠন-বর্ণনাকারী রুথ বেনিডিক্টস্ লিখিত 'প্যাটার্নস অফ কালচার' গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। স্থকঠোর জীবনযাত্রার পরিবেশের ভিতরও এই উপজাতি মোটামুটি তাদের সমাজের সকলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাবের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার মত দুরূহ কার্য সম্পাদন করেছে। স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিন্দুমাত্র হ্রাস না ঘটিয়েই এদের ভিতর বাইরের চাপ বিবর্জিত মিতাচারী ও সহযোগিতামূলক জীবনাভ্যাস বিকশিত হয়ে উঠেছে।

এখানে ধর্মের যে ভাষ্য করা হল, তদনুযায়ী ধর্মীয় মনোভাবের উপর বিজ্ঞানের নির্ভরতা স্বয়মায়াত। আমাদের এই প্রবল জড়বাদী যুগে এই সম্বন্ধকে বড় সহজে

উপেক্ষা করা হয়। এ কথা সত্য যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলসমূহ ধর্ম বা নীতি-শাস্ত্রের বিচার-বিবেচনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে যেসব ব্যক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতীব মহান্ সৃষ্টিশীল অবদান রেখে গেছেন, তাঁরা সকলেই যথার্থ ধর্মীয় বিশ্বাসে ওতপ্রোত ছিলেন, অর্থাৎ তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে আমাদের এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক পূর্ণবস্তুর প্রতীক এবং জ্ঞানার্জনের যৌক্তিক প্রয়াস-প্রবণতার অধীন। হৃদয়ের এই বিশ্বাস যদি যথেষ্ট দৃঢ়মূল না হত এবং জ্ঞানান্বেষণ তৃষ্ণা যদি স্পিনোজা কথিত "ভগবান বুদ্ধিমানদের ভালবাসেন" (Amor Dei Intellectualis) নীতি দ্বারা উজ্জীবিত না হত, তা হলে তাঁরা মানবের সুমহান্ কীর্তিরাজি সম্পাদনকারী সেই নিরলস সাধনা চালিয়ে যেতে পারতেন না।

[১৯৪৮]

বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের নিয়ম

বিজ্ঞান যে সম্বন্ধের অন্বেষণ করে, তা অন্বেষণকারী-ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে বিদ্যমান বলে মনে করা হয়। মানুষ যেখানে স্বয়ং অন্বেষণের পাত্র, সেখানেও এই একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। অথবা বৈজ্ঞানিক উক্তির বিষয়বস্তু গণিতের মত আমাদের মানসসৃষ্ট ধারণাও হতে পারে। এরূপ ধারণার সঙ্গে যে বাহ্যজগতের কোন কিছুর সম্বন্ধ থাকতেই হবে, তার কিছু মানে নেই। তবে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক উক্তি বা নিয়মের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে : সেগুলি "সত্য বা মিথ্যা" (যথেষ্ট বা অপ্রচুর)। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, আমরা তাদের অনুমোদন করি বা বর্জন করি।

বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রক্রিয়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সুশৃঙ্খল একটি পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রক্রিয়া যে ধারণার শরণ নেয়, তা ভাবাবেগ-ব্যঞ্জক নয়। বিজ্ঞানবিদ্‌দের কাছে ইচ্ছা, মূল্যনির্ধারণ, ভাল, মন্দ বা কোন লক্ষ্যের অস্তিত্ব নেই ; আছে কেবল "হওয়া" (Being)। আমরা যতক্ষণ নিছক বিজ্ঞানের রাজত্বে থাকি, ততক্ষণ "নানৃতম্" জাতীয় উক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। সত্য-সন্ধ বিজ্ঞানীদের ভিতর কতকটা পিউরিটানদের মত সংযম থাকে—তিনি সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাচার ও ভাবালুতা থেকে দূরে থাকেন। এই বৈশিষ্ট্য এক ধীরগতি বিকাশের পরিণাম। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় এ এক অভিনব বস্তু।

পূর্বোক্ত উক্তি থেকে মনে হতে পারে যে, যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাধারার সঙ্গে বুঝি নীতিধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ বিভিন্ন ঘটনা ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক উক্তি কোন নৈতিক বিধান সৃষ্টি করতে অক্ষম। তবে যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাধারা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা নৈতিক বিধানাবলীকে যুক্তিবাদ-আধারিত ও সুশৃঙ্খল করা যায়। কতকগুলি মৌলিক নৈতিক প্রতিজ্ঞা (proposition)

সম্বন্ধে আমরা একমত হতে পারলে তার থেকে অপরাপর নৈতিক প্রতিজ্ঞাসমূহে উপনীত হওয়া যায়। তবে এর জন্য প্রাথমিক প্রতিজ্ঞাগুলি খুবই যথাযথভাবে বিবৃত হওয়া প্রয়োজন। গণিতের ক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধের (axioms) যে স্থান, নীতি-শাস্ত্রে পূর্বোক্ত প্রকারের নৈতিক প্রতিজ্ঞারও সেই ভূমিকা।

এই কারণে আমরা "কেন মিথ্যা কথা বলব না?"—এ-জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করা অর্থহীন বলে মনে করি না। এ ধরনের প্রশ্নকে আমরা যুক্তিসংগত মনে করি; কারণ এ-জাতীয় সকল আলোচনায় কোন-না-কোন প্রকারের নৈতিক প্রতিজ্ঞাকে অবলীলাক্রমে স্বতঃসিদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তারপর এইসব মৌলিক প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৈতিক বিধানাবলী আবিষ্কার করে আমরা সন্তুষ্টি বোধ করি। মিথ্যা কথা বলার ব্যাপারে যুক্তিধারা বোধ হয় কতকটা নিম্নপ্রকারে চলে: মিথ্যা বলার স্বভাব অপরের কথায় বিশ্বাস নষ্ট করে। আর এই-জাতীয় বিশ্বাস না থাকলে সামাজিক সহযোগিতা অসম্ভব বা দুরূহ হয়ে পড়ে। অথচ মানবজীবনের অস্তিত্ব ও সৌকর্যের জন্য পূর্বোক্ত প্রকারের সহযোগিতা অপরিহার্য। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, "নানৃতম্" নীতিবাক্যের পিছনে "মানবজীবন সংরক্ষণীয়" এবং "দুঃখকষ্ট যথাসম্ভব কমানো উচিত"—এই সনাতন দাবি ক্রিয়াশীল।

কিন্তু কোথা থেকে এইসব নৈতিক স্বতঃসিদ্ধির জন্ম? এগুলি কি মনগড়া? এগুলি কি কেবল মহাপুরুষের উক্তি? না, মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে এর সৃষ্টি এবং পরোক্ষভাবে ওইরকম অভিজ্ঞতা থেকেই এর সমৃদ্ধি? বিশুদ্ধ তর্কশাস্ত্রের দিক থেকে যাবতীয় স্বতঃসিদ্ধিই স্বেচ্ছাচারমূলক, নীতিশাস্ত্রের এলাকার স্বতঃসিদ্ধিও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে মনোবিজ্ঞান ও সুপ্রজননবিদ্যার (Genetics) দৃষ্টিকোণ থেকে এদের মোটেই স্বেচ্ছাচারমূলক বলা চলে না। দুঃখ-কষ্ট ও বিনষ্টি পরিহার করার আমাদের সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রতিবেশীর আচরণের পুঞ্জীভূত আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া থেকে এর সৃষ্টি।

প্রবুদ্ধ ব্যক্তি-মানব দ্বারা প্রভাবিত মানুষের নৈতিক প্রতিভার দৌলতে নৈতিক স্বতঃসিদ্ধির এরূপ বহুব্যাপক ও দৃঢ়মূল বিকাশ সাধিত হয়েছে যে মানুষ এখন তার ব্যক্তিগত ভাবাবেগ সঞ্জাত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও একে বহুলাংশে স্বীকার করে নিয়েছে। নৈতিক স্বতঃসিদ্ধির স্থাপনা ও বিচার-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধি থেকে খুব বেশী পৃথক্ নয়। অভিজ্ঞতার অগ্নি-পরীক্ষায় যা উত্তীর্ণ হয়, তার নামই সত্য।

[১৯৫০]

বালক-বালিকাদের প্রতি

সূর্যকরোজ্জ্বল এবং সৌভাগ্যশীল এক দেশের আনন্দময় তরুণের দল, তোমাদের সামনে পেয়ে আজ আমার হর্ষ বোধ হচ্ছে।

মনে রেখো, তোমাদের বিদ্যালয়ে তোমরা যেসব বিচিত্র জিনিস শেখো, তা সর্ব দেশের বহু যুগের কঠিন পরিশ্রমের আবিষ্কার। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ্ রূপে এসব একত্র করে এইজন্য তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা একে গ্রহণ করিবে, এর মর্যাদা বুঝবে, এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে এবং একদিন আবার তোমাদের সন্তান-সন্ততির হাতে এসব সঁপে দেবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সৃষ্ট এইসব স্থায়ী উপাদানের ভিতর দিয়ে এইভাবে আমাদের মত মরণশীল জীব অমরত্ব লাভ করে।

এ কথা যদি সর্বদা স্মরণ রাখ, তা হলে তোমাদের জীবন ও যাবতীয় কাজ-কর্মের একটা অর্থ খুঁজে পাবে এবং অন্যান্য দেশ ও যুগের প্রতি তোমাদের সঠিক মনোভাব গড়ে উঠবে।

[১৯৩৪]

শিক্ষা ও শিক্ষাদাতা

(জনৈকা তরুণীকে লিখিত পত্র)

আপনার পাণ্ডুলিপির প্রায় ষোল পৃষ্ঠা আমি পড়েছি এবং পড়ে হেসেছি। রচনা পড়ে আপনার বুদ্ধিচাতুর্য, স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছি। বেশ কিছুদূর পর্যন্ত আপনার রচনা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে; কিন্তু তবু বলব যে লেখাটি আসলে মেয়েলী ধাঁচের হয়েছে। মেয়েলী বলতে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, রচনাটি ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে উৎপন্ন এবং এর ছত্রে ছত্রে ব্যক্তিগত রোষের জালাই ফুটে বেরোচ্ছে। আমার শিক্ষকদের কাছ থেকেও আমার অনুরূপ আচরণ পাবার দুর্ভাগ্য হত। আমার স্বাধীন মনোভাবের জন্য তাঁরা আমাকে অপছন্দ করতেন এবং সহকারীর প্রয়োজন ঘটলে আমাকে কখনও ডাকতেন না। তবে আমাকে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, আদর্শ ছাত্র হিসাবে আমি আপনার চেয়ে নীচু স্তরের ছিলাম। আমার স্কুল-জীবন কিভাবে কেটেছে সে সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার কাছে উপযুক্ত বলে মনে হয় না এবং সে রচনা কেউ ছাপুন বা সত্য সত্যই পড়ুন, এ দায়িত্ব নেওয়া তো আরও আমার অপছন্দ। এ ছাড়া, অন্য যেসব ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ পন্থায় এই বিশ্বে একটু স্থান করে নেবার প্রয়াস করছে, তাদের বিরুদ্ধে অনুযোগ অভিযোগ করলে মান থাকে না।

সুতরাং আপনার উষ্মা সংবরণ করে পাণ্ডুলিপিটি আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য রেখে দিন। আপনার ছেলেমেয়েরা এটি দেখলে সান্ত্বনা পাবে এবং তাদের শিক্ষকরা তাদের কি বললেন বা তাদের সম্বন্ধে কি ভাবলেন, এ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাবে না।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে, আমি প্রিনস্টনে যাচ্ছি গবেষণা করার জন্য, শিক্ষা দিতে নয়। আজকাল বড় বেশী শিক্ষার প্রকোপ চলেছে। বিশেষ, আমেরিকার বিদ্যালয়-গুলিতে বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত। শিক্ষাদানের একমাত্র যুক্তিযুক্ত পন্থা হচ্ছে স্বয়ং উদাহরণ হওয়া। অন্ততঃপক্ষে, এমন উদাহরণ, যা দেখে অপর সকলে সতর্ক হতে পারে।

[১৯৩৪]

শিক্ষা প্রসঙ্গে

...মাত্র সত্যোপলব্ধি যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে এই জ্ঞানকে যদি হারাতে না হয় তা হলে নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়াস দ্বারা এর পুনর্নবীকরণ করতে হবে। এর অবস্থা হচ্ছে মরুবক্ষে প্রোথিত মর্মর শিলার মত। বালুকা প্রবাহ দ্বারা এর সমাধি রচিত হবার আশঙ্কা নিত্য সমুদ্যত। চিরকাল ওই মর্মর-ফলক যাতে রবিকরে দ্যুতি বিকীর্ণ করে তার জন্য এর সেবাকারী হস্তকে প্রতিনিয়ত সক্রিয় থাকতে হবে। জ্ঞানের সেবায় লিপ্ত এই হাতগুলির ভিতর আমার হাত দুখানিও থাকবে।

বিদ্যালয় সমূহ চিরকালই ঐতিহ্যসম্পদ্কে যুগ থেকে যুগান্তরে বয়ে নেবার কাজে মহত্তম সাধন রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। পূর্বের তুলনায় আজ এ উক্তি অধিকতর সত্য। কারণ আর্থিক জীবনের আধুনিক বিকাশের ফলে ঐতিহ্য এবং শিক্ষার ধারক হিসাবে পরিবারের শক্তি সংকুচিত হয়েছে। সুতরাং মানবসমাজের অস্তিত্ব এবং স্বাস্থ্য আজ পূর্বের তুলনায় অধিকতর মাত্রায় বিদ্যালয় সমূহের উপর নির্ভরশীল।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, বিদ্যালয় তরুণ সম্প্রদায়ের ভিতর সর্বোচ্চ পরিমাণ জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবার যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এটা ঠিক নয়। জ্ঞান প্রাণের অস্তিত্ব বিহীন ; অথচ বিদ্যালয়ের কারবার জীবিতদের নিয়ে। সর্বসাধারণের মঙ্গলকর গুণাবলী এবং কর্মক্ষমতা ছাত্রছাত্রীদের ভিতর সৃষ্টি করাই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তবে আমার বক্তব্য এই নয় যে, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিলোপ সাধন করে ব্যক্তিকে শুধু মধু-মক্ষিকা বা পিপীলিকার মত সমাজের হস্তধৃত আয়ুধে রূপান্তরিত করতে হবে। কারণ ব্যক্তিগত মৌলিকতা ও ব্যক্তিগত লক্ষ্য বিবর্জিত ছাঁচে-ঢালা ব্যক্তি-গোষ্ঠীর সমবায়ে রচিত সমাজ নিঃসন্দেহে দুর্বল সমাজ এবং এর ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাও রুদ্ধ। পক্ষান্তরে আমাদের আদর্শ হবে স্বাধীন ভাবে

চিন্তা ও কার্যকরণক্ষম ব্যক্তি-মানবের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এরা সমাজসেবাতেই জীবনের চরমোৎকর্ষের ইঙ্গিত পাবে। আমি যতদূর জানি, ইংলণ্ডের বিদ্যালয়-ব্যবস্থা এই আদর্শের সবচেয়ে কাছাকাছি আসে।

কিন্তু এই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় কি? নিছক উপদেশ-নির্দেশের দ্বারা কি অভীষ্ট সিদ্ধ হবে? মোটেই না। কেবল শব্দ চিরকালই শূন্যগর্ভ ধ্বনি এবং আদর্শের প্রতি মৌখিক আনুগত্য বরাবর ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছে। শুধু মুখের কথায় বা বক্তৃতায় মস্তক উন্নত করে চলনক্ষম মানুষ সৃষ্টি হয়না। এর জন্য পরিশ্রম এবং কাজ করতে হয়।

এই জন্য যে শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রকে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করতে হয়, তাই সর্বকালে সর্বাপেক্ষা মহত্বপূর্ণ শিক্ষা-পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হয়েছে। শিশুর হাতেখড়ি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হবার জন্য থিসিস দাখিল করা পর্যন্ত, বা কোন কবিতা মুখস্ত করা থেকে আরম্ভ করে সংগীত রচনা, ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বা অনুবাদ অথবা গণিতের কোন সমস্যা সমাধান করা বা শরীর-চর্চা করা—সর্বত্র এই নীতি প্রযোজ্য।

তবে প্রতি কর্মের পিছনেই উদ্দেশ্য থাকে এবং ওই উদ্দেশ্য তার আধার স্বরূপ। কর্ম সুসম্পাদিত হলে এই আধাররূপী উদ্দেশ্য শক্তিশালী ও পুষ্ট হয়। এইখানে প্রচণ্ড পার্থক্যের অবকাশ রয়েছে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মূল্যের পক্ষে এর গুরুত্ব সমধিক। একই কার্যের প্রেরণার উৎস একাধিক হতে পারে। ভয় ও বলপ্রয়োগ, কর্তৃত্ব ও প্রতিষ্ঠালাভের আকিঞ্চন, অথবা বিষয়টির প্রতি যথার্থ আগ্রহ ও সত্য এবং জ্ঞানার্জন বাসনা (এই ঐশী জিজ্ঞাসুবৃত্তি প্রতিটি সুস্থ শিশুর ভিতরেই থাকে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিশীঘ্র তা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।) ইত্যাদি বিবিধ চিত্তবৃত্তি চালিত হয়ে কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব। একই কার্য সম্পাদনের দ্বারা ছাত্রের উপর বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাগত প্রভাব পড়তে পারে। আহত হবার আতঙ্ক, অহমিকাপূর্ণ ভাবাবেগ, অথবা সুখ ও সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যা-ই না কোন বৃত্তি এর মূলে কাজ করবে, তদনুযায়ী পরিণামগত পার্থক্য হবে। আর এ কথা কেউ নিশ্চয় বিশ্বাস করবে না যে, বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের ভাবভঙ্গী ছাত্রদের মনোবৈজ্ঞানিক গঠনক্রিয়াকে কোনরূপে প্রভাবিত করে না।

আমার কাছে কোন বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা জঘন্য বস্তু হচ্ছে প্রধানতঃ ভয়, বলপ্রয়োগ এবং কৃত্রিম কর্তৃত্বের চাপে কাজ করানো। এইরূপ আচরণের ফলে ছাত্রের সুস্থ ভাবাবেগ, আন্তরিকতা এবং আত্মপ্রত্যয় বিনষ্ট হয়। এর পরিণামে আজ্ঞাতন্ত্রের বশংবদ প্রজা সৃষ্টি হয়। জার্মানী এবং রাশিয়াতে যে এই-জাতীয় শিক্ষায়তন প্রচলিত এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমি জানি যে, এ দেশের শিক্ষানিকেতনগুলি এই চরম

গ্লানির স্পর্শমুক্ত। সুইজারল্যাণ্ড এবং সম্ভবতঃ প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও এই অন্যায়ের প্রভাব বিহীন। এই হীনতম অন্যায় থেকে বিদ্যানিকেতনগুলিকে মুক্ত রাখা খুবই সহজ ব্যাপার। শিক্ষকের হাতে যথাসম্ভব স্বল্প দণ্ড-শক্তি দিন। তা হলে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধার একমাত্র উৎস হবে তাঁর মানবোচিত এবং মানসিক গুণাবলী।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা (বা একটু মৃদু ভাষায় বলতে গেলে—মানমর্যাদা পাবার বাসনা) মানবস্বভাবে দৃঢ়ভাবে নিহিত। এই-জাতীয় মানসিক মদিরা ব্যতিরেকে মানুষের ভিতর সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি হওয়া একেবারে অসম্ভব। সহচরদের কাছে প্রশংসা পাবার আগ্রহ নিঃসন্দেহেই অন্যতম সমাজ-বন্ধনসৃষ্টিকারী শক্তি। এই বহুবিচিত্র ভাবনার রাজ্যে গঠনমূলক এবং ধ্বংসাত্মক শক্তি অতি কাছা-কাছি বাস করে। অপরের কাছে মানমর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছা স্বাস্থ্যকর বাসনা। কিন্তু নিজের সঙ্গী-সাথী বা অপর কোন ছাত্র অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, বলবান বা বুদ্ধিমান বলে স্বীকৃতি পাবার ইচ্ছা সহজেই অত্যন্ত অহমিকাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে এবং এই ভ্রান্ত মনোভাব ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজ—উভয়ের পক্ষেই হানিকর হতে পারে। এইজন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকবর্গ এই বিষয়ে সতর্ক থাকবেন যে, ছাত্রদের শ্রমসাধ্য কার্যে উদ্ বুদ্ধ করার জন্য যেন ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির সহজ পন্থা গ্রহণ করা না হয়।

অনেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবৃত্তিকে প্রোৎসাহিত করার জন্য ডারুইন কথিত "অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম" ও তৎসংশ্লিষ্ট উদ্বর্তনের মতবাদকে নজির হিসাবে পেশ করেন। অনেকে এই-জাতীয় মেকী বৈজ্ঞানিকতার ভিত্তিতে ব্যক্তি ও ব্যক্তির ভিতর ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এটা ভুল ; কারণ সমাজবদ্ধ জীব বলেই মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করার শক্তি পেয়েছে। উদ্বর্তনের জন্য একটি পিপীলিকার সঙ্গে সমগ্র পিপীলিকা যূথের সংগ্রাম যতটুকু প্রয়োজনীয়, মানবসম্প্রদায়ের কোন একক সদস্যের বেলায়ও সংগ্রাম ঠিক ততটুকু দরকারী।

কাজেই প্রচলিত অর্থে যাকে 'সাফল্য' বলে তা যাতে ছাত্রদের কাছে জীবনের লক্ষ্য বলে প্রচারিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ জীবনে সফল তাকেই বলা হয়, যে তার সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে অনেক পেয়েছে। সমাজকে এর বিনিময়ে সে যা সেবা দিয়েছে, সাধারণতঃ এই প্রাপ্তির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে থাকে। মানুষ সমাজের কাছ থেকে কতটা আদায় করে নিল তার ভিত্তিতে নয়, সমাজকে সে কতটা দিল সেই ভিত্তিতেই তার মূল্য নিরূপণ করতে হবে।

কাজ করার আনন্দ, কাজের পরিণামের আনন্দ এবং সমাজের কাছে সেই

পরিণামের মূল্য উপলব্ধি করার আনন্দ—এই হবে শিক্ষানিকেতন ও জীবনের চলার পথে কাজ করার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তরুণ সম্প্রদায়ের ভিতর এই মানসিক শক্তি জাগ্রত করা ও তার পরিপুষ্টিসাধনের ভিতরই আমি বিদ্যালয় সমূহের চরম সার্থকতা দেখি। শুধু উপরি-উক্ত মনোবৈজ্ঞানিক আধারই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ জ্ঞান ও শিল্পসৃষ্টির প্রতি সানন্দ কামনার পথ নির্দেশ করে।

শক্তিচর্চা ও আত্মকেন্দ্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা অপেক্ষা এই সব সৃষ্টি-মূলক মনোবৈজ্ঞানিক শক্তির অনুশীলন অবশ্যই দুরূহ; কিন্তু সেজন্যই এ কাজ অধিকতর মূল্যবান। আসল কথা, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে শিশুকে সাফল্যসহকারে উপনীত করবার জন্য তার ভিতর শিশুজনোচিত ক্রীড়াশক্তি এবং বালকোচিত স্বীকৃতি পাবার আকাঙ্ক্ষার বিকাশ সাধন করতে হবে। অর্থাৎ এই শিক্ষা প্রধানতঃ সফল কার্যকলাপ এবং সমাজের স্বীকৃতি পাবার অভীপ্সার উপর আধারিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যালয়গুলি যদি সাফল্য সহকারে কাজ করতে পারে তা হলে তরুণ সম্প্রদায় তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করবে এবং বিদ্যালয় থেকে যে সব ঘরের কাজ দেওয়া হবে, ছাত্ররা তা আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করবে। আমি এমন অনেক শিশুর কথা জানি, যারা ছুটীর চেয়ে বিদ্যালয় খোলা থাকলে বেশী খুশী হয়।

এই রকম বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজ পদে নিযুক্ত একপ্রকার শিল্পী হতে হবে। এই মনোভাব বিদ্যালয়ে পরিব্যাপ্ত করার জন্য কি করা উচিত? মানুষকে সুস্থ রাখার যেমন কোন সর্বমান্য পদ্ধতি নেই, তেমনি এই কার্য সাধনের উপযোগী কোন বিশ্বজনীন নিয়ম নেই। তবে কয়েকটি শর্ত আছে এবং সেগুলিকে পালন করা যেতে পারে। প্রথমতঃ শিক্ষকদের এই-জাতীয় বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠতে হবে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষককে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। কারণ এ কথা শিক্ষকের বেলায় আরও বেশী সত্য যে, বাইরের চাপ ও জুলুম তাঁর কর্মের আনন্দ নষ্ট করে দেয়।

আপনারা যদি আমার চিন্তাধারাকে এই পর্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে অনুসরণ করে থাকেন, তা হলে একটি কথা ভেবে আপনারা সম্ভবতঃ বিস্মিত হবেন। আমার মতে কোন্ মূল নীতি দ্বারা চালিত হয়ে তরুণদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আমি এ যাবৎ কিছুই বলিনি। শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা প্রধান হবে, না, বিজ্ঞান-আধারিত যান্ত্রিক শিক্ষা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে?

এর উত্তরে আমি বলব যে, এ সব গৌণ ব্যাপার। শরীর চর্চা এবং পদচারণা করে যদি কোন যুবক তার পেশী এবং শারীরিক সহনশক্তির বিকাশ সাধন করে, তা হলে পরবর্তী কালে সে যে-কোন শরীর-শ্রম-মূলক কার্যের উপযুক্ত প্রতীয়মান হবে। মনকে গড়ে তোলা এবং মানসিক ও দৈহিক কুশলতা প্রয়োগের ব্যাপারেও ওই একই

কথা প্রযোজ্য। শিক্ষার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রসিকতা করে একজন বলেছিলেন, "বিদ্যালয়ে যা শেখানো হয়েছে তার সবটুকু ভুলে যাবার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তার নাম শিক্ষা।" তিনি কিছু ভুল বলেননি। এই কারণে আমি ভাষাতত্ত্ব-ইতিহাস-মুখ্য সনাতন শিক্ষা-পদ্ধতির সমর্থক এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রসারকামীদের দ্বন্দ্বে কোন একটি পক্ষ গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহশীল নই।

পক্ষান্তরে আমি এই বিচারধারার বিরোধিতা করতে চাই যে, মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রয়োজনীয় বিশেষ জ্ঞান ও গুণাবলী সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে সরাসরি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে। জীবনের দাবি বহুবিচিত্র। সুতরাং বিদ্যালয়ে এ-জাতীয় বিশেষ জ্ঞান আধারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। তাছাড়া আমার মতে মানুষকে এই-জাতীয় প্রাণহীন যন্ত্র মনে করা আপত্তিজনক। বিদ্যালয়ের আদর্শ সর্বদাই এই হবে যে, তরুণ ছাত্রটি যেন বিশেষজ্ঞ হিসাবে নয়, সুষম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে বিদ্যালয় থেকে বেরোয়। কারিগরী বিদ্যার (technical) বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক নির্দিষ্ট ধরনের পেশা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হলেও, আমার মতে পূর্বোক্ত কথা অংশতঃ তাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বিশেষ জ্ঞান অর্জন নয়, স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও বিচার করার শক্তির বিকাশকার্যকেই সর্বদা মুখ্য স্থান দিতে হবে। যে ব্যক্তি নিজ বিষয়ের মূলগত সত্যের অধিকারী হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্য করতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই নিজ পথ খুঁজে পাবেন। এ ছাড়া যাঁর প্রশিক্ষণ মূলতঃ সবিস্তার জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া আধারিত, অর্থাৎ যিনি বিশেষজ্ঞ হবার শিক্ষা নিয়েছেন তাঁর তুলনায় পূর্বোক্ত সুসামঞ্জস্য বিশিষ্ট ব্যক্তি পৃথিবীর প্রগতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে অধিকতর দক্ষতা সহকারে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন।

সর্বশেষে আমি এই কথাটির উপর আর একবার জোর দিতে চাই যে, এখানে কতকটা সুনিশ্চিত ভাবে যে সব উক্তি করা হয়েছে তা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিমতের চেয়ে বেশী কিছু বলে দাবি করা হচ্ছে না। এই ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তি ছাত্র এবং শিক্ষক হিসাবে আহরিত তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়।

[১৯৩৬]

শিক্ষা—স্বাধীন চিন্তার জন্য

মানুষকে বিশেষজ্ঞ করে তোলাই যথেষ্ট নয়। এর পরিণামে সে এক-জাতীয় যন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের সুসংগত বিকাশ ঘটবে না। ছাত্রের মনে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সম্যক্ অনুভূতি এবং সজীব সংবেদনা জাগ্রত হওয়া অতীব প্রয়োজন। তার ভিতর সুস্পষ্ট সৌন্দর্যানুভূতি ও সুনীতির বোধ থাকবে। নচেৎ

তার বিভাগীয় জ্ঞানের জন্য তাকে সুসংগত ভাবে বিকশিত মানবের পরিবর্তে বরং সুশিক্ষিত একটি সারমেয় বলে মনে হবে। ব্যক্তি-মানব এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে উপযুক্ত সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য তাকে মানুষের মনের অভিপ্রায়, তাদের ভুল-ভ্রান্তি এবং দুঃখ-দুর্দশার কথা জানতে হবে।

শিক্ষকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দ্বারাই তরুণ সম্প্রদায়ের ভিতর মূল্যবান সব কিছু সংক্রামিত করা হয়। পাঠ্যপুস্তকের স্থান এখানে নেই বললেও চলে, থাকলেও তা অতীব গৌণ। মূলতঃ এই হচ্ছে সংস্কৃতির উপাদান এবং এর ফলেই সংস্কৃতি সংরক্ষিত হয়। আমি যখন বলি যে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের নীরস এবং খণ্ডিত জ্ঞানের পরিবর্তে মানবতাবোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত জ্ঞানের চর্চা করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তখন আমার মনে পূর্বোক্ত ভাবধারাই ক্রিয়া করে থাকে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যবস্থার উপর প্রয়োজনাতিরিক্তি গুরুত্ব আরোপ এবং আশু উপকারী হবে এই বিবেচনায় জ্ঞানের অপরিণত বিশিষ্টকরণের (Specialization) ফলে সাংস্কৃতিক জীবনের মূলাধারেই কুঠারাঘাত করা হয়। বিশিষ্ট জ্ঞানও তখন এই সর্বনাশ এড়াতে পারে না।

আদর্শ শিক্ষার জন্য তরুণ সমাজের ভিতর স্বাধীন ও যুক্তিপন্থী চিন্তাশক্তির বিকাশ হওয়া অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন ও বহুমুখী বিষয়ের গুরুভারে পূর্বোক্ত শক্তিবিকাশ ভীষণ ভাবে ব্যাহত হয়ে থাকে। গুরুভারের ফলে স্বভাবতই পল্লবগ্রাহিতার সৃষ্টি হয়। শিক্ষাদান কার্য এমন হওয়া উচিত যাতে ছাত্রকে যেটুকু শিক্ষা দেওয়া হয় তা যেন সে বহুমূল্য দান বলে মনে করে, এ যেন কঠোর কর্তব্য বলে প্রতীত না হয়।

[১৯৫২]

বার্নার্ড শ'কে অভিনন্দন প্রসঙ্গে

খুব অল্প লোকেরই স্বয়ং অসম্পৃক্ত থেকে সমসাময়িক কালের দুর্বলতা ও মূঢ়তা দেখার মত যথেষ্ট স্বাধীন ও স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি থাকে। আবার মানবস্বভাবের ঔদাসীন্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটার পর এই-জাতীয় অনাসক্ত প্রকৃতির মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তি স্বভাবতই অত্যল্প কালের ভিতর তাঁদের মানব-স্বভাব সংশোধন করার উদ্যম হারিয়ে ফেলেন। অতীব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই স্বীয় যুগকে সূক্ষ্ম রসিকতা ও চারুতার দ্বারা মোহিত করতে পারেন এবং শিল্পকলার মত নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের মাধ্যমে নিজ স্বরূপ দেখার জন্য তার সম্মুখে মুকুরটি তুলে ধরতে পারেন। এই পদ্ধতির সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতী ব্যক্তিকে, আমাদের সকলকে আনন্দ বিতরণকারী ও শিক্ষাদানকারী সেই মহাপুরুষকে আজ আমার প্রাণের প্রণাম জানাই।

[১৯৩০]

সিগমুণ্ড ফ্রয়েডকে

আপনার ভিতর সত্যোপলব্ধির বাসনা যেভাবে সব কিছুকে ছাপিয়ে প্রকাশমান, তা সত্যসত্যই প্রশংসনীয়। মানবদেহের প্রেমমূলক ও প্রাণীন বৃত্তির সঙ্গে কি ভাবে তার দ্বন্দ্বশীল ও ধ্বংসাত্মক বৃত্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তা আপনি সংশয়াতীত স্বচ্ছতা সহকারে সপ্রমাণ করেছেন। সেই সঙ্গে আপনার ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত সুনিপুণ যুক্তি থেকে বোঝা যায় যে, মানবজাতিকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সংঘাতের করাল গ্রাস থেকে ত্রাণ করার মহৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে কী গভীর সদিচ্ছা আপনি অন্তরে পোষণ করেন! যীশুখ্রীষ্ট থেকে আরম্ভ করে গ্যেটে ও কাণ্ট পর্যন্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের যে সব পথিকৃৎ নিজ দেশ ও সমগ্র বিশ্বে কালোত্তর সম্মানের অধিকারী হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের ঘোষিত লক্ষ্যই ছিল এই। মানবসমাজের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যৎসামান্য সাফল্য অর্জন করলেও এঁরা যে নেতা রূপে সকলের দ্বারা পূজিত হয়েছেন, এটা কি তাৎপর্যপূর্ণ নয়?

আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, যে সব মহাপুরুষের অবদান সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে নিজেদের সমসাময়িক জনসাধারণের চেয়ে তাঁদের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাঁরাও প্রচণ্ড ভাবে এই আদর্শে প্রাণবন্ত ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের উপর তাঁদের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ। অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় যে, জাতিসমূহের ভাগ্যের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এই ক্ষেত্রটিকে সম্ভবতঃ অনিবার্য রূপে হিংসা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার হাতে উৎসর্গ করে দিতে হবে।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা সরকারের পদমর্যাদার মূলে অংশতঃ দণ্ডশক্তি ও অংশতঃ গণনির্বাচন ব্যবস্থা বিদ্যমান। তাঁদের নিজ জাতির নৈতিক ও মানসিক ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলে স্বীকার করা চলে না। বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে আজ মননশীল জগতের কুল-চূড়ামণিদের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। তাঁদের ভিতর সংহতির অভাব থাকায় সমসাময়িক সমস্যাবলীর সমাধানে তাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণে অসমর্থ। আপনি কি মনে করেন না যে, যাঁদের কার্যকলাপ ও অবদান এ যাবৎ নিঃসংশয়ে তাঁদের যোগ্যতা ও উদ্দেশ্যের সততা সপ্রমাণ করেছে, তাঁদের ভিতর স্বাধীন মেলামেশার ব্যবস্থা হলে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে? এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সদস্যদের সদাসর্বদা পারস্পরিক বিচারবিনিময় দ্বারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে। এঁরা প্রয়োজন বোধ করলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করবেন। (অবশ্য কোন বিশেষ বক্তব্যের দায়িত্ব সেই বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারীদের উপর বর্তাবে।) এবং এই-ভাবে রাজনৈতিক প্রশ্নাবলীর সমাধানের পথে তাঁরা যথেষ্ট ও সুফলদায়ক নৈতিক প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হবেন। মানবস্বভাবের অপূর্ণতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত বিবিধ ত্রুটী ও দুর্বলতা বিদ্বৎসমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহেও দৃষ্টিগোচর হয়। নিঃসন্দেহে এই-জাতীয় সঙ্ঘকেও তা আক্রমণ করবে। তবে ওই সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই বাবদে একটা ঝুঁকি নেওয়া কি অন্যায়? আমি তো এ প্রচেষ্টাকে অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য করি।

পূর্বোক্ত ধরনের কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান যদি বুদ্ধিজীবীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাকে অবশ্যই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। নৈরাশ্যপীড়িত হয়ে যাঁদের শুভ ইচ্ছা আজ পঙ্গু, এ তাঁদের মনে আশা ও উদ্যম সৃষ্টি করবে। আর একটি কথা, আমি বিশ্বাস করি যে, নিজ নিজ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সমাদৃত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত এই-জাতীয় সঙ্ঘ 'লীগ অফ নেশনসের' সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বহুমূল্য নৈতিক সমর্থন দেবার পথে যথার্থ সহায়ক রূপে পরিগণিত হবে, যাঁরা ওই প্রতিষ্ঠানের মহান্ উদ্দেশ্যের পরিপূর্তির জন্য যথার্থই কাজ করে যাচ্ছেন।

বিশ্বের আর কারও কাছে এ সব প্রস্তাব পেশ করার পূর্বে আপনার কাছেই করা উচিত। কারণ আশার ছলনে ভোলবার পাত্র আপনি নন, তা ছাড়া আপনার অন্য-নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণের সঙ্গে অতীব উচ্চ গ্রামের দায়িত্বজ্ঞান ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

[১৯৩১]

দেশনায়ক গান্ধী

রাজনীতির ইতিহাসে গান্ধী অদ্বিতীয়। নিগৃহীত এবং নিপীড়িত জাতির মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তিনি এক সম্পূর্ণ অভিনব ও মানবীয় পদ্ধতির আবিষ্কার

করেছেন এবং অসীম উদ্যম ও অপরিসীম নিষ্ঠা সহকারে এই নবীন পদ্ধতি মূর্তকরণের কার্য করছেন। পশুশক্তির উপাসক আমাদের এই যুগে সভ্য সমাজের তাবৎ চিন্তাশীল মানবের উপর তাঁর নৈতিক প্রভাবের স্থায়িত্ব যতটা হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে গান্ধীর প্রভাব তার চেয়ে বহুগুণ অধিক। কারণ দেশ-নায়কগণ ব্যক্তিগত উদাহরণ ও শিক্ষামূলক প্রভাব দ্বারা তাঁদের স্বদেশবাসী জনসাধারণের নৈতিক শক্তির যতটা বিকাশ ও স্থায়িত্ব বিধান করতে পারেন, তাঁদের কাজ ততটা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

এরূপ একজন দেদীপ্যমান মহাপুরুষ ও অনাগত বহু যুগের পথনির্দেশক-আলোক-বর্তিকা-রূপী মহামানবকে ভবিতব্য যে আমাদের মাঝে আমাদের সমসাময়িক সাথী রূপে প্রেরণ করেছে, এর জন্য আমরা অতীব কৃতজ্ঞ এবং নিজেদের পরম সৌভাগ্যবান জ্ঞান করি।

[১৯৩৯]

মহাত্মা গান্ধী

জনগণের নেতা, অথচ কোন বাহ্য কর্তৃত্বের আশ্রয়ী নন। এমন একজন রাজনীতিবিদ্, যাঁর সাফল্য কোন রকম চাতুর্য বা কলাকৌশলের উপর নির্ভরশীল না হয়ে কেবল নিজ ব্যক্তিত্বের যুক্তি ও শক্তির উপর আধারিত। চির-বিজয়ী যোদ্ধা; কিন্তু বলপ্রয়োগ নীতির উপর চিরদিনই বীতশ্রদ্ধ। প্রজ্ঞা এবং বিনয়ের অবতার; অথচ অনমনীয় দৃঢ়তা ও চারিত্রিক সামঞ্জস্যের আকর। স্বদেশবাসীর অভ্যুত্থান এবং উন্নতি বিধানের জন্য তিনি জীবনোৎসর্গ করেছেন। তিনি ইউরোপের পশুশক্তির সম্মুখীন হয়েছেন সাধারণ মানবের মর্যাদাবোধ নিয়ে। এইভাবে উর্ধ্বগামী হয়ে তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতার আসন অলঙ্কৃত করেছেন।

আজ থেকে বহু যুগ পরে লোকে হয়তো এ কথা বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে রক্তমাংসের শরীরধারী এই রকম কেউ কোন কালে এই ধরাতলে বিচরণ করতেন।

[১৯৩৯]

লিও বেক্ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

জীবনের যাত্রাপথে যে মানুষটি সদাই সকলকে সহায়তা দিয়ে চলেছেন, যিনি সর্বদাই নিঃশঙ্ক এবং আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি বা আক্রোশপরায়ণতা যাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, তাঁকে আমার প্রাণের প্রণাম নিবেদন করি। বিশ্বের মহান্ নৈতিক দিক্‌পালবৃন্দ এই উপাদানে নির্মিত এবং তাঁরা মানবসমাজের স্বসৃষ্ট দুঃখ-দুর্দশার দহনজালায় সান্ত্বনার শান্তিজল সিঞ্চন করেন।

জ্ঞান এবং ক্ষমতার সমন্বয় প্রচেষ্টা কদাচিৎ সফল হয়েছে এবং হলেও এ সম্মিলন অত্যন্ত স্বল্পমেয়াদী প্রতিপন্ন হয়েছে।

নিজের শত্রু না হলে মানুষ সাধারণতঃ কারও প্রতি চাতুর্যের অপবাদ আরোপ করে না।

মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তিই নিরাসক্ত ভাবে নিজ সামাজিক পরিবেশের সংস্কারবিরুদ্ধ অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। অধিকাংশ মানুষের মনে এ-জাতীয় অভিমতের উদ্রেক পর্যন্ত হয় না।

অধিকাংশ মূর্খই দুর্জয় হয় এবং সকল যুগে তাদেরই জয়জয়কার। তবে তাদের চিত্তবৃত্তির অসামঞ্জস্যের দরুন তাদের উৎপীড়নের আতঙ্ক কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

গড্ডলিকা-প্রবাহের অপাপবিদ্ধ সদস্য হবার জন্য সর্বোপরি গড্ডল তো হতেই হবে।

একই নরকঙ্কালের ভিতর স্থায়িভাবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিতে যে-পরিমাণ বৈসাদৃশ্য এবং স্ববিরোধ পাশাপাশি বাস করে, তাতে রাজনৈতিক আশাবাদ এবং নিরাশাবাদের সর্ববিধ তত্ত্ব মায়াময় বলে মনে হয়।

সত্য এবং জ্ঞানের রাজ্যে যে-ই নিজেকে বিচারক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে যায়, মহামহিম ব্যক্তিদের বিদ্রূপ-হাস্যের ঘূর্ণিপাকে তার ভরাডুবি হয়।

নিরীক্ষা এবং অপরের মর্ম গ্রহণ করার মধ্যে আনন্দ পাবার ক্ষমতা প্রকৃতির অতীব মনোহর অবদান।

[১৯৫৩]

মহাত্মার পথেই মানবমুক্তি

মানব জাতির উন্নততর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগ্রহান্বিত প্রতিটি ব্যক্তিই নিশ্চয় মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যুর ফলে গভীর ভাবে অভিভূত হয়েছেন। তিনি তাঁর নিজের মহৎ ধ্যেয় অহিংসার আদর্শের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। স্বদেশের সর্বব্যাপী বিক্ষোভ ও গোলযোগের সময় সশস্ত্র প্রতিরক্ষার শরণ নিতে অস্বীকার করার কারণে তাঁর প্রাণ গেছে। তাঁর হৃদয়ে এই বিশ্বাস অনড় হয়ে বসে গিয়েছিল যে, অস্ত্রের শরণ নেওয়া স্বতঃই এক পাপকার্য এবং তাই যাঁরা এই বিশ্বাসের প্রতি পূর্ণতঃ আনুগত্য-প্রকাশ-প্রয়াসী, তাঁদের শস্ত্র-সহায়তায় আত্মরক্ষার পরিকল্পনা পরিহার করতেই হবে। হৃদয় এবং অন্তরে এই বিশ্বাসের আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করে তিনি এক মহান্ জাতিকে তার মুক্তি-পথ-যাত্রায় পরিচালনা করেছিলেন।

তিনি এই কথা সপ্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে, রাজনৈতিক কলাকৌশল ও চতুরতার চিরাচরিত কুটিল পথই শক্তিশালী গণ-সমর্থন অর্জন করার একমাত্র মাধ্যম

নয়, মহত্তর নৈতিক জীবনাচরণের শক্তিশালী উদাহরণ দ্বারাও এ অভীষ্টের পরিপূর্তি সম্ভব।

দেশে দেশে মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্যোপলব্ধির মূলাধার এই সত্যের স্বীকৃতি-নির্ভর (এবং এ স্বীকৃতিও আবার মূলতঃ অচেতন ভাবে) যে, এ যুগে সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের এই চূড়ান্ত সংকট-লগ্নে তিনিই ছিলেন রাজনীতির ক্ষেত্রে উন্নততর মানবীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাভিলাষী একমাত্র ও অদ্বিতীয় জননায়ক। গান্ধীজীর এই আদর্শে উপনীত হবার জন্য আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগে প্রয়াস করতে হবে। আমাদের এই দুরূহ পাঠ গ্রহণ করতে হবে যে, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রেরক শক্তি হবে আইন-কানুন ও ন্যায়বিচার। এ যাবৎ বিশেষ এক আত্মগরিমাস্ফীত ও ধর্মাভিমানী রাষ্ট্রের খামখেয়ালীতে চলার যে প্রথা পৃথিবীতে চলে আসছে, তা পরিহার করতে হবে এবং তা হলেই কেবল মানবজাতির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলা চলবে।

[১৯৪৮]

রাজনীতি, রাষ্ট্র ও শান্তিবাদ

বিদায়

(লীগ অব নেশনসের জার্মান সম্পাদকের নিকট লিখিত পত্র)

আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্রের উত্তর দিতেই হবে ; নচেৎ আমার আচরণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির অবকাশ থেকে যাবে। নিম্নলিখিত কারণের জন্য আমি আর জেনেভায় যেতে চাই না : দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, সমগ্রভাবে দেখতে গেলে কমিশন আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের উন্নতিবিধানকল্পে কোনরকম গুরুতর প্রচেষ্টা করার জন্য আগ্রহান্বিত নয়। কমিশনকে আমার বরং "ভীষণদর্শন ও বন্য"—এই আপ্তবাক্যের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ মনে হয়। এই দিক থেকে কমিশন সমগ্রভাবে লীগের চেয়েও খারাপ।

সত্যি কথা বলতে কি, সর্বশক্তি নিয়োগে আমি রাষ্ট্রশক্তির উর্ধ্বে বিরাজিত আন্তর্জাতিক সালিশী ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে চাই এবং এই বাসনা উদগ্রভাবে আমার হৃদয়ে ক্রিয়াশীল হবার দরুন আমি কমিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রবল তাগিদ বোধ করছি।

কোন দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র সূত্ররূপে প্রত্যেক দেশে একটি করে জাতীয় কমিশন গঠন করে আমাদের কমিশন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অনুষ্ঠিত উৎপীড়নকে প্রকারান্তরে সমর্থন জানিয়েছে। এইভাবে কমিশন সজ্ঞানে সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় সংখ্যালঘুদের সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করার কর্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদমূলক ও জঙ্গী ধাঁচের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে কমিশনের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে তা এমনই মৃদু যে, এই রকমের এক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশনের কাছ থেকে কোনরকম ক্রিয়াত্মক প্রচেষ্টা আশা করা যায় না।

যে সব ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক সংহতির সপক্ষে ও রণলিপ্সু ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য নিজেদের নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিয়েছে, কমিশন নিঃসন্দেহে তাদের নৈতিক সহায়তা দানের ব্যাপারে কর্তব্যচ্যুত হয়েছে।

যে মনোভাবকে প্রোৎসাহিত করা কমিশনের কর্তব্য তার বিরুদ্ধে আচরণকারী-দের সদস্যরূপে নিয়োগকার্যকে কমিশন কখনও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেনি।

[১৯২৩]

বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতার সঙ্ঘ

সম্প্রতি ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক নেতৃবর্গ প্রথমবার এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে, ভূমণ্ডলের এই অংশে সমৃদ্ধি পুনঃপ্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হচ্ছে সনাতন রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্বের অবসান। ইউরোপকে একটি রাজনৈতিক একম্ করার প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে হবে। এবং এখনকার শুল্ক-প্রাচীরগুলি ভেঙে ফেলার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করতে হবে। শুধু রাজনৈতিক চুক্তি দ্বারা এ মহান্ লক্ষ্যের পরিপূর্তি সম্ভবপর নয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, জনসাধারণের মন এর জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। ধীরে ধীরে তাদের ভিতর এমন একটা সংহতির ভাব জাগাবার চেষ্টা করতে হবে, যা পূর্বের মত রাষ্ট্রীয় সীমান্তে এসে নিষ্ক্রিয় হয়ে না যায়। কাজটা কঠিন বটে। কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, আমি অন্ততঃ যে সব দেশের সঙ্গে অতীব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, সেখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তুলনায় শিল্পী-সমাজ এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা অধিক মাত্রায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত।

ইতঃপূর্বে এই কমিশন (লীগ অফ নেশনস্ কর্তৃক স্থাপিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধিক সহযোগিতা সঙ্ঘ) বৎসরে দুইবার মিলিত হয়েছে। এর প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য ফরাসী সরকার বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করতে মনস্থ করেছেন এবং শীঘ্রই এর উদ্বোধন হবে। এটা ফরাসী জাতির একটা ভাল কাজের মধ্যে গণ্য হবে এবং এর জন্য তাঁরা সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

[১৯২৬ ?]

শান্তি

বিগত কালের যথার্থ মহামানবেরা আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এ যুগের যান্ত্রিক প্রগতি এই স্বতঃসিদ্ধ নৈতিক সিদ্ধান্তকে বর্তমান সভ্যতা ও মানবসমাজের জীবন-মরণের ব্যাপার করে তুলেছে এবং শান্তির সমস্যাবলীর সমাধান কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা বিবেকশীল মনুষ্যের কাছে আজ এক অপরিহার্য নৈতিক কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

আমাদের এ কথা বুঝতে হবে যে, মারণাস্ত্র উৎপাদনে নিযুক্ত শক্তিশালী বণিক্গোষ্ঠী আজ প্রত্যেক দেশে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের শান্তিময় সমাধানের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছে। আমাদের আরও বুঝতে হবে যে, কেবল অধিকাংশ দেশবাসীর প্রবল সমর্থনই শাসকবর্গকে সকল সমস্যার শান্তিময় সমাধানরূপী মহান্ লক্ষ্য পরিপূর্তির উপযুক্ত আশ্বাস দিতে পারে। প্রত্যেক

ব্যক্তিকে স্মরণ রাখতে হবে যে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার যুগে প্রত্যেক জাতির ভাগ্যসূত্র তাদের নিজেদের উপরই নির্ভর করছে।

[১৯৩০]

ছাত্রদের নিঃশস্ত্রীকরণ সভার ভাষণ

পূর্বসূরীদের কাছ থেকে অতিমাত্রায় উন্নত বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বহুমূল্য অবদান আমরা পেয়েছি। অন্য যে কোন যুগাপেক্ষা আমাদের জীবনকে অধিকতর মুক্ত ও সুন্দর করার সম্ভাবনা এতে নিহিত আছে। অথচ এই অবদান আবার আমাদের অস্তিত্বের পক্ষে এমন প্রচণ্ড সংকট সৃষ্টি করেছে, যার তুলনা অতীত ইতিহাসে বিরল।

সভ্য মানবসমাজের ভাগ্য আজ যে কোন যুগের তুলনায় অধিক মাত্রায় নৈতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের পূর্বপুরুষদের যে ধরনের কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়েছিল, এ যুগের দায়িত্ব কোনমতেই তার চেয়ে সহজ নয়।

পৃথিবীবাসীর প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ পূর্বের তুলনায় অতীব অল্প সময়ের শ্রমে উৎপন্ন করা সম্ভব। কিন্তু এর ফলে শ্রমবিভাজন এবং উৎপন্ন পণ্য বণ্টন সমস্যা অধিকতর দুরূহ হয়েছে। আমরা সকলেই উপলব্ধি করছি যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবাধ অধিকার এবং সম্পদ্ ও ক্ষমতার জন্য ব্যক্তিবিশেষের অনিয়ন্ত্রিত ও অসংযত অভিযান স্বতঃই এ সমস্যার মোটামুটি সমাধানটুকুও করতে আর সক্ষম নয়। বহুমূল্য উৎপাদিকা শক্তি যাতে বৃথা না যায় এবং জনগণের একটি অংশ যাতে দরিদ্র হতে হতে ক্রীতদাসের পর্যায়ে নেমে না পড়ে, তার জন্য উৎপাদন, শ্রম ও বণ্টন কার্যকে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। অনিয়ন্ত্রিত স্বার্থবুদ্ধি যদি আর্থিক ক্ষেত্রেই সর্বনাশা পরিণতি টেনে আনে, তা হলে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এ আরও কত ভয়াবহ ফল প্রসব করবে। যুদ্ধের যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রগতি এমন এক অশুভ আবিষ্কার যে, অনতিবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার উপায় আবিষ্কার করতে না পারলে ধরাতলে মানবজীবনের অস্তিত্ব অসহনীয় হয়ে উঠবে। ইতঃপূর্বে এ কার্য সাধনের জন্য অত্যন্ত সামান্য প্রচেষ্টা হয়েছে ; অথচ এর গুরুত্ব কী অসীম!

মারণাস্ত্রের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও যুদ্ধ পরিচালনার কিছু বিধিনিষেধ রচনা দ্বারা মানুষ যুদ্ধের ভয়াবহতা হ্রাস করতে চায়। কিন্তু যুদ্ধ তো আর খেলা নয় যে এর খেলোয়াড়রা মনে প্রাণে খেলার নিয়ম মেনে চলবে। যেখানে জীবন-মরণ নিয়ে প্রশ্ন, সেখানে নিয়ম বা প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব কোথায় ভেসে যায়। কোন রকম ফল পেতে হলে যাবতীয় যুদ্ধ-বিগ্রহকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। নিছক আন্তর্জাতিক সালিশী আদালতে কাজ হবে না। বিভিন্ন জাতির ভিতর এই মর্মে চুক্তি হওয়া দরকার

যে, ওই আদালতের সিদ্ধান্ত সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় কার্যান্বিত করা হবে। এই-জাতীয় ভরসা ছাড়া সত্যকার নিঃশস্ত্রীকরণের জন্য বিভিন্ন জাতির মনে কখনই সাহস হবে না।

ধরুন, সম্পূর্ণ আর্থিক বয়কটের ভয় দেখিয়ে আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী ও ফ্রান্স জাপান সরকারকে চীনে তাদের জঙ্গী ক্রিয়াকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য চাপ দিল। এর পরও কি আপনারা ভাবেন যে কোন জাপানী মন্ত্রিমণ্ডল নিজ দেশকে এবংবিধ মারাত্মক অবস্থায় জড়িত করার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হবে? তা হলে এ রকম করা হয় না কেন? প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতিকে কেন আত্মাবলুপ্তির ভয়ে কম্পমান হতে হবে? কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক সুবিধা নিয়েই মত্ত; সমগ্র সম্প্রদায়ের মঙ্গলের কাছে এই ক্ষুদ্র স্বার্থকে কেউ বলি দিতে রাজী নয়।

সেইজন্য প্রথমেই আমি এ কথা বলেছি যে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ আজ পূর্বতন সকল যুগ অপেক্ষা অধিক মাত্রায় নৈতিক বলের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি ক্ষেত্রে ত্যাগ ও আত্মসংযম দ্বারাই শুধু আনন্দময় ও সুখী জীবনের স্বাদ পাওয়া সম্ভব।

এ প্রক্রিয়ার শক্তির উৎস কি? অধ্যয়নের সহায়তায় যাদের মন প্রস্তুত ও দৃষ্টি সম্প্রসারিত, তারাই শুধু এ কাজ পারবে। তাই আমরা সেকেলের দল তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছি এবং এই আশা পোষণ করছি যে, আমাদের ভাগ্যে যা জুটল না তা পাবার জন্য তোমরা সকল শক্তিপ্রয়োগে প্রযত্ন করবে।

[১৯৩০]

১৯৩২ সনের নিঃশস্ত্রীকরণ সম্মেলন

রাজনৈতিক বিশ্বাসের একটি সূত্রের উল্লেখ করে আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করতে চাই। এ হল: রাষ্ট্র মানুষের জন্য, মানুষ রাষ্ট্রের জন্য নয়। এই দিক থেকে বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র সমপর্যায়ভুক্ত। এ সব পুরনো প্রবাদ, এগুলি সেই সব মানুষের দ্বারা রচিত যাদের কাছে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ হল শ্রেষ্ঠ মানবকল্যাণ। আমি এ সব কথার পুনরুক্তি করতাম না যদি-না অধুনা, বিশেষতঃ এ কালের এই কঠোর প্রতিষ্ঠান-ধর্মী ও যান্ত্রিক প্রভাবের দিনে ব্যক্তি-সত্তার মর্যাদাকে চিরকালের জন্য বিস্মৃত হবার এক আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করতাম। আমার মতে রাষ্ট্রের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে ব্যক্তি-সত্তার রক্ষণাবেক্ষণ করা ও তাকে সৃষ্টিশীল ব্যক্তি রূপে বিকশিত হবার সুযোগ দেওয়া।

অর্থাৎ রাষ্ট্র আমাদের দাস হবে, আমরা রাষ্ট্রের ভৃত্য হব না। রাষ্ট্র যখন বলপ্রয়োগে আমাদের সামরিক কার্যে যোগ দিতে বাধ্য করে ও যুদ্ধ পরিচালনায়

নিযুক্ত করে, তখন রাষ্ট্র এই বিধান ভঙ্গ করে। বিশেষতঃ এই-জাতীয় দাসত্বমূলক কাজের উদ্দেশ্য ও পরিণাম হচ্ছে অপরাপর দেশের অধিবাসীদের হত্যা করা অথবা তাদের বিকাশের স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করা। রাষ্ট্রের বেদীমূলে মাত্র ততটুকু আত্মোৎসর্গই করা যেতে পারে, যা মানুষের স্বাধীন বিকাশের জন্য প্রয়োজন।

এবার নিঃশস্ত্রীকরণ সম্মেলন প্রসঙ্গে আসা যাক। এর কথা ভেবে লোকে হাসবে না কাঁদবে? এর কাছে আশা করার কিছু আছে কি? ধরুন কোন শহরের অধিবাসী সকলেই কোপনস্বভাব, অসৎ এবং কলহপ্রিয়। বেঁচে থাকাটাই সেখানে এক নিরন্তর বিপদের বিষয় এবং এই গুরুতর বাধার জন্য যাবতীয় সুসংগত বিকাশের পথ সেখানে অবরুদ্ধ। নগর-প্রধানের ইচ্ছা যে, এই শোচনীয় দশার অবসান হোক। কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি উপদেষ্টা ও সেখানকার নাগরিকরা তাদের কোমরে একটি করে ছোরা রাখার ব্যবস্থা বজায় রাখতে সমুৎসুক। বহু বৎসরের বাহ্বাস্ফোটের পর অবশেষে নগরপাল একটা আপস-নিষ্পত্তির কথা ঘোষণা করেন। প্রত্যেককে নিজ নিজ কোমরে যে ছোরা ঝুলিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেওয়া হবে, তার দৈর্ঘ্য এবং তীক্ষ্ণতার মান সম্বন্ধে তিনি একটা ফতোয়া জারী করেন। চতুর নাগরিকরা যতদিন আইন, আদালত এবং পুলিসের সহায়তায় ছুরী চালানো নিষিদ্ধ না করেন, ততদিন নিঃসন্দেহে যথাপূর্বং অবস্থা চলবে। ছুরিকার দৈর্ঘ্য এবং তীক্ষ্ণতার ভাষ্য শুধু সবল ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেদের সাহায্য করবে, বাদবাকী সকলকে তাদের করুণার উপর নির্ভর করতে হবে।

এই নীতিকথার অর্থ নিশ্চয় আপনারা বুঝছেন। এ কথা সত্য যে, আমাদের লীগ অফ নেশনস্ এবং তার সালিশী-আদালত আছে। কিন্তু লীগের ক্ষমতা একটি সভাগৃহের চেয়ে বেশী নয় এবং সালিশী-আদালত তার নির্দেশ পালন করাতে অক্ষম। কোন দেশ আক্রান্ত হলে এ সব প্রতিষ্ঠান তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অপারগ।

প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন ভাবে সালিশী-আদালতের নির্দেশ অমান্যকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে যতদিন না আমরা নিজেদের সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে সম্মত হচ্ছি, ততদিন কোন একক রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট অরাজকতা ও সন্ত্রাস-বাদের হাত থেকে নিস্তার নেই। কেবল হাত তোলার ক্ষমতার জাদুমন্ত্রবলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবাধ সার্বভৌমত্ব কখনও আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তায় পরিণত হতে পারে না। সর্বজনস্বীকৃত আন্তর্জাতিক আদালতের প্রত্যেকটি রায়কে কার্যকরী করার প্রেরণা জাগাবার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভাগ্যগগনে আবার নূতন কোন সর্বনাশের ঝঞ্ঝাবাত্যার আবির্ভাব প্রয়োজন কি না, কে জানে? ঘটনা-প্রবাহ দৃষ্টে অতীত অপেক্ষা অদূর ভবিষ্যৎ যে বিশেষ ভাল হবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু সভ্যতার ভবিষ্যৎ ও ন্যায়বিচারের জন্য যাঁরা তিলমাত্র চিন্তা

করেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সকল শক্তি প্রয়োগে নিজ বন্ধুবান্ধবদের এই কথা বোঝানো যে, আমাদের বাঁচার পথ হচ্ছে এই-জাতীয় আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের কাছে সকল জাতির অবাধ সার্বভৌমত্বের আংশিক বিসর্জন মেনে নেওয়া।

উপরি-উক্ত ধারণার বিরুদ্ধে এই কথা বলা হবে যে, এতে বিধিবদ্ধ তন্ত্রের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে এর মনোবৈজ্ঞানিক বা নৈতিক দিকের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে। এ-জাতীয় অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অনেকের মতে বস্তুগত নিঃশস্ত্রীকরণের পূর্বে নৈতিক নিঃশস্ত্রীকরণ হওয়া উচিত। তাঁরা আরও বলেন যে (এবং একথাও সত্য), আন্তর্জাতিক সমাজ-ব্যবস্থা রচনার পথে সর্ববৃহৎ বাধা হচ্ছে অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদের মনোভাব। একে আবার "স্বদেশপ্রেম" এই মিথ্যা অথচ শ্রুতিমধুর আখ্যায়ও আখ্যাত করা হয়। বিগত দেড় শতাব্দী কাল যাবৎ এই অপদেবতা সর্বত্র এক বীভৎস প্রলয়ঙ্কর শক্তি ধারণ করেছে।

এই-জাতীয় আপত্তির সত্যকার মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের বুঝতে হবে যে, বাহ্য তন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ মানসিক স্থিতির ভিতর এক **অবিচ্ছেদ্য** সম্পর্ক বিদ্যমান। বাহ্য তন্ত্র শুধু সনাতন বিচারধারার উপর নির্ভরশীল নয় বা কেবল পূর্বপ্রচলিত মূল্যবোধের থেকে এর সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে সমসাময়িক কালে প্রচলিত তন্ত্র জাতীয় চিন্তাধারা গঠনে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

আমার মতে এ কালে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মনোবৃত্তির শোচনীয় রকমের পরিব্যাপ্তির পিছনে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি বা এর অপেক্ষাকৃত কম কটু নাম —"জাতীয় সৈন্যবাহিনীর" অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। যে রাষ্ট্র নিজ প্রজাপুঞ্জের কাছে সামরিক সেবা দাবি করে, তাকে বাধ্য হয়ে স্বদেশবাসীর ভিতর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মনোভাবকে প্রোৎসাহিত করতে হবে। কারণ এই মনোভাব হচ্ছে সামরিক কুশলতার মনোবৈজ্ঞানিক আধার-শিলা। এই ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রকে তার পশুশক্তির তন্ত্রকে যুবশক্তির উপাস্য রূপে বিদ্যালয়সমূহে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে ধরতে হয়।

এই জন্য আমার বিশ্বাস যে, শ্বেতকায় জাতিসমূহের নৈতিক সর্বনাশের মূল কারণ হচ্ছে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি। এ শুধু আমাদের সভ্যতার পক্ষেই আতঙ্কের কারণ নয়, একেবারে আমাদের অস্তিত্বের গোড়ায় আঘাত হানছে এ বৃত্তি। ফরাসী বিপ্লবের কাছ থেকে বহু মহান্ সামাজিক ন্যায়বিচার রূপ আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে ওই অভিশাপও আমরা পেয়েছি এবং প্রথমে ফ্রান্সে এর সূত্রপাত হলেও অচিরাৎ অন্যান্য জাতিও এই মিছিলে যোগ দেয়।

সুতরাং যারা আন্তর্জাতিক মৈত্রীভাবের সম্প্রসারণ ও আক্রমণাত্মক স্বাজাত্যাভি-

মানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চান, তাঁদের বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সজ্ঞানে সামরিক বৃত্তির প্রতিরোধকারীদের আজ যে ভীষণ নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছে, তা কি আমাদের সমাজের পক্ষে পূর্বকালের ধর্মীয় হুতাত্মাদের উৎপীড়ন করার লজ্জার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম কলঙ্কজনক? "কেলগ" চুক্তির মত যুদ্ধকে নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা কি ব্যক্তি-মানবকে প্রত্যেক দেশের যুদ্ধযন্ত্রের করুণার উপর সঁপে দিতে পারেন?

নিঃশস্ত্রীকরণ সম্মেলনের মতে শুধু এর সংগঠনগত সমস্যার খুঁটিনাটির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যদি আমাদের শিক্ষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে এর মনোবৈজ্ঞানিক দিকেও হাত দিতে হয়, তা হলে আমাদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন বৈধানিক উপায় আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে যে-কোন ব্যক্তি সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতে অস্বীকার করতে পারে। এই-জাতীয় বিধান নিঃসন্দেহে বিরাট্ নৈতিক শক্তি সৃষ্টি করবে।

আমার অবস্থা সংক্ষেপে নিম্নরূপ : শুধু রণসম্ভার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের চুক্তি কোন রকম নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি করতে পারে না। বাধ্যতামূলক সালিশী ব্যবস্থার পোষকতা করবে এক প্রশাসনিক শক্তি। এই শক্তি শান্তিভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আর্থিক এবং সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রস্তুত থাকবে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের স্তম্ভস্বরূপ বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। সর্বোপরি সজ্ঞানে সামরিক বৃত্তির প্রতিরোধকারীদের আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে রক্ষা করতে হবে।

২

বিগত একশত বৎসরে মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভা আমাদের যে সব সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে তার ফলে জীবন সুখী ও ভাবনা-চিন্তা-মুক্ত হতে পারত। কিন্তু সামাজিক সংগঠন যন্ত্রকৌশলের প্রগতির সঙ্গে সমান তালে চলতে না পারায় এ আশা পূর্ণ হয়নি। আজকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমাদের কালের হাতে এই সব বহু আয়াসলব্ধ অবদান তিন বৎসর বয়স্ক শিশুর হাতে শাণিত ছুরিকার ন্যায়। উৎপাদনের চমৎকার সাধন মানব-স্বাধীনতার সার্থক রূপায়ণের পরিবর্তে দুশ্চিন্তা ও বুভুক্ষার কারণ হয়েছে।

যন্ত্রকৌশলের প্রগতির সর্বাধিক বীভৎস রূপ দেখা যায় সেইখানে, যেখানে এ মানবজীবন ও মানুষের বহু শ্রমে অর্জিত ফল ধ্বংস করার সাধন হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমরা প্রবীণবয়সীরা এই সর্বনাশা অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছি। যুদ্ধের ফলে ব্যক্তি-সত্তাকে যে হীন দাসত্বের শিকার হতে হয়, আমার মতে তা যুদ্ধের ধ্বংসলীলার চেয়েও ভয়ানক। প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে যাকে ঘৃণ্য অপরাধ

বলে মনে করে, সমাজের চাপে পড়ে তা করতে বাধ্য হওয়া কি ভীষণ ব্যাপার নয়? মাত্র স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তির ভিতর এর প্রতিরোধ করার মত নৈতিক মহত্ত্ব দেখা গিয়েছিল এবং তাঁদের আমি প্রথম মহাযুদ্ধের সত্যকার বীর বলে মনে করি।

মাত্র একটি আশার আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি যে, বিভিন্ন জাতির অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে যুদ্ধবিরোধী। পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত ব্যাধির ন্যায় শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যশীল জাতীয় ঐতিহ্যসমূহ অগ্রগতির পথে এই বহুবাঞ্ছিত পদক্ষেপের বিরোধিতা করে। এই ঐতিহ্যের মুখ্য বাহন হচ্ছে সামরিক শিক্ষা ও তার জয়গান এবং এর আর এক সাকরেদ হচ্ছে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প ও সেনাবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র। নিরস্ত্রীকরণ ব্যতিরেকে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তুল্যভাবে বর্তমান কালের আকারে সামরিক প্রস্তুতি চলতে থাকলে অবশ্যই নূতন বিপদের সূত্রপাত হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র-তরণীর কর্ণধারদের পিছনে যদি সে দেশের অধিবাসীদের বেশ মোটা রকম অংশের সমর্থন থাকে, তা হলেই শুধু এই মহান্ উদ্দেশ্যের সিদ্ধি সম্ভবপর। তাই এই-জাতীয় জনমত সৃষ্টির জন্য আমাদের প্রত্যেকের কথায় ও কাজে সহযোগিতা করা উচিত।

এবংবিধ মহান্ কার্যে সফলতার জন্য ধূর্ততা তো দূরের কথা, চতুরতাও সহায়ক হয় না। এর জন্য প্রয়োজন সততা ও বিশ্বাস। সৌভাগ্যক্রমে তর্ক দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধের স্থান পূরণ করা যায় না। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নিয়ে কেবল সমালোচনা করলে এ কাজ নিষ্পন্ন হবার নয়। সর্বশক্তি প্রয়োগে আমাদের এ আদর্শের সেবা করতে হবে। পৃথিবী যেমনটি চাইবে, তার ভাগ্য তেমনই হবে।

আমেরিকা ও নিঃশস্ত্রীকরণ সম্মেলন

আমেরিকাবাসীরা আজ নিজ দেশের আর্থিক বিপর্যয়ের জন্য উদ্বিগ্ন। মূলতঃ স্বদেশের ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানের প্রতি তাঁদের দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের মনোযোগ নিবদ্ধ। বিশ্বের অন্যান্য অংশের সঙ্গে, বিশেষতঃ মূল মাতৃভূমি ইউরোপের সঙ্গে, তাঁদের অদৃষ্ট যে একই সূত্রে গ্রথিত, এ ভাবনা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে আজ ক্ষীণ।

কিন্তু অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের অবাধ সঞ্চরণ অবলীলাক্রমে এই সব অসুবিধার নিরাকরণ করবে না। মানবসমাজের ভিতর শ্রম ও ভোগ্যোপকরণের সুষম বণ্টনের জন্য সমাজের তরফ থেকে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা চাই। এতদ্ব্যতিরেকে সর্বাপেক্ষা শ্রীসম্পন্ন

দেশেরও শ্বাস রুদ্ধ হবে। ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যন্ত্রকৌশলের প্রগতির ফলে সকলের প্রয়োজন মেটাবার মত উপকরণ সৃষ্টির কার্যে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রম লাগে বলে আর্থিক শক্তিসমূহের অবাধ সঞ্চরণের ফলে আর এমন অবস্থা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই যাতে বিশ্বের সমগ্র শ্রমসম্পদকে কর্মে নিয়োগ করা যেতে পারে। যন্ত্রকৌশলের উন্নতির ফলাফল যাতে সকলের নিকট আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিতে পারে তার জন্য এর সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় অনুভূত হচ্ছে।

বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যদি আর্থিক অবস্থার জটিলতা দূর করা সম্ভব না হয়, তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য এ-জাতীয় নিয়ন্ত্রণ আরও কত বেশী প্রয়োজন। কিছু লোক এখনও এই বিশ্বাস আঁকড়ে আছে যে, যুদ্ধরূপী হিংসাবৃত্তি মানবসমাজের পক্ষে হয় লাভদায়ক অথবা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য মানবজাতি কর্তৃক বরণযোগ্য উপায়। কিন্তু যুদ্ধের ন্যায় বর্বর যুগের এই বীভৎস ও অমানুষিক প্রথার নিরাকরণের জন্য যখন অমিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, তখন আর তাঁদের যুক্তিবাদের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সমস্যাটিকে স্পষ্টভাবে দেখতে হলে কথঞ্চিৎ চিন্তা-শক্তি প্রয়োজন এবং নিষ্ঠা ও দক্ষতা সহকারে এই মহান্ আদর্শের সেবার জন্য কিয়ৎ পরিমাণ সৎসাহসের দরকার।

সত্যকার শান্তিকামী ব্যক্তিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা ঘোষণা করতে হবে যে, তিনি নিজ দেশের সার্বভৌমত্বের কিয়দংশ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সমর্পণ করার পক্ষপাতী। কোন বিবাদের কারণ ঘটলে তাঁর দেশ যাতে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় মেনে নেয়, তিনি তার জন্য দেশকে প্রস্তুত করবেন। সর্বাঙ্গীণ ও সর্বব্যাপক নিরস্ত্রীকরণের নীতি তাঁকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে হবে। হতভাগ্য ভার্সাই চুক্তিতে সত্যসত্যই এর একটা আভাস ছিল। জঙ্গী এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী শিক্ষার অবসান না ঘটা পর্যন্ত প্রগতির ভরসা নেই।

এ যাবৎ অনুষ্ঠিত যাবতীয় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতা সভ্য সমাজের কাছে বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর সর্বাধিক লজ্জাজনক ঘটনা। অসাধু রাজনৈতিক নেতার গোপন উচ্চাশার জন্যই যে এ ব্যর্থতা তা নয়, এর জন্য প্রত্যেকটি দেশের জনসাধারণের শৈথিল্য আর ঔদাসীন্যও দায়ী। এ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে বহু প্রযত্নে অর্জিত আমাদের পূর্বপুরুষদের সত্যকার গুণ ও আবিষ্কারের সুফল আমরা ধ্বংস করব।

[১৯৩২]

বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি

জার্মানীকে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্তনের অধিকার দেবার পরিবর্তে প্রত্যেকের নিকট থেকে এ অধিকার হরণ করা উচিত। ভবিষ্যতে পেশাদার

সৈন্যবাহিনী ছাড়া আর কিছু রাখতে দেওয়া হবে না এবং এর আয়তন ও রণসজ্জার প্রকারভেদ জেনেভায় আলোচিত হবে। জার্মানীকে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্তনের অনুমতি দেবার চেয়ে এতে ফ্রান্সের অধিকতর মঙ্গল হবে। এইভাবে সামরিক শিক্ষার মারাত্মক মানসিক প্রতিক্রিয়া ও তজ্জনিত ব্যক্তির অধিকার-সংকোচন পর্বের হাত এড়ানো যাবে।

এ ছাড়া বাধ্যতামূলক সালিশী ব্যবস্থা দ্বারা পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ নিরাকরণে সম্মত দুইটি দেশের পক্ষে নিজেদের পেশাদার সৈন্যবাহিনীকে সম্মিলিত করে তাকে মিলিত পরিচালন ব্যবস্থার অধীন করা খুবই সহজসাধ্য হবে। এর পরিণামে অর্থের সাশ্রয় হবে এবং নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেও উভয় রাষ্ট্র লাভবান হবে। সম্মিলিতকরণের এই প্রক্রিয়া ক্রমশঃ বিশালতর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্তি লাভ করতে করতে শেষ পর্যন্ত "আন্তর্জাতিক পুলিস বাহিনীর" সৃষ্টি হতে পারে এবং ক্রমে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ভাব বৃদ্ধি পেলে এ-ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে।

কাজ শুরু করে দেবার জন্য আপনি কি এ প্রস্তাব নিয়ে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন? আমি অবশ্য এই বিশেষ প্রস্তাবটির উপর মোটেই জোর দিচ্ছি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যে-কোন সুনিশ্চিত কর্মসূচী নিয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। নিছক নেতিবাচক কর্মধারা কোন প্রত্যক্ষ ফল প্রসব করবে না।

[১৯৩৪]

শান্তিবাদের প্রশ্ন

অস্ত্রসজ্জাকরণের এবং আমাদের শাসকবর্গের যুদ্ধবাজ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম পরিহার করার পিছনে যে বিন্দুমাত্র যৌক্তিকতা নেই তা বিগত কয়েক বৎসরের ঘটনাপ্রবাহ আর একবার চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে। পক্ষান্তরে বহুল সংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত বিশাল প্রতিষ্ঠান হলেই যে আমরা লক্ষ্যের খুব সন্নিকটে উপনীত হব, এমন কথা নয়। আমার মতে এ অবস্থায় সজ্ঞানে যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আয়ুধ। এই-জাতীয় বীর অসহযোগীদের নৈতিক ও ভৌতিক সহায়তা দানের জন্য প্রত্যেক দেশে সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এইভাবে আমরা শান্তিবাদের প্রশ্নকে জীবন্ত করে তুলতে পারি এবং তাকে উৎসাহী ও উদ্যমশীল ব্যক্তিদের আকর্ষণকারী সত্যকার এক সংগ্রামের রূপদানে সমর্থ হতে পারি। এ সংগ্রাম বেআইনী হবে নিশ্চয়; কিন্তু এ হবে শাসক শক্তির বিরুদ্ধে যথার্থ গণ-অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। সরকার নাগরিকদের দিয়ে ঘৃণ্য অপরাধমূলক কাজ করিয়ে নিতে চাইলে এইভাবে তার প্রতিরোধ করতে হবে।

এই ষোল-আনা শান্তিবাদ অনেক খাঁটী শান্তিবাদী বলে পরিচয়দানকারী ব্যক্তিদের কাছে দেশপ্রেমিকতার কারণে গ্রহণের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। বিশ্বযুদ্ধ ভালভাবেই এ কথা প্রমাণ করেছে যে, সংকটকালে এ-জাতীয় লোকের উপর ভরসা করা চলতে পারে না।

[১৯৩৪]

নিঃশস্ত্রীকরণের প্রশ্ন

নিঃশস্ত্রীকরণের পথে সর্ববৃহৎ অন্তরায় হচ্ছে এই যে, জনসাধারণ সাধারণতঃ এ সমস্যার মুখ্য অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে সম্যক্‌ভাবে সচেতন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ধাপে ধাপে লক্ষ্যে উপনীত হই। স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এই-জাতীয় একটি উদাহরণ। এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এমন একটি লক্ষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ, যেখানে ধাপে ধাপে পৌছানোর কথা উঠতেই পারে না।

যতদিন যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকবে, বিভিন্ন জাতিগুলি ততদিন পরবর্তী যুদ্ধে বিজয়ী হবার মানসে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে প্রস্তুত থাকার উপর জোর দেবে। সুতরাং দেশের যুবকদের যুদ্ধের ঐতিহ্যে দীক্ষিত করা এবং তাদের ভিতর সংকীর্ণ জাতীয় অহমিকা ও তৎসহ রণলিপ্সু মনোবৃত্তির গুণগানের অভ্যাস সৃষ্টি করার প্রয়াস এড়ানো অসম্ভব হবে। কারণ যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধকালে প্রয়োজনীয় বিধায় পূর্বোক্ত অবস্থার জন্য দেশবাসীর ভিতর এই-জাতীয় মনোবৃত্তি গড়ে তোলা হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ছাড়া গতি নেই। অস্ত্রে সজ্জিত হবার অর্থই হচ্ছে শান্তির জন্য নয়, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ও তার স্বপক্ষে রায় দেওয়া। সুতরাং জনসাধারণ কখনই ধাপে ধাপে নিঃশস্ত্রীকরণের আদর্শে উপনীত হবে না। হয় তারা এক ধাক্কায় নিরস্ত্র হবে, অথবা মোটেই হবে না।

জাতীয় জীবনে এইরূপ সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের পূর্বে অবিসম্বাদিরূপে সুমহান্ নৈতিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন এবং মানুষের ভিতর গভীরভাবে মজ্জাগত সংস্কারের কবল থেকে ইচ্ছাকৃত নিবৃত্তি দরকার। রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক বিবাদের সময় যিনি নিজ দেশের ভাগ্যকে কোন আন্তর্জাতিক সালিশীর হাতে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিতে প্রস্তুত নন এবং কোন রকম রক্ষাকবচ না রেখে যিনি এই মর্মে চুক্তি করতে রাজী নন, তিনি সত্যসত্যই যুদ্ধ এড়াতে চান বলে বলা চলে না। হয় সবটুকু করতে হবে, নচেৎ কিছুই হবে না।

তাই আমাদের পথ বেছে নেবার সময় এসে গেছে। আমরা শান্তির পথ খুঁজে পাব, না, আমাদের সভ্যতার কলঙ্কস্বরূপ পশুশক্তির পুরাতন মার্গেই চলব—তা আমাদের উপরই নির্ভর করছে। এক দিকে ব্যষ্টির স্বাধীনতা ও সমষ্টির নিরাপত্তা

আমাদের হাতছানি দিচ্ছে, অন্য দিকে মানুষের দাসত্ব ও সভ্যতার অবলুপ্তি আমাদের রক্তচক্ষু প্রদর্শন করছে। আমাদের যোগ্যতার অনুপাতে আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

[১৯৩৪]

সক্রিয় শান্তিবাদ

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আজকের শাসকবর্গ বুঝি সত্যসত্যই যথার্থ শান্তি-প্রচেষ্টায় সচেষ্ট। কিন্তু যে রকম অবিরত ধারায় অস্ত্রশস্ত্র স্তূপীকৃত হচ্ছে তা দেখে স্পষ্ট এই কথা বোঝা যায় যে, রাষ্ট্র-ধুরন্ধররা যুদ্ধের প্ররোচনাদানকারী প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না। আমার মতে জনগণ নিজেরাই নিজেদের মুক্তি দিতে পারে। তারা যদি ন্যক্কারজনক সামরিক কার্যের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় তবে নিশ্চিতভাবে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের কথা তাদের ঘোষণা করতে হবে। যতদিন সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন যে-কোন গুরুতর বিবাদের পরিণাম হবে যুদ্ধ। যে শান্তিবাদ বিভিন্ন জাতিকে প্রত্যক্ষ অস্ত্রসজ্জা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা না করে, তার কপালে ক্লৈব্য ছাড়া আর কিছু নেই।

জনসাধারণের বিবেক এবং কাণ্ডজ্ঞান জাগরিত হোক, তারা জাতীয় জীবনের এমন এক নবীন অধ্যায়ে উপনীত হোক, মানুষ যখন অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে যুদ্ধ-বিগ্রহকে তাদের পূর্বপুরুষদের এক মূঢ়তার নিদর্শন মনে করবে।

[১৯৩৪]

পুনরপি

(একটি পত্র থেকে)

আপনার পত্রে যে বিষয়টির উল্লেখ করেছেন, তার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আজ মানবসমাজের সামনে অন্যতম বিপদের কারণ হচ্ছে মারণাস্ত্র উৎপাদনের ব্যবসায়। এই হচ্ছে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের পিছনে সংগোপনে ক্রিয়াশীল অপদেবতা।

এর রাষ্ট্রায়ত্তকরণে হয়তো কিছুটা উপকার হতে পারে। কিন্তু কোন্ কোন্ শ্রমশিল্পকে এর অন্তর্গত করা হবে তা যথাযথ ভাবে নির্ধারণ করা অতীব দুরূহ। বিমানপোত নির্মাণের কি হবে? ধাতব এবং রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন শিল্পের কতখানি অংশ এর আওতায় পড়বে?

অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন এবং মারণাস্ত্রের আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের জন্য লীগ অফ নেশনস্ কয়েক বৎসর যাবৎ প্রভূত পরিশ্রম করেছে। কিন্তু তার ফল যে কি

হয়েছে তা আমাদের সকলের জানা আছে। গত বৎসর জনৈক বিখ্যাত আমেরিকান কূটনীতিজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বয়কট দ্বারা জাপানকে কেন তার আক্রমণাত্মক নীতি থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে না? জবাব পেলাম, "আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সে দেশে প্রবল।" যাঁরা এইজাতীয় জবাব দেন, তাঁরা কি করে জনসাধারণের উপকারে লাগবেন?

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে এ ক্ষেত্রে আমার কথায় কোন কাজ হবে? ভ্রান্ত মায়া এ! যতক্ষণ আমি তাদের পথের বাধা না হই, ততক্ষণই শুধু লোকে আমার তোষামোদ করে। কিন্তু তাদের মর্জির বিরুদ্ধ কোন কিছুর জন্য চেষ্টা করা মাত্র তারা নিজেদের স্বার্থের সমর্থনে পঞ্চমুখে আমার নিন্দা করা শুরু করে এবং কুৎসা রটনার স্রোত বইয়ে দেয়। আশে পাশের অধিকাংশই ভীরুর দল! তারা চটপট গা ঢাকা দেয়। নিজ দেশবাসীর সৎসাহসের পরীক্ষা কোন দিন নিয়েছেন কি? সুশীল সুবোধ বালকদের নীতি হচ্ছে, "যেতে দাও, এসব নিয়ে উচ্চবাচ্য কোরোনা।" আপনি নিশ্চিত জানবেন যে সর্বশক্তি প্রয়োগে আমি আপনার আলোচ্য পন্থায় কাজ করব। তবে যত সহজে কাজ হবে ভাবছেন, ব্যাপার তত সরল নয়।

[১৯৩৪]

এ যুগের উত্তরসাধক

আগেকার মানুষ মানসিক এবং সাংস্কৃতিক প্রগতিকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পূর্বসূরীদের শ্রমের ফল বলে মনে করার সুযোগ পেত এবং ভাবত যে এর পরিণামে তাদের জীবনযাত্রা অধিকতর সহজ ও সুন্দর হবে।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানবসমাজে প্রচলিত এই ঐতিহ্য মানুষের পক্ষে অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ রূপে বজায় রাখতে হলে অমিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কারণ পূর্বে যেখানে সমাজহিতে ব্রতী হবার জন্য মানুষের পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্তিগত অহমিকা থেকে মুক্ত হওয়াই যথেষ্ট ছিল, এখন সেই সঙ্গে জাতীয় ও শ্রেণীগত অহমিকাও জয় করা তার একান্ত প্রয়োজন। এই উচ্চ আদর্শে উপনীত হবার পরই তার পক্ষে মানবসমাজের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করা সম্ভব।

এ যুগের এই অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ প্রয়োজনের মনোভঙ্গী থেকে দেখতে গেলে ক্ষুদ্রকায় রাষ্ট্রসমূহের অবস্থা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল। কারণ রাজনৈতিক এবং আর্থিক উভয় ক্ষেত্রেই পাশব বলের সাহায্যে নিজ অভীষ্ট সাধনের প্রলোভনে লুব্ধ হবার সম্ভাবনা বৃহৎ রাষ্ট্র সমূহের সম্মুখে রয়েছে। হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়মের ভিতর সম্প্রতি যে চুক্তি সাধিত হয়েছে, বিগত কয়েক বৎসরের ইউরোপীয় ঘটনা-

পল্লীর ভিতর তা-ই একমাত্র ভরসার আলোক শিখার মত। এর ফলে আশা করা যেতে পারে যে ছোট ছোট রাষ্ট্রসমূহ নিজ দেশের অমিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এই ভাবে বিশ্বকে ঘৃণিত জঙ্গীবাদের কবল মুক্ত করার কাজে এক মুখ্য অংশ গ্রহণ করবে।

(১৯৩৪)

উৎপাদন এবং কার্য

আমার মনে হয় সকল সমস্যার মূল হচ্ছে শ্রমের বাজারে প্রায় সীমাহীন স্বাধীনতা এবং তৎসহ উংপাদন কৌশলের অসাধারণ প্রগতি। আজ পৃথিবীর যাবতীয় প্রয়োজন পূর্তির জন্য সমগ্র শ্রমশক্তি নিয়োগের প্রয়োজন নেই। এর পরিণাম স্বরূপ বেকারত্ব এবং শ্রমিকদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পায়। উভয় পরিণামই দেশ-বাসীর ক্রয়শক্তি হ্রাস করে এবং এইভাবে সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থা ভীষণ ভাবে পর্যুদস্ত হয়।

আমি জানি যে, উদারনৈতিক অর্থশাস্ত্রীদের মতে শ্রম সংক্ষেপ করার প্রতিটি ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রথমতঃ আমি ও কথা বিশ্বাস করি না। আর যদি ওই অভিমত সত্যও হয়, তা হলে ওই বাবদে সর্বদাই মানবজাতির এক বিরাট্ অংশকে অস্বাভাবিক রকমের নিম্নস্তরে জীবন যাপন করতে হবে।

আমি আপনাদের এই অভিমতের সঙ্গে সহমত যে, তরুণ বয়স্কদের উৎপাদন ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং এটা অত্যন্ত আবশ্যকও বটে। এ ছাড়া বয়োবৃদ্ধদের কয়েক ধরনের কাজ না দেওয়া উচিত। (এগুলিকে আমি "অযোগ্য কার্য" আখ্যা দিয়েছি।) ওই বয়স পর্যন্ত তাঁরা সমাজের জন্য যথেষ্ট উৎপাদনমূলক কাজ করেছেন বলে ওই সব কাজ করার পরিবর্তে তাঁরা একটা বৃত্তি ভোগ করবেন।

আমিও বৃহৎ বৃহৎ নগরীর বিলুপ্তি সাধনের পক্ষপাতী। তবে বৃদ্ধ বা ওই-জাতীয় কোন এক বিশেষ ধরনের নাগরিকদের নিয়ে এক একটি জনপদের পত্তন করার পরিকল্পনার আমি বিরোধী। সত্যি কথা বলতে কি, এর কল্পনাই আমার কাছে বীভৎস মনে হয়।

এ ছাড়া আমার অভিমত হচ্ছে এই যে, উপভোগের অবস্থা বিচার করে কয়েক শ্রেণীর ভোগ্য পণ্যকে স্বর্ণমানের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করে মুদ্রামূল্যের ওঠা-নামা রোধ করতে হবে। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তা হলে মনে পড়ছে যে, কীনস্ বহু পূর্বেই এ প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রথা প্রবর্তিত হলেই বর্তমান আর্থিক অবস্থার তুলনায় কিয়ৎ পরিমাণ "মুদ্রাস্ফীতিতে" সম্মত হতে হবে। অবশ্য এর জন্য এই

বিশ্বাসের পোষকতা থাকা চাই যে, রাষ্ট্র এই-জাতীয় আকস্মিক প্রাপ্তির সদুপযোগ করবে।

আমার মতে আপনাদের পরিকল্পনার দুর্বল দিক হচ্ছে এর মনোবৈজ্ঞানিক অংশ। আপনারা বরং এ দিকটা উপেক্ষাই করেছেন। পুঁজিবাদ শুধু উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রগতি আনেনি, জ্ঞানরাজ্যেরও সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। কিন্তু হায়! জনসাধারণের কল্যাণকামনা বা কর্তব্যবুদ্ধি অপেক্ষা অহমিকা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃত্তি অধিকতর বলশালী। লোকে বলে রাশিয়াতে এক টুকরা সুন্দর রুটী পাওয়া অসম্ভব।......আমি হয়তো রাষ্ট্র এবং সমষ্টিগত উদ্যমের অন্যান্য অবদান সম্বন্ধে অতিমাত্রায় নৈরাশ্যবাদী ; তবে তাদের দ্বারা বিশেষ কিছু হিত সাধন হবে বলে আমি ভরসা করি না। যে কোন কার্য সাধনের পথে আমলাতন্ত্র মারক তুল্য। সুইজারল্যাণ্ডের মত অপেক্ষাকৃত আদর্শ রাষ্ট্রেও আমাকে বহু দুর্ভোগ দেখতে ও সইতে হয়েছে।

আমার মনে হয়, একমাত্র সীমা নির্দেশকারী এবং নিয়ামক শক্তি হিসাবেই রাষ্ট্র শ্রমশিল্পের সত্যকার সহায়তা করতে পারে। রাষ্ট্রকে দেখতে হবে যে শ্রমিকদের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন স্বাভাবিকতার সীমা না ছাড়ায়, প্রতিটি শিশুকে যেন সুষ্ঠু ভাবে বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয় এবং শ্রমিকরা যেন উপভোগ্য পণ্য ক্রয় করার উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায়। বিষয়মুখ বৃত্তি দ্বারা চালিত স্বাধীন বিশেষজ্ঞ দ্বারা এর বিধিব্যবস্থা রচিত হলে সীমাবদ্ধ কর্মসূচীর মধ্যেও উপরি-উক্ত প্রকারের রাষ্ট্রশক্তি চূড়ান্ত প্রভাব প্রয়োগ করতে পারে।

[১৯৩৪]

যুদ্ধ জয় হয়েছে ; কিন্তু শান্তি আসেনি

আলফ্রেড নোবেলের অবস্থার সঙ্গে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের অবস্থার বিশেষ পার্থক্য নেই। আলফ্রেড নোবেল এমন এক ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার করেন, যা সেই সময় পর্যন্ত অবিদিত ছিল। তাঁর আবিষ্কার উচ্চশ্রেণীর বিধ্বংসী উপকরণ রূপে পরিগণিত হল। এর প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য, তাঁর মানবীয় বিবেককে শান্তি দেবার জন্য তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি প্রবর্ধন কল্পে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন। সর্বযুগের অতীব ভয়াবহ এবং বিপজ্জনক মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে অংশগ্রহণকারী আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানীরাও অনুরূপ দায়িত্বচিন্তা দ্বারা পীড়িত হচ্ছেন। তাঁদের ভিতর এর জন্য যে একটা অপরাধী ভাব আছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। বিশ্ববাসীকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা থেকে আমরা প্রতিনিবৃত্ত হতে পারি না। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি এবং বিশেষ করে তাদের সরকার সমূহ পারস্পরিক সম্বন্ধ ও ভবিষ্যৎ গঠনকার্য সম্বন্ধে নিজ

মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধন না করলে নিশ্চিত ভাবে কী সাংঘাতিক বিপদের পথ প্রশস্ত করবেন, সে সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করার প্রচেষ্টায় আমরা শৈথিল্যের প্রশ্রয় দিতে পারি না বা দেওয়া উচিত নয়। মানবসভ্যতার শত্রুরা যাতে আমাদের চেয়েও আগে এর আবিষ্কার না করতে পারে, তার জন্য আমরা এই নবীন অস্ত্র উদ্ভাবনে সহায়তা করেছি। কারণ নাৎসীদের মত সামরিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন গোষ্ঠীর হাতে এই অস্ত্র পড়তে দেবার অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে অচিন্তনীয় ধ্বংস ও পরাধীনতা ডেকে আনা। সমগ্র মানবতার অছি রূপে, শান্তি ও স্বাধীনতার যোদ্ধা হিসাবে আমেরিকা ও ব্রিটেনের জনসাধারণের হাতে আমরা এই আয়ুধ সঁপে দিয়েছিলাম। কিন্তু এ যাবত আমরা শান্তির নিশ্চয়তার কোন নিদর্শন পাইনি।

অতলান্ত সনদে বিভিন্ন জাতিকে স্বাধীনতা দানের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যুদ্ধ জয় হয়েছে; কিন্তু শান্তি উপলব্ধ হয়নি। যুদ্ধ পরিচালন ব্যাপারে যে বৃহৎ শক্তিবর্গ একমত হয়েছিলেন, তাঁরা আজ শান্তি প্রতিষ্ঠার সময় ভিন্নমতাবলম্বী। বিশ্বকে ভয় থেকে মুক্তি দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ভয়ের মাত্রা আরও সাংঘাতিক ভাবে বেড়েছে। পৃথিবীকে অভাব ও পীড়ন থেকে মুক্তি দেবার অঙ্গীকার করা হয়েছিল; কিন্তু আজ এক দিকে মুষ্টিমেয় লোক প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবে আছে, অন্য দিকে বিশ্বের অধিকাংশ অধিবাসী বুভুক্ষার সম্মুখীন। বিভিন্ন জাতির পরাধীনতা-বন্ধন মোচন করা হবে ও তাদের প্রতি ন্যায়বিচার হবে বলে কথা দেওয়া হয়েছিল। "মুক্তি" ফৌজরা কি ভাবে স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকামী জনসাধারণের উপর আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা অনল বর্ষণ করেছে এবং অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে কায়েমী স্বার্থের বশংবদ সেবক ব্যক্তি ও দল সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে—এই শোকাবহ দৃশ্য আমরা দেখেছি এবং আজও দেখছি। রাষ্ট্রীয় সীমারেখা সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বাদবিতণ্ডা সেকেলে হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত এর স্থান সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীর ঊর্ধ্বে।

এই রকম একটি ব্যাপার সম্বন্ধে আমাকে আরও স্পষ্ট ভাবে বলার অনুমতি দিন। এই নজিরটি সাধারণ স্থিতিরই দ্যোতক। আমার স্বজাতীয় ইহুদিদের কথা আমি বলতে চাই।

নাৎসীদের হিংসানল যতদিন কেবল (অথবা মূলতঃ) ইহুদিদের দগ্ধ করছিল, ততদিন বিশ্বের আর সকলে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে তো আবার তৃতীয় রাইখের দাগী অপরাধী সরকারের সঙ্গে সন্ধি এবং চুক্তিবন্ধনেও আবদ্ধ হন। এর পর হিটলার যখন রুমানিয়া ও হাঙ্গেরী গ্রাস করার উপক্রম করেন, তখন মেডানেক্ ও অসউইসিম মিত্রপক্ষের দখলে ছিল এবং গ্যাস চেম্বারের

পদ্ধতির কথাও বিশ্ববাসীর নিকট বিদিত ছিল। তবুও হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ার ইহুদিদের উদ্ধার করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল; কারণ ব্রিটিশ সরকার ইহুদি উদ্বাস্তুদের কাছে প্যালেস্টাইনের দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন এবং এমন একটা দেশ পাওয়া গেল না, যেখানে এই নিঃস্ব লোকগুলিকে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। অক্ষশক্তি কবলিত দেশস্থ তাদের হতভাগ্য ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মতই এই সব উদ্বাস্তুদের মরতে দেওয়া হয়।

আমরা কখনই এ কথা বিস্মৃত হতে পারি না যে, ইহুদিদের জীবন রক্ষার জন্য ক্ষুদ্রায়তন স্ক্যাণ্ডিনেভীয়, ওলন্দাজ এবং সুইস রাষ্ট্র সমূহ ও দখলীকৃত ইউরোপের বহু ব্যক্তি যথাসাধ্য প্রয়াস করেছেন। নাৎসী বাহিনী পোল্যাণ্ডের ভিতর অগ্রসর হবার সময় বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াই নিজ দেশের দ্বার সহস্র সহস্র ইহুদিদের জন্য খুলে দেয়। তাঁদের এই সহৃদয় আচরণের কথা আমরা বিস্মৃত হব না। তবে যাই হোক, এসব ঘটেছে এবং এর সংঘটন রোধ করা যায়নি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি কিরূপ? সংশ্লিষ্ট জনগণের ইচ্ছার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ইউরোপে যখন রাষ্ট্রসীমার পরিবর্তন সাধন করা হচ্ছে, তখন ইউরোপীয় ইহুদিদের অবশিষ্টাংশকে (যুদ্ধপূর্ব জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মাত্র) পুনরায় তাদের স্বর্গ প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এবং তাদের বুভুক্ষা, হিমপ্রবাহ ও স্থায়ী প্রতিকূলতার করালগ্রাসের মুখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আজও এমন কোন দেশ নেই যেখানে তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করার জন্য আমন্ত্রিত হতে পারে। এখন পর্যন্ত তাদের অনেককে যে মিত্রশক্তি নরকসদৃশ "কনসেনট্রেশন ক্যাম্প" গুলিতে রেখে দিয়েছেন—এই ঘটনাই পূর্বোক্ত লজ্জাজনক ও শোচনীয় পরিস্থিতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গণতান্ত্রিক আদর্শের দোহাই দিয়ে এঁদের প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, অথচ পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ "হোয়াইট পেপারের" নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করার পরিণামে বাস্তব পক্ষে পাঁচটি সুবিশাল ও জনবিরল আরব রাষ্ট্রের হুমকি ও বাহ্য চাপের কাছে নতি স্বীকার করছেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী এক দিকে হতভাগ্য ইউরোপীয় ইহুদিদের বলেন যে, ইউরোপের কল্যাণের জন্য তাঁদের প্রতিভার প্রয়োজন আছে এবং তাই তাঁদের ইউরোপেই থাকা উচিত। আবার অন্য দিকে তিনি তাঁদের এই পরামর্শ দেন যে, তাঁরা যেন খাদ্য বা পণ্যের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো লাইনের সম্মুখে না থাকেন, কারণ এতে তাঁদের নূতন করে বিদ্বেষ ও উৎপীড়নের সম্মুখীন হবার আশঙ্কা আছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর এবংবিধ উক্তিকে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? কিন্তু আমার মনে হয় সারির সামনে থাকা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর নেই। ষাট লক্ষ স্বধর্মীকে বলি দিয়ে তাঁরা সারির সম্মুখ ভাগেই এসে পড়েছেন—নাৎসীদের রোষবহ্নির হতভাগ্য শিকারের

মিছিল এই সারি এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁদের এইভাবে সামনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের যুদ্ধোত্তর বিশ্বের চিত্র খুব উজ্জ্বল নয়। আমাদের অর্থাৎ পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কথা বলতে গেলে আমরা বলতে পারি যে, আমরা রাজনীতিবিশারদ নই এবং রাজনীতি নিয়ে অনধিকার চর্চার বাসনা কখনও আমাদের হয়নি। তবে আমরা এমন কতকগুলি বিষয় জানি যা রাজনীতিবিদ্‌দের অগোচর। স্থতরাং কর্তৃপক্ষদের আমরা এই কথা মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে বোধ করছি যে, অনায়াসে স্থখ-স্থবিধা ভোগ করার কোন পন্থা নেই এবং শম্বুকগতিতে চলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখলে কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে দরকষাকষি করার মত সময় আর নেই। আজকের অবস্থায় সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ প্রয়োজন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় এবং সমগ্র রাজনৈতিক ধারণার সর্বাঙ্গীণ বিপ্লব সাধন ঈপ্সিত। বিশ্বাস, নির্ভরতা, দাক্ষিণ্য এবং ভ্রাতৃত্বভাবের যে মানসিক প্রেরণা একদা আলফ্রেড নোবেলকে তাঁর মহান্ সংস্থা স্থাপনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা যেন আজ যাঁদের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। নচেৎ মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

[১৯৪৫]

পারমাণবিক যুদ্ধ—না শান্তি?

পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার কোন নূতন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। এর ফলে শুধু উপস্থিত সমস্যা সমাধানের জন্য তৎপর হবার প্রয়োজনীয়তা অধিকতর মাত্রায় দেখা দিয়েছে। বলা যেতে পারে যে, পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার আমাদের পরিমাণগত ভাবে (quantitatively) স্পর্শ করেছে, গুণগতভাবে (qualitatively) নয়। যতদিন পর্যন্ত অমিত ক্ষমতার আকর সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন যুদ্ধ অপরিহার্য। কবে যুদ্ধ হবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা হচ্ছে না, শুধু এই কথা বলা হচ্ছে যে যুদ্ধ হবেই হবে। পারমাণবিক বোমা সৃষ্টির পূর্বেও এ কথা সত্য ছিল। এবার শুধু যুদ্ধে বিধ্বংসকারিতার রূপ পরিবর্তন হয়েছে।

পারমাণবিক বোমার যুদ্ধে সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এতে সম্ভবতঃ পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী নিহত হতে পারে। তা হলেও নূতন করে গোড়াপত্তনের জন্য বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ও যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ রয়ে যাবে এবং সভ্যতাকে পুনঃসংস্থাপিত করা যেতে পারবে।

পারমাণবিক বোমার রহস্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া উচিত

বলে আমি মনে করি না। আমার মতে সোভিয়েট রাশিয়াকেও এ দেওয়া সমীচীন হবে না। উভয় ক্ষেত্রেই তা হলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াবে যেন একজন মূলধন বিনিয়োগকারী ব্যক্তি ব্যবসা করতে নেমে নিজের পুঁজির অর্ধেক কাউকে দিয়ে তাকে অংশীদার হতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির সহযোগিতা পাবার উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা করা হলেও এ রকম সুযোগ পাবার পর অক্লেশে সে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে পারে। পারমাণবিক বোমার রহস্য এক বিশ্বসরকারের হস্তে সমর্পণ করতে হবে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে এই মর্মে ঘোষণা করতে হবে যে তাঁরা এর জন্য প্রস্তুত। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং গ্রেট ব্রিটেন —সামরিক শক্তিতে অগ্রণী এই তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্রকে সম্মিলিত ভাবে বিশ্বসরকারের পত্তন করতে হবে। পূর্বোক্ত তিনটি রাষ্ট্রই বিশ্বসরকারের কাছে তাঁদের যাবতীয় সামরিক শক্তি অর্পণ করে দেবেন। তিনটি মাত্র রাষ্ট্র উচ্চ মাত্রায় সামরিক শক্তি বিশিষ্ট হবার ফলে এই-জাতীয় বিশ্বসরকার গঠিত হওয়া কঠিন না হয়ে সহজ-সাধ্য হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের হাতে পারমাণবিক বোমার গুপ্ত রহস্য আছে ও সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে এ তথ্য অপরিজ্ঞাত। সুতরাং আমেরিকা ও ব্রিটেন সোভিয়েট ইউনিয়নকে প্রস্তাবিত বিশ্বসরকারের প্রথম খসড়া সংবিধান প্রস্তুত ও উপস্থাপিত করতে আমন্ত্রণ জানাবে। এই কার্য রাশিয়ার মন থেকে অবিশ্বাসের ভাব দূর করায় সাহায্য করবে। পারমাণবিক বোমার রহস্য প্রধানতঃ তাদের হাতে যাতে না পড়ে এই জন্য গোপন রাখা হচ্ছে বলে রাশিয়ার মনে ইতঃপূর্বেই সন্দেহ সংক্রামিত হয়েছে। নিঃসন্দেহেই প্রারম্ভিক খসড়াকেই চূড়ান্ত বলে মানা হবে না, তবে রাশিয়ার মনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে হবে যে বিশ্বসরকার তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে।

সংবিধান সম্পর্কীয় আলাপ-আলোচনা যদি আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়ার মাত্র এক একজন প্রতিনিধি দ্বারা চালিত হয়, তা হলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হবে। অবশ্যই তাঁদের উপদেষ্টামণ্ডলী থাকবেন; কিন্তু এই সব উপদেষ্টারা পরামর্শ চাওয়া হলে তবে পরামর্শ দেবেন। আমার বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কাজ-চলার-মত একটা সংবিধান রচনা করার জন্য তিন জনই যথেষ্ট। ছয় বা সাত জন অথবা ততোধিক ব্যক্তি সম্ভবতঃ কার্য সাধনে অসমর্থ হবেন। বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয় সংবিধান রচনা ও তা গ্রহণ করার পর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় রাষ্ট্রগুলিকে বিশ্ব-সরকারে যোগদান করতে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করতে হবে। তাঁদের বাইরে থাকার স্বাধীনতা থাকবে এবং বাইরে থেকে তাঁরা নিরাপত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁরা বিশ্বসরকারে যোগ দিতে ইচ্ছুক হবেন। স্বভাবতঃই

বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয় কর্তৃক মুশাবিদাকৃত সংবিধানের সংশোধনকল্পে প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকার তাঁদের থাকবে। তবে ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রগুলি যোগদান করুক বা না করুক, বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়কে এগিয়ে গিয়ে প্রস্তাবিত বিশ্বসরকারকে সাকার করতে হবে।

যাবতীয় সামরিক ব্যাপারের উপর এই বিশ্বসরকারের কর্তৃত্ব তো থাকবেই এবং এ ছাড়া আর একটি ক্ষমতা বিশ্বসরকারকে দিতে হবে। যে সব দেশে মুষ্টিমেয় কয়েক জন তত্রস্থ সংখ্যাগুরুদের উপর অত্যাচার করছে এবং এইভাবে এমন এক অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি করছে যার পরিণাম হচ্ছে যুদ্ধ, সেই সব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অধিকারও এই বিশ্বরাষ্ট্রের থাকবে। আর্জেনটিনা এবং স্পেনের ব্যাপারে মাথা গলাতে হবে। হস্তক্ষেপ না করার ধারণার পরিসমাপ্তি প্রয়োজন। কারণ এর অবসান শান্তিরই অঙ্গ।

বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের অভ্যন্তরে যতদিন না সমপরিমাণ স্বাধীনতার পরিবেশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, ততদিন এই বিশ্বসরকার গঠন প্রচেষ্টাকে মুলতুবী রাখার প্রয়োজন নেই। এ কথা সত্য যে সোভিয়েট ইউনিয়নে সংখ্যালঘুদের রাজত্ব চলছে; তবে সে দেশের আভ্যন্তরীণ স্থিতি বিশ্বশান্তির পক্ষে বিঘ্নকারক নয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, রুশ জনসাধারণ দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক শিক্ষা পায়নি এবং উপযুক্ত সংখ্যাগুরু দল প্রস্তুত ছিল না বলেই সংখ্যালঘুদের রাশিয়ার অবস্থার পরিবর্তন সাধনের কার্যভার নিতে হয়েছিল। আমি যদি রাশিয়ান হয়ে জন্মগ্রহণ করতাম, তা হলে আমার বিশ্বাস আমি দেশের অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতাম।

একচ্ছত্র সামরিক কর্তৃত্ব বিশিষ্ট বিশ্বসরকার স্থাপনার জন্য বৃহৎ শক্তিত্রয়ের আভ্যন্তরীণ গঠনপদ্ধতির পরিবর্তন সাধনের কোন প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রিক কাঠামো সত্ত্বেও কি ভাবে তাঁদের নিজ নিজ দেশকে সহযোগিতার জন্য কাছাকাছি আনা যায় সে ব্যবস্থা করার ভার সংবিধানের খসড়াপ্রস্তুতকারী ব্যক্তিত্রয়ের উপর।

বিশ্বসরকার অত্যাচার করবে—এ রকম আশঙ্কা আমার মনে আছে কি? অবশ্যই আমার মনে এ আশঙ্কা আছে। তবে এর চেয়েও বেশী ভয় করি আর এক বা একাধিক যুদ্ধের সম্ভাবনাকে। যে কোন সরকারই কিছুটা অনিষ্টকর হতে বাধ্য। তবে এর চেয়েও বহুগুণ অনিষ্টকর যুদ্ধের সম্ভাবনার তুলনায় (বিশেষতঃ আজকের বহুগুণবর্ধিত সংহারশক্তির পরিপ্রেক্ষিতে) বিশ্বসরকার অধিকতর কাম্য। পারস্পরিক সম্মতির পথে যদি এই-জাতীয় বিশ্বসরকার গঠিত না হয় তবে আমার বিশ্বাস যে, যে কোন উপায়ে এ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তখন এর স্বরূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ধরনের হবে। কারণ এক বা একাধিক যুদ্ধের পরিণামে একটি মাত্র শক্তি সার্বভৌম হবে এবং তার প্রচণ্ড সামরিক বলের সহায়তায় সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করবে।

আমি জানি যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা অন্তিম লক্ষ্য হিসাবে বিশ্বসরকার গঠন পরিকল্পনা সমর্থন করলেও বর্তমানে মন্দ গতিতে এই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হবার নীতির পৃষ্ঠপোষক। চরম লক্ষ্যে উপনীত হবার আশায় এই ভাবে ধীর গতিতে এক পা এক পা করে এগোবার অসুবিধা হচ্ছে এই যে, যখন আমরা এই রকম শম্বুক গতিতে এগোচ্ছি তখনও আমাদের কাছে পারমাণবিক বোমা রয়েছে এবং যাদের কাছে বোমা নেই তাদেরকে আমাদের এই ভাবে বোমা রাখার যৌক্তিকতা বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না। এই কারণে ভয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে প্রতিদ্বন্দ্বী সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ ভীষণ ভাবে আধোগামী হয়। সুতরাং এক পা এক পা করে অগ্রসর ব্যক্তিরা বিশ্বশান্তির অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন ভাবা সত্ত্বেও প্রত্যুত তাঁরা তাঁদের মন্থর গতির দ্বারা যুদ্ধের আবির্ভাবেরই সহায়তা করছেন। এই ভাবে অপচয় করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। যুদ্ধ পরিহার করতে হলে অতি সত্বর তা করতে হবে।

তবে পারমাণবিক বোমার গোপন রহস্য বেশীদিন আর গুপ্ত থাকবে না। আমি জানি এক শ্রেণীর লোক এই যুক্তি উপস্থাপিত করে থাকেন যে, পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের জন্য খরচ করার উপযোগী অর্থসম্পদ আর কোন দেশের নেই বলে এর তথ্য বহুদিন গোপন থাকবে। শুধু টাকা দিয়ে কোন বিষয়ের বিচার করা এ দেশের একটা সাধারণ ভ্রান্তি। অন্য যে দেশে পারমাণবিক শক্তির বিকাশ সাধনের উপযোগী উপকরণ ও জনবল আছে, তারা যদি ইচ্ছা করে তবে এ কাজ করতে পারে। কারণ কোন কাজ করার জন্য অর্থ প্রয়োজন হয় না, চাই শুধু উপযুক্ত মানুষ, উপকরণ এবং ইচ্ছা।

নিজেকে আমি পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার জনক মনে করি না। এ ব্যাপারে আমার ভূমিকা অতীব পরোক্ষ ছিল। বস্তুতঃ পক্ষে আমি কল্পনা করতে পারিনি যে, আমার জীবদ্দশায় পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টি সম্ভব হবে। আমি কেবল এইটুকু বিশ্বাস করতাম যে, তত্ত্বের দিক থেকে এ রকম করা সম্ভব। আকস্মিক ভাবে "চেন রিয়্যাক্‌শানের" আবিষ্কারের ফলে এর বাস্তব প্রয়োগ সম্ভবপর হয় এবং এ সম্বন্ধে আমার পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল না। বার্লিনের হ্যান্ এটা আবিষ্কার করেন এবং স্বয়ং তিনি তাঁর আবিষ্কারের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেন। লিসি মিট্‌নার এর যথার্থ অর্থ করেন এবং নীলস বোহ্‌রের কাছে এই সংবাদ পৌছে দেবার জন্য জার্মানী থেকে পলায়ন করেন।

বিজ্ঞানকে বড় বড় করপোরেশনের ধাঁচে সংগঠিত করে পারমাণবিক বিজ্ঞানে নবযুগ আনা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি না। আবিষ্কৃত তথ্যকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য সংস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে; কিন্তু আবিষ্কারের জন্য সংস্থা সৃষ্টি করার সার্থকতা দেখি না। স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষেই কেবল আবিষ্কার করা সম্ভব। অবশ্য

বৈজ্ঞানিকদের স্বাধীনতা বজায় রাখা ও তাঁদের কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করার জন্য কোন এক ধরনের সংগঠন থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের গবেষণা কার্যে গভীরতর ভাবে আত্মনিয়োগ করতে দেবার জন্য তাঁদের উপর থেকে শিক্ষাদানের বোঝা কিছুটা হ্রাস করা উচিত। বৈজ্ঞানিকদের কোন সংস্থা চার্লস ডারুইনের মত আবিষ্কার করেছে—এ কথা আপনারা কল্পনা করতে পারেন কি ?

এ ছাড়া আমাদের সুবৃহৎ বেসরকারী করপোরেশনগুলি এ যুগের উপযুক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি না। যদি কোন দর্শক গ্রহান্তর থেকে এই দেশে আসেন, এই ব্যাপার দেখে তিনি কি বিস্মিত হবেন না যে আমাদের দেশে সমানুপাতিক দায়িত্ব ছাড়াই বেসরকারী করপোরেশনগুলিকে এত অধিক পরিমাণ ক্ষমতা দেওয়া হয় ? আমেরিকান সরকারের পারমাণবিক শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকার অপরিহার্যতার উপর জোর দেবার জন্য আমি এ কথা বলছি। সমাজবাদ অনিবার্যরূপে বাঞ্ছনীয় বলে এ প্রস্তাব করা হচ্ছে না। এ প্রস্তাব এইজন্য যে, পারমাণবিক শক্তি সরকার কর্তৃক উদ্ঘাটিত ও বিকশিত হয়, সুতরাং জনসাধারণের এই সম্পত্তিকে কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা ব্যক্তি-গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে পরিণত করার কথা মনেও আনা যায় না। সমাজবাদ সম্বন্ধে এই কথা বলব যে, যতদিন না এর রূপ আন্তর্জাতিক হয়, অর্থাৎ যতদিন না এর দ্বারা যাবতীয় সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রণকারী বিশ্বসরকার সৃষ্ট হয়, ততদিন পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজবাদের আওতায় যুদ্ধের সম্ভাবনা বেশী। কারণ সমাজবাদী ব্যবস্থায় ক্ষমতার অধিকতর কেন্দ্রীকরণ হয়ে থাকে।

কবে যে পারমাণবিক শক্তি গঠনমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে সে কথা বলা অসম্ভব। এখন শুধু বেশ কিছুটা পরিমাণ ইউরেনিয়াম ব্যবহারের পদ্ধতি জানা গেছে। মোটরগাড়ী বা উড়োজাহাজ চালাবার মত সামান্য পরিমাণ ইউরেনিয়াম ব্যবহারের পদ্ধতি আজও অপরিজ্ঞাত এবং কবে যে এ সম্ভব হবে পূর্ব থেকে তা বলা অসম্ভব। এ সম্ভব হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু কবে হবে তা কেউ বলতে পারে না। আর এ কথাও কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে কবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য ইউরেনিয়ামের চেয়েও সহজলভ্য পদার্থ ব্যবহৃত হবে। তবে মনে হয় যে, এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যাবতীয় উপকরণ উচ্চতর পারমাণবিক ওজন বিশিষ্ট গুরুভার পদার্থের ভিতর থেকেই আসবে। এদের স্থায়িত্বের পরিমাণ স্বল্পতর বলে এগুলি অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য। তেজস্ক্রিয় বিপ্রকর্ষণের ফলে এই সব পদার্থের অধিকাংশ ইতঃপূর্বেই অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকবে। সুতরাং পারমাণবিক শক্তি বিমোচন মানবের কাছে মহান্ আশীর্বাদস্বরূপ হবার সম্ভাবনা থাকলেও (এবং নিঃসন্দেহে এ হবেও) অবিলম্বেই এ আশা পূর্ণ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

মানবজাতি আজ যে সমস্যার সম্মুখীন, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে বহু সংখ্যক ব্যক্তির মনে প্রতীতি উৎপন্ন করার মত বাক্‌শক্তি আমার নেই। অতএব যাঁর ভিতর এই-জাতীয় বোঝাবার ক্ষমতা আছে, তাঁর রচনা পাঠ করার সুপারিশ আমি জানাব। এমরী রীভস্ লিখিত 'দি এনাটমি অফ দি পীস' গ্রন্থটি বুদ্ধিমত্তায় পরিপূর্ণ এবং সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত। এ প্রসঙ্গে "গতিশীল" কথাটির মত একটি বহুলব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করার অনুমতি যদি দেওয়া হয় তা হলে বলব যে, যুদ্ধ এবং বিশ্ব-সরকারের প্রয়োজনের বিষয়ে রচনাটি নিতান্ত গতিশীল।

পারমাণবিক শক্তি সত্বর এক মহান্ আশীর্বাদস্বরূপ হবে বলে দেখতে পাচ্ছি না। সেই জন্য আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এখনকার মত এ শক্তি ভীতির কারণ স্বরূপ। হয়তো এ রকম হয়ে ভালই হয়েছে। এর কারণ ভীত হয়ে মানবজাতি হয়তো তাদের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তন করবে। ভয়ের চাপ না থাকলে মানুষ বোধ হয় এ রকম করবেই না।

[১৯৪৫]

২

প্রথম পারমাণবিক বোমাটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হবার পর এ যাবৎ এমন কিছুই করা হয়নি যাতে পৃথিবী যুদ্ধের আতঙ্কমুক্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে যুদ্ধের বিধ্বংসী ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য অনেক কিছুই করা হয়েছে। পারমাণবিক বোমা উৎপাদনের ব্যাপারে আমি নিযুক্ত নই বলে এর বিকাশ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে যাঁরা এ নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা এমন অনেক কিছু বলেছেন, যার ফলে এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, পারমাণবিক বোমাকে আরও কার্যকর করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে বর্তমান অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ আকারের এবং পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর এলাকায় ধ্বংসসাধনক্ষম বোমা নির্মাণ করার সম্ভাবনার কথা কল্পনা করা যেতে পারে। এমনও হতে পারে যে, তেজস্ক্রিয় গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহার করা হল এবং এই গ্যাস সুবিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ঘরবাড়ির কোন রকম ক্ষতি না করে অসংখ্য জীবনহানি ঘটাল।

এই সব সম্ভাবনার অতিরিক্ত ব্যাপক জীবাণু-যুদ্ধের কথা কল্পনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। এর ফলে পারমাণবিক যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে এমন কথা আমার বিশ্বাস হয় না। এ ছাড়া অংশতঃ বা পূর্ণতঃ এই গ্রহকে ধ্বংস করার মত "চেন রিয়্যাক্‌শান" শুরু হয়ে যাবার সম্ভাবনা আমি হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য বলে ভাবি না। এই-জাতীয় সম্ভাবনাকে বাতিল করার কারণ হচ্ছে এই যে, মানবকৃত পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যদি এ রকম

ঘটা সম্ভব হয়, তবে বহু পূর্বেই অনবরত ধরাতল স্পর্শকারী মহাজাগতিক রশ্মি-সমূহের ক্রিয়ার ফলে এ রকম ঘটে যেত।

তবে পারমাণবিক যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতা স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য এ কথা কল্পনা করার প্রয়োজন নেই যে, এই পৃথিবী নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণের ফলে নোভার (Nova) মত ধ্বংস হবে। এ কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, আর একটি যুদ্ধের সম্ভাবনা রোধ করতে না পারলে তার পরিণামে এমন প্রচণ্ড ধ্বংসের মহাপ্লাবন আসবে, যার নজীর কোন অতীত ইতিহাসে নেই। সেই সম্ভাব্য ধ্বংসের কথা এখনও প্রায় অকল্পনীয়। যদি সে ধ্বংস আসে, আমাদের এই ক্ষীণপ্রাণ সভ্যতাকে আর সে আঘাত সামলিয়ে উঠতে হবে না।

পারমাণবিক যুগের প্রথম দুই বৎসরে আর একটি জিনিস চোখে পড়েছে। পারমাণবিক যুদ্ধের বীভৎসতা সম্বন্ধে সতর্ক করা সত্ত্বেও জনসাধারণ এ সম্বন্ধে কিছুই করেনি এবং বহুল পরিমাণে এই সতর্কবাণী তারা চৈতন্য থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে। যে বিপদ এড়ানো যায় না তার কথা ভুলে যাওয়াই বোধ হয় ভাল। অথবা যে বিপদের আশঙ্কা সম্বন্ধে সম্ভাব্য সকল প্রকারের প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সম্ভবতঃ তার কথা বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়স্কর। অর্থাৎ আমেরিকা যদি তার শ্রমশিল্পকেন্দ্র সমূহ ও নগরীগুলি বিকেন্দ্রিত করে, তা হলে জনসাধারণের পক্ষে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের কথা বিস্মৃত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

আমি বেশ জোর দিয়েই এ কথা বলতে চাই যে, আমেরিকা পূর্বোক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে ভালই করেছে। কারণ এ রকম করলে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা আরও দৃঢ় হত। বিশ্বের আর সকলে তা হলে বিশ্বাস করত যে, আমরা পারমাণবিক যুদ্ধ করতে মনস্থ করে ফেলেছি এবং তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। তবে যেহেতু এ যাবৎ যুদ্ধ পরিহার করার জন্য কিছুই করা হয়নি বরং পক্ষান্তরে পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা বৃদ্ধি করার জন্যই প্রয়াস করা হয়েছে, সেইজন্য এই বিপদের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করার সপক্ষে কোন অজুহাতই নেই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে পারমাণবিক শক্তির উপর রাষ্ট্রোত্তর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার প্রস্তাব উপস্থাপিত করা সত্ত্বেও আমাকে এ কথা বলতে হচ্ছে যে, যুদ্ধ নিবারণ করার জন্য এ যাবত কিছুই করা হয়নি। আমাদের দেশ শুধু একটি শর্তাধীন প্রস্তাব পেশ করেছে এবং এ শর্ত এমন যে সোভিয়েট রাশিয়া এখন তা গ্রহণ না করতে কৃতসংকল্প। এই কারণে ব্যর্থতার জন্য রাশিয়াকে দায়ী করা সহজ হয়েছে।

কিন্তু রাশিয়ার প্রতি দোষারোপ করার পূর্বে আমেরিকার এ কথা ভুললে চলবে না যে, রাষ্ট্রোত্তর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে বা আদৌ যদি রাষ্ট্রোত্তর নিয়ন্ত্রণ

স্থাপিত না হয়, সে ক্ষেত্রে সাধারণ যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে পারমাণবিক বোমার প্রয়োগ তাঁরা নিজেরা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেননি। এইভাবে তাঁরা অপরাপর দেশের মনে এই ভীতির পরিপুষ্টি সাধন করেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত অপরাপর রাষ্ট্র রাষ্ট্রোত্তর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা করার জন্য তাঁদের শর্ত গ্রহণে অসম্মত হবে, ততদিন আমেরিকা পারমাণবিক বোমাকে স্বীয় অস্ত্রাগারের আইনসম্মত আয়ুধ বলে বিবেচনা করবে।

আমেরিকাবাসীরা হয়তো নিজেদের তরফ থেকে আক্রমণাত্মক বা নিরোধক যুদ্ধ আরম্ভ না করার সংকল্প সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয়শীল। সুতরাং তাঁরা হয়তো মনে করতে পারেন যে, তাঁরা যে দ্বিতীয় বার নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করবেন না, এ সম্বন্ধে প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এই দেশকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার বর্জন করতে অর্থাৎ তাকে আইন-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। অথচ যতক্ষণ না রাষ্ট্রোত্তর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজ শর্ত গৃহীত হয়, ততক্ষণ আমেরিকা এরূপ করতে অস্বীকার করেছে।

আমি এই কর্মনীতিকে ভ্রমাত্মক বলে মনে করি। পারমাণবিক বোমার প্রয়োগ বর্জন না করার পিছনে আমি কিছুটা সামরিক লাভের ইঙ্গিত দেখতে পাই। অনেকে মনে করেন যে, আমেরিকা এই বোমা ব্যবহার করতে পারে ভেবে অন্য দেশ যুদ্ধ আরম্ভ করা সম্বন্ধে সংযত হবে। কিন্তু এক দিক থেকে যেটুকু লাভ হয়, তা অন্য দিক থেকে বেরিয়ে যায়। কারণ এর পরিণামে পারমাণবিক শক্তির রাষ্ট্রোত্তর নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়। যতদিন পর্যন্ত পারমাণবিক বোমার উপর আমেরিকার একচেটিয়া অধিকার রয়েছে, ততদিন রণনীতির দিক থেকে এ হয়তো কোন দুর্বলতা নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে অন্য কোন দেশ যথেষ্টসংখ্যক পারমাণবিক বোমা উৎপাদন করতে সমর্থ হবে, কোন আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া না থাকার জন্য আমেরিকা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ আমেরিকার শ্রমশিল্প অত্যন্ত ঘনীভূত ও নাগরিক জীবন অতিমাত্রায় সমৃদ্ধ হওয়ায় সহজেই এর ক্ষতি সাধন করা যায়।

পারমাণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকার সত্ত্বেও একে বিধি-বহির্ভূত ঘোষণা করতে অস্বীকার করে এই দেশ আর এক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে যুদ্ধ পরিচালনার যে নৈতিক মানদণ্ড আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃত হয়েছিল, আমেরিকা প্রকাশ্য ভাবে তার মর্যাদা রক্ষা করতে পরাঙ্মুখ হচ্ছে। এ কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, জার্মানরা যাতে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করে তার প্রয়োগ করে না ফেলে সেইজন্যই প্রতিষেধাত্মক ব্যবস্থা হিসাবে এ দেশে

এর উৎপাদন করা হয়েছিল। অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা বর্ষণ করার প্রথা জার্মানরা প্রবর্তন করে এবং জাপানীরা তাদের কাছ থেকে এটি শেখে। দেখা গেল, মিত্রপক্ষও অধিকতর কুশলতা সহকারে এতে সাড়া দিল এবং মিত্রপক্ষের এরূপ আচরণের নৈতিক যৌক্তিকতা ছিল। কিন্তু এখন কোন রকম প্ররোচনার কারণ না ঘটলেও এবং প্রতিশোধ নেওয়া বা প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করার যৌক্তিকতা না থাকলেও নিছক আক্রোশ চালিত হয়ে পারমাণবিক বোমা বিধি-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করতে অস্বীকার করা স্রেফ্ রাজনৈতিক অভিসন্ধিদ্যোতক। এ মনোবৃত্তি ক্ষমা করা যায় না।

আমি অবশ্য এ কথা বলছি না যে, আমেরিকা পারমাণবিক বোমা উৎপাদন বা মজুদ করবে না ; কারণ আমি মনে করি যে আমেরিকার এ রকম করা উচিত। পারমাণবিক বোমা সংগ্রহকারী অন্য দেশকে আক্রমণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার ব্যবস্থা আমেরিকার কাছে থাকা চাই। কিন্তু বোমা মজুদ করার একমাত্র লক্ষ্য হবে সম্ভাব্য আক্রমণকারীকে প্রতিনিবৃত্ত করা। একই কারণে আমি বিশ্বাস করি যে, যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ও সমরাস্ত্র হবে, তখন তার হাতেও পারমাণবিক বোমা থাকা বিধেয়। তবে এরও একমাত্র উদ্দেশ্য হবে কোন আক্রমণকারী বা বিদ্রোহী রাষ্ট্রকে পারমাণবিক অস্ত্রের শরণ নেওয়া থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন দেশের মত সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জ প্রতিষ্ঠানও নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে এ অস্ত্র প্রয়োগ করবে না। নিজেদের তরফ থেকে প্রথমে বোমা ব্যবহৃত হবে না—এই মর্মে প্রতিশ্রুতি না দিয়ে পারমাণবিক বোমা মজুদ করার অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এর স্বামিত্বের অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করা। হয়তো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে সোভিয়েট রাশিয়াকে ভয় দেখিয়ে পারমাণবিক শক্তির রাষ্ট্রোত্তর নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা তাদের দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেবার আশা করছে। কিন্তু ভয় শুধু বিরোধিতা বৃদ্ধি করে এবং এর ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা তীব্রতর হয়। আমার অভিমত হচ্ছে পূর্বোক্ত নীতির ফলে পারমাণবিক শক্তির রাষ্ট্রোত্তর নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনারূপী অমৃত গরলে পরিণত হয়েছে।

আমরা এমন একটা যুদ্ধের ভিতর দিয়ে উদ্গত হয়ে এসেছি, যখন আমাদেরকে শত্রুপক্ষের অত্যন্ত হীন নৈতিক মানদণ্ড মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু সেই মানদণ্ডের শ্বাসরোধকর পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে মানবজীবনের শুচিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অসামরিক জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করার বদলে আমরা বস্তুতঃ বিগত যুদ্ধের শত্রুপক্ষীয় নিম্নশ্রেণীর মানদণ্ডকে বর্তমানে আত্মগত করতে চলেছি। এইভাবে নিজেদের কুরুচির জন্য আমরা আর একটি যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছি।

জনসাধারণ হয়তো এ কথা স্পষ্টভাবে জানে না যে, আগামী যুদ্ধে বহুল পরিমাণ পারমাণবিক বোমা যুদ্ধকারীদের হাতে থাকবে। তাঁরা হয়তো বিগত মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হবার পূর্বে বিস্ফোরিত তিনটি পারমাণবিক বোমার অভিজ্ঞতা দিয়েই ভবিষ্যৎ সংকটের মূল্যাঙ্কন করছেন। জনসাধারণ হয়তো এ কথাও বুঝতে পারছে না যে, যতটা ধ্বংসলীলা সাধন করা যায় সেই অনুপাতে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা ইতোমধ্যেই সর্বাপেক্ষা সুলভ মারণাস্ত্র বলে স্বীকৃত হয়েছে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে পারমাণবিক বোমা পাওয়া যাবে এবং এর দামও হবে অপেক্ষাকৃত সস্তা। পারমাণবিক বোমা ব্যবহার না করার সপক্ষে আমেরিকার রাজনীতিবিদ্, সেনাবাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং স্বয়ং জনসাধারণের মধ্যে বর্তমানাপেক্ষা বহুগুণ দৃঢ় সংকল্পশক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত পারমাণবিক যুদ্ধ পরিহার করা দুরূহ হবে। আমেরিকাবাসী যতদিন না এই কথাটি উপলব্ধি করছেন যে, পারমাণবিক বোমার অধিকারী হওয়ার জন্য তাঁরা অপরাপর রাষ্ট্রের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী নন, বরং পারমাণবিক আক্রমণের সম্ভাব্য সহজ লক্ষ্যস্থল হবার কারণে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দুর্বল, ততদিন লেক সাকসেসে তাঁদের নীতি বা রাশিয়ার সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ সদ্ভাব সৃষ্টির পথে চালিত হবে না।

তবে আমি কিন্তু এ কথা বলতে চাই না যে, আমেরিকার তরফ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে পারমাণবিক বোমা নিষিদ্ধ করতে ব্যর্থ হওয়াই সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পারমাণবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার একমাত্র অন্তরায়। রাশিয়ানরা এ কথা স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা সর্বশক্তি প্রয়োগে যে কোন রকম রাষ্ট্রোত্তর শক্তি সৃষ্টিতে বাধা দেবেন। তাঁরা শুধু পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রেই একে বাতিল করেননি, তাঁরা নীতিগত ভাবেই এ সম্ভাবনাকে খারিজ করেছেন এবং এইরূপ সীমিত ক্ষমতা বিশিষ্ট বিশ্বসরকারে যোগদান করার যে কোন প্রস্তাব অগ্রিম প্রত্যাখ্যান করে বসে আছেন।

মিঃ গ্রমিকো ঠিকই বলেছেন যে, আমেরিকার পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত প্রস্তাবের মর্ম হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব পারমাণবিক যুগে মানায় না। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এই অভিমত স্বীকার করতে পারে না। তিনি এর সমর্থনে যে যুক্তি দিয়েছেন তা ঘোলাটে। স্পষ্টই মনে হয়, এগুলি অছিলা ছাড়া আর কিছু নয়। যা সত্য মনে হয় তা হচ্ছে এই যে, সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, রাষ্ট্রোত্তর ব্যবস্থার আওতায় তাঁরা সোভিয়েট রাষ্ট্রের সামাজিক গঠন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন না। সোভিয়েট সরকার তাঁদের দেশের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখতে দৃঢ়সংকল্প এবং এই রকম ব্যবস্থার ফলে রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ অমিত ক্ষমতার অধিকারী বলে পারমাণবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণকারী বা

অন্য যে-কোন ধরনের যাবতীয় রাষ্ট্রোত্তর ব্যবস্থা প্রবর্তনে সর্বশক্তি প্রয়োগে বাধা দেবেন।

রাষ্ট্রোত্তর ব্যবস্থায় সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান সমাজ-সংগঠন অবিকৃত না থাকার দরুন যে অসুবিধা হবে বলে রাশিয়ানরা ভাবছেন, তা হয়তো অংশতঃ যথার্থ। অবশ্য কালক্রমে তাঁদের বোঝানো যাবে যে, সুশৃঙ্খল-বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার তুলনায় এ ক্ষতি তেমন কিছু নয়। তবে বর্তমানে তাঁরা ভয় দ্বারা চালিত বলে মনে হয় এবং এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, রাশিয়ার মনে আশঙ্কার কারণ বৃদ্ধির ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অবদান মোটেই কম নয়। শুধু পারমাণবিক শক্তির ব্যাপারেই নয়, আরও বহু ব্যাপারে আমেরিকা এই ভয়কে জীইয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। বস্তুতঃপক্ষে রাশিয়ার সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে আমেরিকা এই বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয়েছে যে ভয়ই যেন সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক আয়ুধ।

তবে রাশিয়া রাষ্ট্রোত্তর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাধা দিচ্ছে বলেই যে বিশ্বের আর সকলকে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে হবে—এর কোন অর্থ নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাশিয়া যা চায় না, সর্ববিধ কলা প্রয়োগে তার প্রতিরোধ করার পদ্ধতি রুশদের জানা আছে। তবে একবার এ রকম ব্যাপার ঘটে গেলে তারা নরম হয়ে এর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের কর্তব্য হচ্ছে রাশিয়াকে ভেটো (veto) প্রয়োগে রাষ্ট্রোত্তর নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে না দেওয়া। অন্যান্য রাষ্ট্র কিছুটা আশা রাখতে পারে যে, রাশিয়া যখন দেখবে যে এ-জাতীয় রাষ্ট্রোত্তর ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রতিরোধ করা তাদের সাধ্যাতীত, তখন তারা এতে যোগদান করবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এ যাবৎ কোন আগ্রহ দেখায়নি। আমেরিকা শুধু নিজের নিরাপত্তার ব্যাপার নিয়েই মগ্ন ছিল। এটা হচ্ছে সার্বভৌম রাষ্ট্রের পারস্পরিক ক্ষমতাদ্বন্দ্বের প্রতিযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্য। তবে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অরাজকতা চলছে, তার পরিবর্তে নিয়ম-কানুনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমেরিকার জনসাধারণ যদি তাদের নেতৃবৃন্দকে বাধ্য করে তা হলে রাশিয়ার ভয়ের উপর এই ক্রিয়ার যে কি প্রভাব পড়বে, সে সম্বন্ধে অগ্রিম অনুমান করা যায় না। আইনকানুনের রাজত্বে রাশিয়ার নিরাপত্তা আমাদের নিরাপত্তার মতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে এবং আমেরিকার জনসাধারণ সর্বান্তঃকরণে এ সম্বন্ধে অঙ্গীকার করলে (আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই এ রকম ঘটা সম্ভব) খুব সম্ভব এর পরিণামে রাশিয়ার চিন্তাজগতে অচিন্ত্যপূর্ব প্রভাব পড়বে।

বর্তমানে রুশদেশীয়দের কাছে এমন কোন প্রমাণ নেই, যার ভিত্তিতে তারা এই

কথা বিশ্বাস করতে পারে যে, সামরিক প্রস্তুতির নীতিকে আমেরিকার জনসাধারণ হৃষ্টচিত্তে সমর্থন করছে না। তারা বরং সামরিক প্রস্তুতির নীতিকে সুচিন্তিত ভীতি প্রদর্শনের পরিকল্পনা জ্ঞান করে। আইনকানুনের রাষ্ট্রোত্তর রাজ্য স্থাপনার দ্বারাই কেবল বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় শান্তি রক্ষা করা সম্ভব। এই শান্তি রক্ষার উদগ্র কামনা আমেরিকার জনসাধারণের আছে বলে যদি প্রমাণ পাওয়া যেত, তা হলে রুশবাসীর মনে আমেরিকার বর্তমান মনোভাব সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে (অর্থাৎ আমেরিকা রাশিয়ার বিনাশ চায়) তার পরিবর্তে এই ধারণা দৃঢ়মূল হত যে, আমেরিকাবাসী তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রযত্নশীল। আমেরিকার জাগ্রত জনমত কর্তৃক সমর্থিত কোন নির্ভেজাল এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রস্তাব সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে যতক্ষণ না উপস্থাপিত হচ্ছে, ততক্ষণ রাশিয়ার মনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জোর করে কেউ কিছু বলতে পারে না।

আইন ও শৃঙ্খলা চালিত বিশ্বব্যবস্থা রচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা এই প্রতিক্রিয়ার প্রথম ধাপ হতে পারে। তবে রাশিয়ানদের কাছে সেই মুহূর্ত থেকে যদি এই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয় যে, তাদের বাদ দিয়েই পূর্বরূপ বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং তার ফলে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিকতর সুরক্ষিত হবে, তা হলে স্বভাবতঃই তাদের ধারণার পরিবর্তন হবে।

নিরাপত্তা বিধানের কর্তৃত্বযুক্ত বিশ্বসরকারে যোগদান করার জন্য আমি রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানানোর পক্ষপাতী এবং তারা যদি এতে যোগদানে অনিচ্ছুক হয় তা হলে তাদের বাদ দিয়েই রাষ্ট্রোত্তর নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়া উচিত হবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আমি স্বীকার করব যে, এতে ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা আছে। এ কার্যক্রম গৃহীত হলে এমন ভাবে এর রূপায়ণ করতে হবে যে রাশিয়ার কাছে এই কথা যেন দিবালোকের মত স্পষ্ট হয় যে, নূতন ব্যবস্থা রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগঠিত কোন শক্তি-জোট নয়। যুদ্ধসম্ভাবনাকে অতিমাত্রায় হ্রাস করা এই সংগঠনের স্বভাবধর্ম হবে। যে-কোন একক রাষ্ট্রের চেয়ে এর স্বার্থ বিভিন্নমুখী হবে, ফলে আক্রমণাত্মক বা নিরোধক যুদ্ধে এর লিপ্ত হবার সম্ভাবনা কম থাকবে। আয়তনে বৃহত্তর হবার জন্য রাষ্ট্রোত্তর সরকার যে-কোন একক রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর বলশালী হবে। ভৌগোলিক দিক থেকে এই সরকার বহুগুণ ব্যাপক হবে বলে সামরিক প্রক্রিয়ায় একে পরাজিত করা অধিকতর কষ্টসাধ্য হবে। রাষ্ট্রোত্তর নিরাপত্তা বিধানের কার্যে উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য এই সরকার যুদ্ধের এক অন্যতম প্রধান কারণ জাতীয় প্রাধান্যের উপর জোর দেবার মারাত্মক প্রবণতার হাত এড়াতে পারবে।

রাশিয়াকে বাদ দিয়ে কোন রাষ্ট্রোত্তর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এর কাজের

আন্তরিকতার পরিণামের উপরই এর শান্তিপ্রীতির স্বরূপ নির্ভর করবে। রাশিয়া যাতে এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার উপর জোর দেবার ইচ্ছা সর্বদাই প্রকট রাখতে হবে। রাশিয়া এবং রাষ্ট্রোত্তর প্রতিষ্ঠানের সদস্য-রাষ্ট্র, সকলের কাছেই যেন এটা সমভাবে স্পষ্ট হয় যে, কোন জাতি প্রস্তাবিত সঙ্ঘে যোগদান না করলে তার প্রতি প্রকাশ্য বা পরোক্ষ ভাবে কোন প্রকার শাস্তি বিধান করা হবে না। রাশিয়া গোড়াতে যোগদান না করলেও পরে যখন তাদের ইচ্ছা হবে তারা যোগদান করলে পূর্ণ সমাদরে গৃহীত হবে—এ সম্বন্ধে তারা যেন নিশ্চিত থাকে। প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টাদের এ কথা বোঝা উচিত যে, রাশিয়ার অনুরক্তি লাভ করাই তাঁদের অন্তিম লক্ষ্য।

এগুলি হল নিষ্কর্ষ। তবে রাশিয়াকে সম্মিলিত হতে প্রবুদ্ধ করতে আংশিক বিশ্ব-সরকারকে কোন্ সুনির্দিষ্ট পথরেখা অনুসরণ করতে হবে, তা ছকে দেওয়া সহজ নয়। তবে নিম্নবর্ণিত দুটি শর্ত যে থাকা প্রয়োজন এ কথা আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি : (ক) নবীন সংগঠনে গোপন সামরিক তথ্য বলে কিছুই থাকবে না, এবং (খ) প্রস্তাবিত সংগঠনের প্রতিটি অধিবেশন, যেখানে এর আইন-কানুনের খসড়া রচিত এবং সেগুলি আলোচিত ও গৃহীত হবে এবং যেখানে এর নীতি নির্ধারিত হবে, সেখানে রাশিয়ার তরফ থেকে পর্যবেক্ষক দল প্রেরণের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। এর পরিণামে বিশ্বের অধিকাংশ সন্দেহ উৎপাদনের উৎস—গোপনীয়তার কারখানাটি ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে।

সামরিক গোপনতাবিহীন রাজ্য-ব্যবস্থার কথা বলে হয়তো জঙ্গী মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের অপমান করা হবে। তাঁদেরকে বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছে যে, এইভাবে গুপ্ত তথ্য অপাবৃত হলে কোন জঙ্গী মনোবৃত্তি সম্পন্ন জাতি সমগ্র বিশ্ব জয় করে ফেলবে। (পারমাণবিক বোমার তথাকথিত গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে আমি ধরে নিচ্ছি যে, রুশদেশীয়রা অত্যল্পকালের ভিতরই স্বীয় প্রচেষ্টায় এ রহস্য ভেদ করবে।) মেনে নেওয়া গেল যে, সামরিক তথ্য গোপন না থাকলে বিপদাশঙ্কা আছে। তবে যথেষ্টসংখ্যক রাষ্ট্র তাদের শক্তি একত্র করলে তাদের পক্ষে এ ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব; কারণ পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় তাদের নিরাপত্তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। এবং এর পরিণামস্বরূপ ভয়, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস হ্রাস পাওয়ায় অধিকতর নিশ্চিন্ততার সঙ্গে এরূপ পদক্ষেপ করা যাবে। সার্বভৌম রাষ্ট্রের আধারে গঠিত পৃথিবীতে যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনাজনিত উত্তেজনার স্থান নেবে শান্তির প্রতি বিশ্বাসপ্রসূত নিত্য-বর্ধনশীল নিরুদ্বিগ্নতা। কালক্রমে এই ব্যাপার রুশ জনসাধারণকে এরূপ আকর্ষণ করবে যে পশ্চিমের প্রতি তাদের নেতৃবৃন্দের মনোভাব নরম হয়ে আসবে।

আমার মতে রাষ্ট্রোত্তর নিরাপত্তা সংগঠনের সদস্যপদ কোন রকম খেয়ালমাফিক

গণতান্ত্রিক মানের উপর আধারিত হওয়া বিধেয় নয়। প্রত্যেককে শুধু এইটুকু ব্যবস্থা করতে হবে যে, রাষ্ট্রোত্তর সংগঠনের পরিষদ বা ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিবৃন্দ যেন প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্রের জনসাধারণ কর্তৃক গুপ্ত ভোট দ্বারা নির্বাচিত হন। এইসব প্রতিনিধি কোন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার পরিবর্তে জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় হবেন এবং এর ফলে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের শান্তিকামী চারিত্র-ধর্মের অভিবৃদ্ধি হবে।

এতদতিরিক্ত আর কোন্ কোন্ গণতান্ত্রিক লক্ষ্য বজায় রাখতে হবে, আমার মতে সে সম্বন্ধে পরামর্শ দান অনাবশ্যক। গণতান্ত্রিক বিধি-পদ্ধতি এবং মানদণ্ড সমূহ ঐতিহাসিক বিকাশক্রমের পরিণামস্বরূপ এবং যে-সব দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলিত, তারাও সর্বদা গণতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে সচেতন নয়। অতএব গণতন্ত্রের যথাভিরুচি মানদণ্ড প্রবর্তন করলে পাশ্চাত্ত্য ও সোভিয়েট ব্যবস্থার মধ্যে আদর্শগত মতবৈষম্য ব্যাপকতর হবে মাত্র।

এখন কিন্তু আদর্শগত মতভেদ পৃথিবীকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে না। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি পশ্চিমী রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে সমাজবাদ গ্রহণ করলেও, পূর্ব ও পশ্চিমের ভিতর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সক্রিয় থাকার সম্ভাবনাই সমধিক। প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি যে প্রচণ্ড আসক্তি প্রকাশ করা হয়ে থাকে, আমার মতে তার কোন ভিত্তি নেই। আমেরিকার অর্থনৈতিক জীবন আজকের মত মুষ্টিমেয় জনকয়েকের কবলিত থাকবে, না, এই মুষ্টিমেয়-সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হবে—এ ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ হলেও এমন গুরুতর নয়, যার জন্য একে কেন্দ্র করে যে-সব মনোমালিন্য প্রকট হচ্ছে তার সমর্থন করা যায়।

আমি দেখতে চাই যে, রাষ্ট্রোত্তর সংগঠনের প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্র তাঁদের যাবতীয় সামরিক বাহিনী সম্মিলিত করুন এবং তাঁদের নিজেদের কর্তৃত্বে শুধু স্থানীয় পুলিস বাহিনী রাখুন। তারপর আমি চাই যে, এইসব বিভিন্নদেশীয় বাহিনীর সংমিশ্রণ হোক এবং পুরাতন অষ্ট্রো-হাঙ্গারীয়ান সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর মত বিভিন্ন দেশে এরা ছড়িয়ে পড়ুক। অষ্ট্রো-হাঙ্গারীয়ান সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কোন এক অঞ্চলের অধিবাসী সিপাহী ও সেনানায়কবর্গকে কেবল নিজ নিজ প্রদেশে না রাখার নীতি গ্রহণ করলে তাদের দিয়ে সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হবে। তবে আঞ্চলিক বা সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসংবাদ হবার আশঙ্কা থাকলে তখন ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হত।

রাষ্ট্রোত্তর ব্যবস্থার কর্তৃত্ব বিশুদ্ধ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকুক, এই আমি দেখতে চাই। এ সম্ভব হবে কি না, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ভাবে জানি না। ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতায় হয়তো দেখা যাবে যে, আর্থিক ক্ষেত্রে কিছুটা কর্তৃত্ব রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ এ কালে আর্থিক কারণে জাতীয় স্তরে নানারকম বিপর্যয় ঘটতে

পারে, যার মধ্যে প্রচণ্ড হিংস্র সংঘর্ষের বীজ লুক্কায়িত থাকা সম্ভব। তবে আমি চাই যে, এর কাজ কেবল সামরিক ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। আমি এও চাই যে, এই রাজ্য-ব্যবস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে গড়ে উঠুক। শান্তির খোঁজে ধারাবাহিকতাকে নষ্ট করার প্রয়োজন যেন না ঘটে।

রাশিয়া বিবর্জিত অথবা রাশিয়া সহ বিশ্বসরকার গঠন করার অসীম অসুবিধার কথা আমি নিজের কাছ থেকে গোপন করতে চাই না। এর বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি সচেতন। তা ছাড়া আমি চাই না যে, রাষ্ট্রোত্তর সংস্থায় যোগদানকারী কোন রাষ্ট্রের পরে পৃথক্ হয়ে যাবার অধিকার থাকুক। অতএব এর অন্যতম আশঙ্কাজনক পরিণাম হচ্ছে গৃহযুদ্ধ। তবে আমি এ কথাও বিশ্বাস করি যে, কালক্রমে বিশ্বসরকার গঠিত হবেই। শুধু প্রশ্ন হচ্ছে, এর জন্য আমরা কতটা দাম দেব? আমার মনে হয়, আর একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলে তার পরিণামেও বিশ্বসরকার গঠিত হবে। তবে যুদ্ধের ফলে এই-জাতীয় বিশ্ব সরকার গঠিত হলে এ সরকারের জনক হবে বিজয়ী পক্ষ। বিজেতার সামরিক শক্তি হবে এর মূলাধার এবং সেইজন্য মানবজাতিকে স্থায়ী ভাবে জঙ্গী রূপ দিয়েই শুধু এই বিশ্বসরকার চিরজীবী হবে।

তবে আমি এ কথাও বিশ্বাস করি যে, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং কেবল প্রবর্তনা শক্তির মাধ্যমেই বিশ্বসরকার মূর্ত হতে পারে। সেইজন্য এই পন্থা অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ের মার্গ। তবে এই পন্থায় উদ্দেশ্যপূর্তি করতে হলে কেবল যুক্তিবাদের কাছে আবেদন করাই যথেষ্ট নয়। প্রাচ্যের কম্যুনিস্ট প্রথার একটি বিশেষ শক্তি হচ্ছে এই যে, এর ভিতর এক-জাতীয় ধর্মবিশ্বাসের ভাব আছে এবং সাম্যবাদীরা কতকটা ধর্মীয় উন্মাদনায় অনুপ্রেরিত হয়ে কাজ করেন। ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে রচিত শান্তির আদর্শ এই-জাতীয় ধর্মীয় অনুপ্রেরণা দ্বারা পরিপুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এর সাফল্যের আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। মানবজাতিকে নৈতিক শিক্ষা দেবার পবিত্র কর্তব্য যাঁদের উপর বর্তেছে, তাঁদের সম্মুখে আজ এক মহান্ দায়িত্বভার এবং সুযোগ সমুপস্থিত। আমার মনে হয় পরমাণু-বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কেবল যুক্তির দোহাই দিয়ে তাঁরা আমেরিকার জনসাধারণকে পারমাণবিক যুগের সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করতে পারবেন না। এর সঙ্গে ধর্মের মৌলিক উপাদান—হৃদয়াবেগের গভীর শক্তি সংযুক্ত হওয়া চাই। আশা করব যে, কেবল ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিই নয়, স্কুল, কলেজ এবং জনমত সৃষ্টি করার প্রতিটি মুখ্য প্রতিষ্ঠান যোগ্যতা সহকারে তাঁদের এতদ্বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।

[১৯৪৭]

জঙ্গী মনোবৃত্তি

আমার মতে বর্তমান পরিস্থিতির চাবিকাঠি রয়েছে এই উপলব্ধির ভিতর যে, আমাদের সম্মুখস্থ সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা সমীচীন নয়। প্রথমতঃ নিম্নবর্ণিত প্রশ্নটির পর্যালোচনা করা যাক: এখন থেকে জ্ঞান আহরণ এবং গবেষণা-কার্যের প্রতিষ্ঠান সমূহকে অধিকতর মাত্রায় সরকারী অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করতে হবে; কারণ নানা কারণে বেসরকারী সূত্রের সাহায্য চাহিদা পূর্ণ করার পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তা হলে করদাতৃবর্গের কাছ থেকে এতদুদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ বিতরণের ভার সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করা কি কোনক্রমেই সংগত? এর উত্তরে প্রত্যেকটি বিবেচক ব্যক্তিই নিশ্চয় বলবেন, "না।" কারণ এ কথা স্পষ্ট যে, সর্বাপেক্ষা হিতকর কার্যের জন্য অর্থবিতরণরূপী অতীব দুরূহ কর্মভার এমন সব ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত, যাঁদের শিক্ষা ও জীবনের কর্ম এই সাক্ষ্য বহন করে যে তাঁরা বিজ্ঞান এবং বিদ্যাবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু জানেন।

অবশ্য যুক্তিশীল ব্যক্তিরা যদি সংগৃহীত অর্থের অধিকাংশ সামরিক বিভাগ কর্তৃক বিতরিত হবার নীতি পছন্দ করেন তা হলে বুঝতে হবে যে এর কারণ হচ্ছে, তাঁরা তাঁদের সাধারণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের বেদীমূলে সংস্কৃতির বিকাশকে বলিদান করেছেন। সুতরাং এই সব ব্যাবহারিক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ, তাদের জন্মসূত্র ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। এই কার্যে অগ্রসর হলে অনতিবিলম্বেই আমরা দেখতে পাব যে, আলোচ্য সমস্যা বহুর ভিতর এক ছাড়া আর কিছু নয় এবং বিস্তীর্ণতর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেই তবে এর যথোচিত মূল্যায়ন এবং সমুচিত নিষ্পত্তি সম্ভবপর।

পূর্বোক্ত মনোবৃত্তি আমেরিকাতে অজানাই ছিল। বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে যখন সামরিক লক্ষ্য পূর্তির জন্য যাবতীয় উপাদানের কেন্দ্রীকরণ হল, তখনই এর সৃষ্টি হল। সেই থেকে বেশ জোরালো জঙ্গী মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়েছে এবং যুদ্ধে প্রায় একরকম আকস্মিক ভাবে জয়লাভ করার পর এই মনোভাব আরও প্রবল হয়ে উঠল। এই মনোভাবের বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে বারট্রাণ্ড রাসেল কথিত "নগ্ন শক্তি"। এতদনুযায়ী মানুষ জাতি সমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আর সব কিছুর উপর এই "নগ্ন শক্তিকেই" প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বিশেষতঃ বিসমার্কের সাফল্যে বিভ্রান্ত হয়ে জার্মানরা তাদের মনোভাবের এই-জাতীয় রূপান্তর ঘটিয়েছিল এবং তার পরিণাম স্বরূপ এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

আমি প্রকাশ্য ভাবেই স্বীকার করছি যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাবসানের পরবর্তীকালীন পররাষ্ট্র নীতি মাঝে মাঝে আমাকে অপ্রতিরোধ্য ভাবে দ্বিতীয়

কাইজার উইলহেলমের অধীন জার্মানীর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে এবং আমি জানি যে আমার কথা বাদ দিলেও আরও অনেকের মনে এই উপমা অত্যন্ত বেদনাজনক ভাবে উদ্রিক্ত হয়েছে। জঙ্গী মনোবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মানবেতর উপাদানকে (যথা, পারমাণবিক বোমা, সামরিক গুরুত্বযুক্ত ঘাঁটি, সর্ববিধ মারণাস্ত্র এবং কাঁচা মালের মালিকানা ইত্যাদি) সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়, অথচ মানুষ এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-ভাবনা, অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে মনোবৈজ্ঞানিক উপাদান সমূহকে গুরুত্ববিহীন ও গৌণ বিবেচনা করা হয়। এইখানে মার্কস্‌বাদের সঙ্গে (শুধু এর তাত্বিক দিকের কথা বিবেচনা করলে) এর বেশ খানিকটা সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যক্তিকে নিছক এক যন্ত্রের পর্যায়ে টেনে নামানো হয়, সে তখন "মানব উপকরণে" পরিণত হয়। এই দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক আদর্শ অদৃশ্য হয়ে যায়। এর পরিবর্তে জঙ্গী মনোভাব "নগ্ন শক্তিকেই" বরং এক আদর্শের পর্যায়ে উন্নীত করে। এ যাবত মানুষ যে সব অদ্ভুত মোহের বশীভূত হয়েছে, নিঃসন্দেহে এ তার অন্যতম।

এ যুগে আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রের তুলনায় আক্রমণাত্মক প্রহরণসমূহ বহুগুণ ভয়াবহ হয়ে গেছে বলে জঙ্গী মনোবৃত্তি আজ আরও বেশী বিপজ্জনক। এইজন্য বাধ্য হয়ে নিবর্তক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। আর এর সহচর সর্বব্যাপক অনিরাপত্তার ভাব অবশেষে রাষ্ট্রের কল্পিত মঙ্গলকামনার জন্য দেশবাসীর নাগরিক অধিকারকে বলি দিয়ে থাকে। ডাইনী পোড়ানোর আধুনিক রাজনৈতিক রূপ ও সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ (যথা শিক্ষাদান, গবেষণা কার্য, সংবাদপত্র ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ) অপরিহার্য প্রতীয়মান হয় এবং এই জন্য এই সব ব্যবস্থা তেমন ভাবে জনমতের বিরোধিতার সম্মুখীন হয় না। জঙ্গী মনোবৃত্তি না থাকলে জাগ্রত জনমত আত্মরক্ষার একটা রাস্তা খোলা রাখত। ক্রমশঃ সর্ববিধ মূল্যবোধের নব মূল্যাঙ্কন হয়। যা কিছু প্রত্যক্ষ ভাবে এই অবাস্তব লক্ষ্য পরিপূরণের সহায়ক নয়, তাদের নিম্নশ্রেণীর বিবেচনা করা হয়।

রাষ্ট্রোত্তর ব্যবস্থার ভিত্তিতে নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা ব্যতীত বর্তমান ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্তি পাবার অন্যবিধ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সততাযুক্ত ও সাহসিকতাপূর্ণ কার্যনীতি আমার চোখে পড়ে না। আমরা আশা করব যে, বাহ্য পরিস্থিতি যতদিন এই দেশের উপর এক মুখ্য ভূমিকা চাপিয়ে দেবে, ততদিন জাতিকে এই পথে পরিচালিত করার জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় এবং যথোপযুক্ত নৈতিক শক্তি বিশিষ্ট মানুষের অভাব হবে না। তখন আর পূর্বোক্ত প্রকারের সমস্যার অস্তিত্ব থাকবে না।

[১৯৪৭]

রাশিয়ান আকাদমির সদস্যবর্গের সঙ্গে পত্র বিনিময়

একটি খোলা চিঠি : ডঃ আইনস্টাইনের ভ্রমাত্মক ধারণা

প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন শুধু তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহের জন্য বিখ্যাত নন। ইদানীং তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাবলীর প্রতিও যথেষ্ট মনোনিবেশ করেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বেতার মারফত বক্তৃতা দিয়ে থাকেন এবং সংবাদপত্রে নিবন্ধও লেখেন। তিনি একাধিক জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে বহুবার তাঁর কণ্ঠ প্রতিবাদমুখর হয়েছিল। তিনি স্থায়ী শান্তির প্রচারক, নূতন যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেছেন এবং আমেরিকার বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধবাজদের করায়ত্ত করার আকাঙ্ক্ষারও তিনি বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

ডঃ আইনস্টাইনের অবস্থা সর্বদা বাঞ্ছিত মানদণ্ড অনুযায়ী যুক্তিসংগত ও অস্পষ্টতা-বিহীন না হলেও সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক মহল এবং সোভিয়েট জনসাধারণ বৈজ্ঞানিকপ্রবরের এবংবিধ কার্যকলাপের মূল প্রেরণা—তাঁর মানবতাবোধের প্রশংসা করেন। তবে আইনস্টাইনের কতিপয় সাম্প্রতিক উক্তির ভিতর এমন উপাদান আছে, আমাদের মতে যা শুধু ভ্রান্তই নয়, বরং তিনি যে শান্তির আদর্শের এমন প্রবল সমর্থক, তাঁর পূর্বোল্লিখিত উক্তিগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে তার ঘাতকও বটে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার সর্বাপেক্ষা কার্যকুশল কর্মপদ্ধতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের স্পষ্টীকরণের জন্য এই সব উক্তির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করছি। ডঃ আইনস্টাইন সম্প্রতি যে "বিশ্ব সরকারের" পরিকল্পনা প্রচার করেছেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাকে বিবেচনা করতে হবে।

এই পরিকল্পনাকে মনের আনন্দে সাম্রাজ্য বিস্তারের ছদ্মাবরণ রূপে ব্যবহারকারী গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীরা ছাড়াও এই পরিকল্পনার পথিকৃৎদের সহগামী রূপে পুঁজিবাদী দেশসমূহের যথেষ্ট সংখ্যক বুদ্ধিজীবীও আছেন। এঁরা এ প্রস্তাবের আসল তাৎপর্য উপলব্ধি করেন নি। তাই এই পরিকল্পনার আপাতমনোহর সম্ভাবনার জালে বন্দী হয়ে রয়েছেন। এই সব শান্তিবাদী এবং উদারমতাবলম্বী ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন যে, "বিশ্ব সরকার" বিশ্বের যাবতীয় দুর্গতি নিবারণের ফলোপধায়ক ভেষজ ও শান্তির তত্ত্বাবধায়ক।

"বিশ্ব সরকারের" প্রবক্তারা এই আপাত-প্রগতিশীল যুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ করে থাকেন যে, এই পারমাণবিক যুগে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অতীতের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদে বেলজিয়ামের প্রতিনিধি স্প্যাকের বক্তৃতার প্রতিধ্বনি করে তাঁরা বলেন যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের কল্পনা আজ

"সেকেলে", এমনকি "প্রতিক্রিয়াশীল"ও বটে। এত বড় অসত্য অভিযোগের কথা চিন্তাই করা যায় না।

প্রথমতঃ, "বিশ্ব সরকার" ও "রাষ্ট্রোত্তর ব্যবস্থার" কল্পনা কোনক্রমেই পারমাণবিক যুগের অবদান নয়। এগুলির আয়ু আরও বেশী। লীগ অফ নেশনস্ প্রতিষ্ঠিত হবার সময় এই সব কল্পনা উপস্থাপিত করা হয়।

তা ছাড়া পূর্বকথিত কল্পনাগুলিকে আজকের এই আধুনিক যুগে মোটেই প্রগতিশীল আখ্যা দেওয়া যায় না। এগুলি হচ্ছে একচেটিয়া অধিকার বিশিষ্ট পুঁজিপতিদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। শিল্পসমৃদ্ধ প্রধান প্রধান দেশগুলির আসল প্রভু এই সব পুঁজিপতিদের কাজে জাতীয় সীমারেখা অত্যন্ত সংকুচিত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাদের বিশ্বজোড়া বাজার, কাঁচা মালের বিশ্বব্যাপী আড়ত এবং বিশ্বজোড়া পুঁজি লগ্নী করার ক্ষেত্র চাই। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভুত্বের দৌলতে বৃহৎ শক্তিবর্গের একচেটিয়া স্বার্থ আজ রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাদের প্রভাবের এলাকা নির্ধারণের লড়াইয়ে প্রয়োগ করতে সক্ষম। এই একই পদ্ধতিতে তারা অন্য দেশকে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পদানত করে সে দেশেও নিজেদের দেশেরই মত অবাধে প্রভু হয়ে জাঁকিয়ে বসে।

আমাদের নিজেদের দেশের অতীত অভিজ্ঞতার দৌলতে আমরা এ কথা ভাল করেই জানি। জারের আমলের রাশিয়ায় এক প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং সরকার তখন দাসোচিত বিনয় সহকারে পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকত। তাই সে সময় রাশিয়ায় স্বল্প পারিশ্রমিকের শ্রমিক ও বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ্ বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রচণ্ড ভাবে প্রলুব্ধ করত। ফরাসী, ব্রিটিশ, বেলজিয়ান এবং জার্মান ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে তখন এ দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। মৃত জীবের দেহোপরি উপবিষ্ট শকুনের ন্যায় তাদের ভিতর মহোৎসব পড়ে গিয়েছিল। এরা এমন ভীষণ মুনাফা লুটত যা তাদের নিজেদের দেশে কল্পনারও অতীত। জারের রাশিয়াকে তারা পশ্চিমী পুঁজিপতিদের সঙ্গে ঋণ-বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ ঋণ আবার জোর করে উশুল করা হত। বৈদেশিক ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত অর্থবলে বলীয়ান হয়ে জারতন্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনকে বীভৎস ভাবে পদদলিত করত, রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করত এবং ইহুদী-বিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্ররোচনা দিত।

বিশ্বের পুঁজিবাদী একচ্ছত্রাধিপতিদের সঙ্গে আমাদের দেশ যে শৃঙ্খলপাশে আবদ্ধ ছিল, অক্টোবরের মহান্ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাকে শতধাবিচ্ছিন্ন করে দিল। সোভিয়েট সরকার আমাদের দেশকে সর্বপ্রথম সত্যকার স্বাধীন ও মুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করল, আমাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা যন্ত্রকৌশল, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রগতি সাধন করল। এই প্রগতির গতির তুলনা ইতিহাসে সুদুর্লভ। সোভিয়েট সরকারের

প্রয়াসের ফলে আজ আমাদের দেশ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য দুর্গ স্বরূপ। গৃহযুদ্ধ, একদল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে আমাদের স্বদেশবাসী দেশমাতৃকার স্বাধীনতার নিশান চির-উন্নত রেখেছে।

এত সব হবার পর এখন "বিশ্ব-রাষ্ট্রের" ধ্বজাধারকেরা "বিশ্ব সরকার" গঠনের জন্য আমাদেরকে স্বেচ্ছায় এই স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে বলছেন। এই "বিশ্ব সরকার" গঠন পরিকল্পনা পুঁজিবাদী একচ্ছত্রাধিপতিদের বিশ্ব-নিয়ামক হবার আকাঙ্ক্ষার উচ্চকণ্ঠ বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদেরকে এই রকম কিছু করতে বলা সুস্পষ্ট মূঢ়তা ভিন্ন অপর কিছু নয়। আর শুধু সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষেত্রেই যে এ-জাতীয় দাবি অর্থহীন তা নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর একাধিক দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিপীড়ন ও দাসত্ব-নিগড়-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভে সক্ষম হয়েছে। এই সকল দেশের জনসাধারণ নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বদেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে দৃঢ়মূল করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। এ ছাড়া উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে দ্রুতগতিতে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন-প্রবাহ প্রসার লাভ করায় সে সকল দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের ভিতর জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়েছে এবং তারা আর ক্রীতদাস রূপে জীবন অতিবাহিত করতে প্রস্তুত নয়।

সাম্রাজ্যবাদী দেশ সমূহের একচ্ছত্রাধিপতিদের কবল থেকে শোষণের একাধিক লাভজনক ক্ষেত্রের অধিকার চলে গেছে এবং এক্ষেত্রে আরও লোকসানের সম্ভাবনা আছে। উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা এই সব একচ্ছত্রাধিপতিদের কাছে বিরক্তিকর বলে তারা তাদের কবলমুক্ত দেশগুলিকে স্বাধীনতাচ্যুত করতে সর্ববিধ প্রয়াস করছে এবং পরাধীন দেশগুলির সত্যকার মুক্তি-আন্দোলনে বাধা দিচ্ছে। নিজের অভীষ্ট পূরণের জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা বহু বিচিত্র আয়ুধের শরণ নিচ্ছে। সামরিক, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং আদর্শগত রণ—কিছুই বাদ পড়ছে না।

এই সামাজিক নির্দেশনামার পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ-বিশারদরা জাতীয় সার্বভৌমত্বের মূল ভাবধারার উপরই মসী লেপন করার প্রযত্ন করছেন। এর অন্যতম প্রক্রিয়া হচ্ছে "বিশ্বরাষ্ট্র" পরিকল্পনার মায়া-মরীচিকা। প্রচার করা হচ্ছে যে, এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও রাষ্ট্রগত বিরোধ বিদূরিত হবে এবং বিশ্ব-বিধানের বিজয় সূচিত হবে।

বিশ্বজয়ের লিপ্সাপ্রমত্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সর্বগ্রাসী বুভুক্ষা এইভাবে এক তথাকথিত প্রগতিশীল আদর্শের ছদ্মাবরণের অন্তরালে আত্মগোপন করে পুঁজিবাদী

দেশসমূহের কিছুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক, লেখক ও অন্যান্য শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করেছে।

গত সেপ্টেম্বরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গকে উদ্দেশ্য করে লিখিত একটি খোলা চিঠিতে ডঃ আইনস্টাইন জাতীয় সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত করার এক নবীন পরিকল্পনা পেশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সাধারণ পরিষদকে পুনর্গঠিত করে একটি স্থায়ী বিশ্ব পার্লামেণ্টের রূপ দেওয়া হোক। এর ক্ষমতা বর্তমান নিরাপত্তা পরিষদের তুলনায় অনেক বেশী হওয়া চাই। কারণ ডঃ আইনস্টাইনের মতে (আর এই কথাটা আমেরিকার কূটনীতিবিশেষজ্ঞরা দিন-রাত বলে বেড়াচ্ছেন) ভেটো ক্ষমতার অস্তিত্বের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ এক রকম পঙ্গু হয়ে পড়েছে। ডঃ আইনস্টাইনের পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনর্গঠিত সাধারণ পরিষদের হাতে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে এবং এইভাবে বৃহৎ শক্তিসমূহের একমত হবার আদর্শকে বর্জন করা যেতে পারে।

ডঃ আইনস্টাইনের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ আজকের মত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন না। তাঁরা জনপ্রিয় নির্বাচন-ব্যবস্থা দ্বারা মনোনীত হবেন। প্রথম নজরে এ প্রস্তাবকে প্রগতিশীল, এমনকি মৌলিকতাবিশিষ্ট বলে প্রতীয়মান হবে। তবে বাস্তবক্ষেত্রে এর দ্বারা বর্তমান অবস্থার কোন রকম উন্নতি বিধান হবে না।

বাস্তবক্ষেত্রে এই "বিশ্ব পার্লামেণ্টের" নির্বাচন কী রূপ পরিগ্রহ করবে, তার কল্পনা করা যাক।

আজও মানবসমাজের এক বিরাট অংশ উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশ সমূহের অধিবাসী এবং সেখানে এখনও কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রাজপ্রতিনিধি, সৈন্য-বাহিনী, পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের অবাধ রাজত্ব। সে সব দেশে "জনপ্রিয় নির্বাচনের" সত্যকার অর্থ হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তা বা সামরিক কর্তৃপক্ষ মনোনীত প্রতিনিধির নির্বাচন। উদাহরণের জন্য খুব বেশী দূর যেতে হবে না। গ্রীসে ব্রিটিশ বেয়নেটের ছত্রছায়ায় রাজতন্ত্রবাদী ফ্যাসিস্ট শাসকবর্গ যে গণভোটের প্রহসনের অনুষ্ঠান করেন, তার কথা চিন্তা করলেই পূর্বোক্ত অভিমতের সারবত্তা প্রতীয়মান হবে।

তবে যে সব দেশে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার বিদ্যমান, সেখানেও খুব একটা কিছু ভাল অবস্থা হবে না। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে পুঁজিরই প্রাধান্য। অতএব সেই সব দেশে পুঁজি এমন সব হাজার রকমের কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে, যার ফলে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও ব্যালট-বাক্সের স্বাধীনতা এক প্রহসনে পরিণত হয়। আইনস্টাইন নিশ্চয়

অবগত আছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের বিগত নির্বাচনে শতকরা মাত্র ঊনচল্লিশ জন ভোট দেবার অধিকার প্রয়োগ করে। তিনি নিশ্চয় এ কথা জানেন যে, দক্ষিণী রাষ্ট্রসমূহের লক্ষ লক্ষ নিগ্রো কার্যতঃ ভোটাধিকার হতে বঞ্চিত অথবা প্রায়ই লিঞ্চিংয়ের ভয় দেখিয়ে তাদের উৎকট নিগ্রো-বিদ্বেষীকে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়। সিনেটর বিলবো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দেশান্তর হতে আগত লক্ষ লক্ষ অধিবাসী, দেশান্তরিত শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকদের ভোটাধিকার বঞ্চিত করার জন্য 'জিজিয়া' কর এবং বিশেষ পরীক্ষা ইত্যাদি বহুবিধ অন্যপ্রকার পদ্ধতির শরণ নেওয়া হয়। ভোট ক্রয় করার ব্যাপক পদ্ধতি এবং জনগণকে প্রভাবিত করার শক্তিশালী প্রহরণ কোটিপতি পরিচালিত প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র সমূহের কার্যকলাপের কথা এখানে আর আমরা উল্লেখ করব না।

পুঁজিবাদী দেশ সমূহের বর্তমান অবস্থায় বিশ্ব পার্লামেণ্টে ডঃ আইনস্টাইন কথিত জনপ্রিয় নির্বাচনের কী পরিণাম হবে, উপরিউক্ত তথ্যাবলী থেকে তা স্পষ্ট ভাবে অনুমিত হয়। এর রূপ বর্তমান সাধারণ পরিষদের চেয়ে মোটেই উন্নত হবে না। এ হবে জনগণের সত্যকার ভাব-ভাবনা, স্থায়ী শান্তির জন্য তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিকৃত প্রতিবিম্ব।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সদস্যবর্গের অধিকাংশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীল, ওয়াশিংটনের প্রয়োজনানুসারে তারা নিজ দেশের পররাষ্ট্রনীতি সঞ্চালিত করিতে বাধ্য থাকে। তাদের কৃপায় সাধারণ পরিষদে ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কমিটীতে আমেরিকার প্রতিনিধিবর্গের হাতে ভোট-দানের এক সুব্যবস্থিত যন্ত্র এসে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ, লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি রাষ্ট্রের অবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে। ওই সব দেশের কৃষিব্যবস্থায় একটি মাত্র ফসল উৎপাদিত হয় বলে উৎপন্ন শস্যের মূল্য-নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের হাত পা আমেরিকার একচেটিয়া কারবারীদের কাছে বাঁধা। এই অবস্থায় আমেরিকার প্রতিনিধিবর্গের চাপে সাধারণ পরিষদে আমেরিকার হাতে আনুষ্ঠানিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এসে গেলে এবং পরিষদের সত্যকার মালিকের নির্দেশ পালন করার জন্য পরিষদ মার্কিন স্বার্থের অনুকূলে ভোট দিলে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

অনেক সময় দেখা যায় যে, আমেরিকার কূটনীতি স্টেট ডিপার্টমেণ্টের পরিবর্তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পতাকার আবরণে নিজেদের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা কাম্য মনে করে। কুখ্যাত বলকান্ কমিটী বা কোরিয়ার নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী কমিশনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেণ্টের একটি বিভাগে পরিণত করার অভিপ্রায়ে আমেরিকার প্রতিনিধিমণ্ডলী "ক্ষুদ্র পরিষদ" গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে

পড়েছেন। নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ শক্তিবর্গের মতৈক্য প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি পূর্ণ করার পথে তাই নিরাপত্তা পরিষদ বাধা বলে বিবেচিত হচ্ছে, সেই জন্য তার পরিবর্তে এই "ক্ষুদ্র পরিষদের" পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হয়েছে।

আইনস্টাইনের প্রস্তাবের পরিণাম একই হবে এবং এই ভাবে স্থায়ী শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হবার পরিবর্তে এই পরিকল্পনা বৈদেশিক পুঁজির "উচিত" মুনাফা সৃষ্টিতে বাধা প্রদানকারী জাতি সমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালন করার এক ছদ্মাবরণ বলে প্রমাণিত হবে। এর ফলে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের লাগামহীন বিস্তৃতি হতে থাকবে এবং যে সকল জাতি নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে চায় তারা আদর্শবাদের ক্ষেত্রে সহায়শূন্য হবে।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের ফলে আইনস্টাইন আজ বস্তুতঃ শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চরম শত্রুবর্গের পরিকল্পনা ও গোপন অভিপ্রায়ের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছেন। এই দিকে ইতোমধ্যে তিনি এতখানি অগ্রসর হয়ে পড়েছেন যে তিনি তাঁর খোলা চিঠিতে পূর্ব হতেই এই মর্মে ঘোষণা করেছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নকে বাদ দিয়েই অন্যান্য জাতির এ পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবার অধিকার আছে। তবে তিনি বলেছেন যে, সদস্য বা "পর্যবেক্ষক" হিসাবে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন যাতে এতে যোগদান করে তার জন্য প্রস্তাবিত বিশ্ব সরকারের দ্বার সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে খোলাই থাকবে।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ্য মুখপাত্রদের কাছ থেকে আইনস্টাইন বাস্তব ক্ষেত্রে যত দূরেই বিরাজিত থাকুন না কেন, তাঁর প্রস্তাবের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের উদ্‌ঘোষকারীদের প্রস্তাবের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। তাঁর সুপারিশের সার কথা হচ্ছে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা সম্ভব না হয়, ওই প্রতিষ্ঠানকে যদি সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা ও গোপন অভিসন্ধি ঢাকবার আবরণ রূপে ব্যবহার করা না যায়, তা হলে একে ভেঙে ফেলে এর পরিবর্তে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অপরাপর নূতন গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে বাদ দিয়েই এক নবীন "আন্তর্জাতিক" সংস্থা খাড়া করতে হবে।

আইনস্টাইন কি উপলব্ধি করতে পারছেন না যে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে এ-জাতীয় পরিকল্পনার পরিণাম কী রকম ভয়াবহ হবে?

আমাদের বিশ্বাস ডঃ আইনস্টাইন এক অলীক ও বিপদসঙ্কুল পথ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অধ্যুষিত বিশ্বে তিনি এক "বিশ্বরাষ্ট্রের" মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করছেন। অবশ্য সংযত ভাবে এই সব বিরোধের সম্মুখীন হতে পারলে সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোর পার্থক্য সত্ত্বেও কেন যে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সব রাষ্ট্র পরস্পরের সহযোগিতা করতে

পারবে না, তা বুঝে উঠতে পারা যায় না। কিন্তু আইনস্টাইন এমন এক অবাস্তব রাজনৈতিক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছেন, যা সত্যকার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও স্থায়ী শান্তির পয়লা নম্বরের দুষমনদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সদস্য রাষ্ট্রবর্গকে তিনি এবংবিধ কার্যসূচি গ্রহণ করতে বলছেন, যার ফলে অধিকতর মাত্রায় আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংস্থাপিত না হয়ে নবতর আন্তর্জাতিক জটিলতার সৃষ্টি হবে। এর ফলে কেবল পুঁজিবাদী একচ্ছত্রাধিপতিরাই লাভবান হবেন; কারণ তাঁদের কাছে নূতন আন্তর্জাতিক জটিলতার অর্থ হচ্ছে অধিকতর মাত্রায় যুদ্ধের কাজকর্মের ঠিকাদারী ও অধিকতর মুনাফা।

প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় যথাসাধ্য ক্রিয়াশীল জনসেবক রূপে আইনস্টাইনকে আমরা শ্রদ্ধা করি বলে এই ভাবে একান্ত স্পষ্ট ও কূটনৈতিক অলঙ্করণ বিবর্জিত ভাষায় এ সম্বন্ধে বলা আমাদের কর্তব্য বলে বোধ হল।

আলবার্ট আইনস্টাইনের উত্তর

"নিউ টাইমসে" প্রকাশিত একটি খোলা চিঠির মারফত আমার চারজন রুশদেশীয় সহকর্মী আমার বিরুদ্ধে এক সদিচ্ছা-প্রণোদিত আক্রমণের সূত্রপাত করেছেন। আমি তাঁদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করি এবং তাঁরা যেরূপ অকপট ও স্পষ্ট ভাবে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার জন্য তাঁদের আরও বেশী করে প্রশংসা করি। মানুষ যখন নিজের চোখে এই বিশ্ব দেখার সমতুল নিষ্ঠাযুক্ত হয়ে তার বিরুদ্ধপক্ষীয়ের চিন্তা, অভিপ্রায় ও আশঙ্কা উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, তখনই তার পক্ষে মানবীয় বিষয়াবলী প্রসঙ্গে বুদ্ধিমত্তা সহকারে কাজ করা সম্ভবপর হয়। প্রতিটি সদিচ্ছা চালিত মানবের কর্তব্য হচ্ছে ওই-জাতীয় পারস্পরিক বোঝাপড়ার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস করা। আমার রুশ সহকর্মী বা অন্য পাঠকবর্গকে আমি উপরিউক্ত ভিত্তিতেই রুশ সহকর্মীবৃন্দের পত্রের উত্তরে প্রদত্ত আমার বক্তব্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করব। এ বক্তব্য এমন একটি মানুষের নিবেদন, যে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে একটা সম্ভব সমাধান আবিষ্কারের প্রয়াস করছে। তাঁর মনে এমন কোন মোহ নেই যে তিনিই "চূড়ান্ত সত্য" বা "সঠিক পন্থা" জানেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদ সমূহ পাঠে যদি মনে হয় যে আমি কতকটা গোঁড়ামি সহকারে আমার অভিমত ব্যক্ত করেছি, তবে বলব যে বক্তব্যে প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ আনয়নের জন্য আমি এরূপ করেছি।

যদ্যপি আপনাদের পত্রকে মূলতঃ অ-সমাজতন্ত্রী বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের আবরণে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তথাপি আমার বিশ্বাস যে, এই আক্রমণমূলক পদ্ধতির পিছনে এক আত্মরক্ষামূলক মানসিক বৃত্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান। এটা প্রায় সীমাহীন বিবিক্তবাদ (isolationism)

অভিমুখী প্রবণতা ছাড়া আর কিছু নয়। বিগত তিন দশকে বিদেশী রাষ্ট্রের হাতে রাশিয়া ভীষণ ভাবে অত্যাচারিত হয়েছে। বেসামরিক জনসাধারণকে সুপরিকল্পিত ভাবে পাইকারী হারে হত্যার জন্য জার্মান আক্রমণ, গৃহযুদ্ধের সময় বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ, পাশ্চাত্ত্য সংবাদপত্রসমূহে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক কুৎসা রটনা ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার অস্ত্ররূপে হিটলারকে সাহায্য দিয়ে খাড়া করা ইত্যাদি এর নিদর্শন। পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের পূর্বোল্লিখিত কার্যকলাপের কথা উপলব্ধি করলে রাশিয়ার বর্তমান বিবিক্তবাদাভিমুখী মনোবৃত্তি বোঝা কঠিন হয় না। তবে এইভাবে অসম্পৃক্ত থাকার ইচ্ছার কারণ যতই হৃদয়ঙ্গম করা যাক না কেন, এ বৃত্তির ভয়াবহতা তাতে হ্রাস পায় না। রাশিয়া এবং অপরাপর জাতি—সকলের পক্ষেই এ মনোভাব সর্বনাশা। পরে আমি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আমার বিরুদ্ধে আপনাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যস্থল হচ্ছে আমার তরফ থেকে "বিশ্ব সরকার" নীতির সমর্থন। সমাজবাদ ও পুঁজিবাদের বিরোধিতা সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলার পর আমি এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করব। কারণ এই দুই মতবাদের বিরোধিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আপনাদের দৃষ্টিকোণই আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে আপনাদের অভিমতকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে আছে বলে মনে হয়। বিষয়মুখ দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা বিবেচনা করলে নিম্নরূপ অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়: যন্ত্রকৌশলের প্রগতির ফলে আর্থিক কাঠামো ক্রমবর্ধমান হারে কেন্দ্রিত হয়ে গেছে। ব্যাপক ভাবে শ্রমশিল্পে সমৃদ্ধ প্রত্যেকটি দেশে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনের হাতে আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রিত হয়েছে, তার মূলেও আছে এই যন্ত্রকৌশলের ক্রমবিকাশ। পুঁজিবাদী দেশে এই সব ব্যক্তিদের তাঁদের কার্যকলাপের জন্য জনসাধারণের কাছে সমগ্রভাবে জবাবদিহি করতে হয় না। তবে সমাজবাদী দেশসমূহে এঁরা আমলার রূপ নিয়ে থাকেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের মতই এঁদের এই-জাতীয় কৈফিয়ত দিতে হয়।

আপনাদের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে সহমত যে, পরিচালকবর্গ যদি অন্ততঃ কিয়ং পরিমাণে একটা সমুচিত মান অনুসরণ করেন, তা হলে সমাজবাদী অর্থনীতির এমন কতকগুলি সুস্পষ্ট সুবিধা আছে, নিঃসন্দেহেই যা তার অসুবিধার তুলনায় পাল্লায় ভারী। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যখন প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যেও কেবল অমিত কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সুপরিকল্পিত অর্থনীতির বাস্তব সম্ভাব্যতা সর্বপ্রথম দেখবার জন্য প্রত্যেকটি জাতি (অবশ্য তাদের যতটুকু সত্তা তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে) রাশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করবে। আমি এ কথাও বিশ্বাস করি যে, পুঁজিবাদ বা যাকে অবাধ শিল্পনীতি বলা হয় তা, বেকার সমস্যার সমাধানে কৃতকার্য হবে না। যন্ত্রকৌশলের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যা

দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং তার পরিণামে উৎপাদন ও জনসাধারণের ক্রয়শক্তির ভিতর স্বাস্থ্যকর ভারসাম্য বজায় থাকবে না।

পক্ষান্তরে বর্তমানের যাবতীয় সামাজিক ও আর্থিক অনাচারের জন্য একমাত্র পুঁজিবাদকেই দায়ী করে এই ধারণা করার মত ভ্রম যেন না করি যে, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হলেই মানবসমাজের তাবৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক পাপ অপনোদিত হবে। এই-জাতীয় বিশ্বাসের বিপদ হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ এর ফলে প্রত্যেকটি "নৈষ্ঠিক অনুগামীর" প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতাবৃত্তি প্রোৎসাহিত হয় ও এক সম্ভাব্য সামাজিক পদ্ধতি গোঁড়া ধর্মের রূপ পরিগ্রহ ক'রে এর আওতা-বহির্ভূত প্রতিটি ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতক ও নোংরা পাপাচারী আখ্যায় বিভূষিত করে। একবার এই অবস্থায় উপনীত হলে "অনৈষ্ঠিকদের" বিশ্বাস ও কার্যকলাপ বোঝার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। ইতিহাস থেকে আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, এই-জাতীয় অন্ধবিশ্বাস মানবসমাজের উপর কী পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় দুঃখদুর্দশা টেনে এনেছে।

যে শাসনপদ্ধতির ভিতর যতটা স্বৈরতন্ত্রপ্রবণতা বিদ্যমান, সে সরকার ততখানি খারাপ। অবশ্য অল্প-সংখ্যক নৈরাজ্যবাদী ছাড়া আমাদের ভিতর সকলেই এ কথা বিশ্বাস করেন যে, কোনরকম শাসন-ব্যবস্থা ছাড়া সভ্য সমাজের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ জাতির ভিতর জনগণের ইচ্ছা ও সরকারের ভিতর এক জীবন্ত ভারসাম্য বিরাজিত থাকে এবং এর ফলে স্বৈরতন্ত্রের বিকার দেখা দেয় না। যে দেশের সরকারের শুধু সশস্ত্র সেনাবাহিনীর উপরই নয়, পক্ষান্তরে শিক্ষা ও সংবাদ সরবরাহের যাবতীয় পথের উপর একচেটিয়া অধিকার বিদ্যমান এবং এককভাবে প্রতিটি নাগরিকের আর্থিক অস্তিত্ব যেখানে সরকারী কর্তৃত্বাধীন, সে দেশে যে পূর্বোক্ত প্রকারের অধঃপতনের আশঙ্কা অধিকতর তীব্র, এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। কেবল সমাজবাদকে সর্ববিধ সামাজিক সমস্যা সমাধানের বিশল্যকরণী জ্ঞান করা চলবে না ; সমাজবাদ শুধু এমন একটা কাঠামো, যার ভিতর এ-জাতীয় সমাধান সম্ভব—এই ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যই আমি এ কথা বলছি।

আপনাদের পত্রে আপনাদের যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, আমার কাছে তার সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর অংশ হচ্ছে নিম্নোক্ত বিষয়টি : আপনারা আর্থিক ক্ষেত্রে অরাজকতার ভীষণ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অরাজকতা অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত সার্বভৌমত্বের সমপরিমাণ সুতীব্র সমর্থক। বর্তমানের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্বে কোন প্রকারের সংকোচন প্রস্তাব আপনাদের কাছে স্বাভাবিক অধিকারের উল্লঙ্ঘন বিধায়ে দূষ্য। অধিকন্তু আপনারা এই কথা প্রমাণ করার প্রয়াস করেছেন যে, সার্বভৌমত্ব খর্ব করার পরিকল্পনার পিছনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ব্যতিরেকেই সমগ্র বিশ্বে আর্থিক প্রভুত্ব ও শোষণের অভিযান চালিয়ে যাবার

গোপন অভিসন্ধি রয়েছে। এই অভিযোগের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন প্রসঙ্গে আপনারা আপনাদের স্বকীয় পদ্ধতিতে বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে অনুষ্ঠিত এই দেশের সরকারের একক কার্যাবলীর বিশ্লেষণ করেছেন। আপনারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পরিষদ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ প্রকারান্তরে আমেরিকার পুঁজিপতি গোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পুতুলনাচ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমার কাছে এ-জাতীয় যুক্তির প্রভাব পৌরাণিক কথার মত; এসব বিশ্বাস্য নয়। অবশ্য এর থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়। এক কৃত্রিম ও দুঃখজনক পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার জন্য আমাদের উভয় দেশের বুদ্ধিজীবীদের ভিতর কী গভীর বিভেদ বিদ্যমান। স্বাধীনভাবে যদি ব্যক্তিগত অভিমত বিনিময় সম্ভবপর হত এবং এই প্রক্রিয়াকে যদি উৎসাহদান করা হত, তা হলে সম্ভবতঃ বুদ্ধিজীবীরা উভয় দেশ ও তাদের সমস্যাবলীর ভিতর পারস্পরিক বোঝাপড়ার আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে অপর যে কোন কারও চেয়ে অধিকতর সহায়ক হতেন। রাজনৈতিক সহযোগিতার সার্থক বিকাশের জন্য এইরূপ আবহাওয়া পূর্ব হতে থাকা প্রয়োজন। তবে এখনকার মত আমাদের "খোলা চিঠির" বিরক্তিকর পদ্ধতিরই শরণ নিতে হবে বলে আমার উপর আপনাদের যুক্তিজালের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে, সংক্ষেপে তা আমি ব্যক্ত করব।

এ কথা কেউ অস্বীকার করার চেষ্টা করবে না যে, আর্থিক ক্ষেত্রে জন-কয়েকের প্রভুত্বের প্রভাব আমাদের জন-জীবনের প্রতিটি শাখায় অমিত শক্তিশালী। তবে এই প্রভাবের অহেতুক উচ্চ মূল্যাঙ্কন করার প্রয়োজন নেই। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী বণিক্‌গোষ্ঠীর প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কলিন ডিলানা রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তিনবার তিনি তাঁর পদে পুনর্নির্বাচিত হন। অতীব সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কালে এবংবিধ ঘটনা ঘটেছিল।

আমেরিকার সরকারের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালীন নীতি সমর্থন বা ব্যাখ্যা করতে একে তো আমি প্রস্তুত নই, তাছাড়া আমার এর উপযুক্ত ক্ষমতা নেই বা আমি এর যোগ্যও নই। তবে অবশ্য এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে আমেরিকান সরকারের সুপারিশে অন্ততঃ একটা রাষ্ট্রোত্তর নিরাপত্তা সংস্থা সৃষ্টির প্রয়াস ছিল। এই প্রস্তাবকে গ্রহণযোগ্য মনে না করলেও একে অন্ততঃ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সমস্যার যথার্থ সমাধানের উপযোগী একটা আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যেত। প্রত্যুত, সোভিয়েট সরকারের এই-জাতীয় কিছুটা নিছক নেতিমূলক ও কিছুটা দীর্ঘসূত্রী মনোভাবের জন্য এ দেশের সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তিদের পক্ষে নিজেদের অভিরুচি মত স্বীয় রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগানো ও "যুদ্ধবাজদের" বিরোধিতা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পরিষদের উপর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব সম্বন্ধে আমি এই কথা বলতে চাই যে, আমার মতে কেবল আমেরিকার আর্থিক ও সামরিক শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় প্রচেষ্টার ফলে আমরা যেন নিরাপত্তা সমস্যার সার্থক সমাধানের পথে উজিয়ে চলছি।

বহু বিতণ্ডাপূর্ণ ভেটো ক্ষমতার সমস্যা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস, এই প্রস্তাবকে বর্জন বা শক্তিহীন করার প্রচেষ্টার ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুস্পষ্ট অভিসন্ধির চেয়েও এই সুবিধার অপব্যবহার এর জন্য অধিকতর পরিমাণে দায়ী।

আপনারা অভিযোগ করেছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হচ্ছে অন্যান্য জাতিকে আর্থিক ক্ষেত্রে পদানত রাখা ও শোষণ করা—এবার আমি সেই প্রসঙ্গে আসব। কারও উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়ার অর্থ অনিশ্চিত প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা। অতএব এর অঙ্গীভূত বিষয়মুখ অংশ সমূহের বিচার করাই শ্রেয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সৌভাগ্য বশতঃ নিজ দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে যাবতীয় প্রধান প্রধান শ্রমশিল্পজাত পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। এছাড়া প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল এ দেশে রয়েছে। "অবাধ কর্মপ্রচেষ্টার" প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হবার জন্য এ দেশ জাতীয় উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে জনসাধারণের ক্রয়শক্তির সংগতি বিধান কার্যে সফল হতে পারে না। শুধু এই সব কারণের জন্যই সদাসর্বদা এই আশঙ্কা বিদ্যমান যে বেকার সমস্যা মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করবে।

এই সব পরিস্থিতির কারণেই আমেরিকা তার রপ্তানী বাণিজ্যের উপর জোর দিতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া আমেরিকার পক্ষে তার সমগ্র উৎপাদন যন্ত্রকে স্থায়ী ভাবে সক্রিয় রাখা সম্ভব নয়। রপ্তানীর তুল্যমূল্যের পণ্য আমদানী করলে এ অবস্থা ক্ষতিকারক হত না। রপ্তানীর শ্রমমূল্য আমদানীর শ্রমমূল্য অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হত বলে তখন বৈদেশিক জাতিসমূহের শোষণ মাত্র এইটুকুর মধ্যে সীমিত থাকত। তবে প্রতিটি আমদানীর কারণে স্বদেশীয় উৎপাদন যন্ত্রের কোন না কোন অংশ কর্মচ্যুত হয় বলে একে এড়াবার সর্ববিধ প্রচেষ্টা চলেছে।

এই জন্য অন্যান্য দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারছে না। কারণ ভবিষ্যতে যদি আমেরিকা সে সব দেশ থেকে আমদানী করে, একমাত্র তা হলেই এর মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়। বিশ্বের সমগ্র স্বর্ণসম্পদের অধিকতম অংশ কেন যে আমেরিকায় জমা হয়েছে, এবার তার কারণ বোঝা যাবে। কথা হচ্ছে এই যে, বিদেশী পণ্য ক্রয় না করলে এই ভাবে সঞ্চিত স্বর্ণ ব্যয় করা যাবে না এবং পূর্বোল্লিখিত কারণে আমেরিকার পক্ষে বিদেশী পণ্য ক্রয় করা সম্ভব নয়। অতএব এই স্বর্ণস্তূপকে সতর্ক প্রহরাধীনে সরকারী

বুদ্ধিমত্তা ও ধন-বিজ্ঞানের স্মারক-চিহ্ন রূপে রেখে দেওয়া হয়েছে! পূর্বোক্ত কারণে আমি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বিশ্বকে শোষণ করার অভিযোগের উপর খুব গুরুত্ব দিতে পারি না।

তবে পূর্বোক্ত পরিস্থিতির ভিতর গুরুতর রাজনৈতিক সম্ভাবনার বীজ রয়েছে। প্রাগুক্ত কারণে যুক্তরাষ্ট্র তার উৎপন্ন পণ্যের একাংশ বিদেশে চালান করতে বাধ্য হয়। আমেরিকা বিদেশী রাষ্ট্র সমূহকে ঋণ দিয়ে এই রপ্তানীর মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ দিচ্ছে। সত্য কথা বলতে কি, এই সব ঋণ কোন দিনই শোধ হবে কিনা, এ একটা ভাববার কথা। অতএব বাস্তব ক্ষেত্রে এই সব কর্জকে দান বলেই মনে করতে হবে। এবং ক্ষমতা প্রাপ্তির দ্বন্দ্বে এই সব দানকে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করার সম্ভাবনা আছে। বর্তমান পরিস্থিতি এবং মানুষের সাধারণ স্বভাবের কথা বিবেচনা করলে আমাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষাতেই এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এর ভিতর সত্যকার বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য এ কথা কি সত্য নয় যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা এমন এক বিকট দশায় উপনীত হয়েছি, যখন আমাদের মনোজগতের প্রতিটি নবীন আবিষ্কার ও প্রত্যেকটি ভৌতিক সমৃদ্ধি এক একটি অস্ত্রের রূপ নিয়ে মানবতার পক্ষে সংকট রূপে প্রতিভাত হচ্ছে?

এই প্রশ্ন আমাদের এমন এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন করে, যার তুলনায় অন্য সব কিছু প্রত্যুত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। আমরা সকলেই জানি যে, ক্ষমতা দখলের রাজনীতি দুদিন আগে বা পরে যুদ্ধের সৃষ্টি করবেই এবং আধুনিক পরিস্থিতিতে সেই যুদ্ধের অর্থ হচ্ছে মানুষের ধন ও প্রাণের ব্যাপক ধ্বংসলীলা। এই ধ্বংসের পরিণাম অতীত ইতিহাসের যে কোন শোকাবহ অধ্যায়ের তুলনায় বহুগুণ অধিক ভয়াবহ।

রিপু নিচয় সঞ্জাত মানসিক আবেগ ও জন্মাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রথার তাড়নায় আমরা কি পরস্পরকে এমন সুচারু রূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব যে জাদুঘরে সংরক্ষণ করার মত আমাদের কোন রূপ অবশেষও থাকবে না? মানব-সভ্যতার এই পরিণাম কি একান্তই অপ্রতিরোধ্য? আমাদের এই বিচিত্র পত্র বিনিময় প্রসঙ্গে যে সব বাদবিতণ্ডা ও মতদ্বৈধতার চর্চা করেছি, আমাদের চতুর্দিকের প্রত্যাসন্ন বিপদ-বেষ্টনীর তুলনায় তা কি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ নয়? পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতিকে গ্রাস করার জন্য যে বিপদ সমুদ্যত, তার নিরাকরণের জন্য সর্ব শক্তি প্রয়োগে আমাদের প্রয়াস করা কি উচিত নয়?

আমরা যদি জাতি সমূহের অবাধ সার্বভৌমত্বের ধারণা আঁকড়ে থাকি ও তদনুরূপ কার্য করি তা হলে এর একমাত্র অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রতিটি জাতিরই যুদ্ধ-পদ্ধতির মাধ্যমে নিজ লক্ষ্যপথে চলার নির্ব্যূঢ় অধিকার আছে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক

জাতিকে সেই সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, অর্থাৎ তাকে অপর সকলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হতে হবে। বিপদ সত্য সত্যই ঘাড়ের উপর আসার বহু পূর্ব হতেই এই উদ্দেশ্য আমাদের সমগ্র জনজীবনে অধিকাধিক মাত্রায় প্রবল হবে এবং আমাদের যুব-সমাজকে দূষিত করবে। যে পর্যন্ত আমাদের ভিতর শান্ত যুক্তিশক্তি ও মানবীয় ভাবনার তিলমাত্র অবশেষ থাকবে, আমরা একে বরদাস্ত করব না।

"বিশ্ব সরকার" পরিকল্পনাকে রূপদানের প্রয়াসকারী বাকী সকলের কার মনে কী আছে তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে আমি শুধু পূর্বোক্ত মনোভাব চালিত হয়ে এই পরিকল্পনার সমর্থন করে থাকি। মানব-সমাজ এই যে অভূতপূর্ব সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, এর কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার অপর কোন পন্থা নেই বলে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে এবং তাই আমি বিশ্ব সরকারের সমর্থন করে থাকি। অন্যবিধ সকল প্রকার আদর্শের তুলনায় সর্বগ্রাসী ধ্বংস পরিহার করার আদর্শকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, যথোচিত গুরুত্ব ও সততা সহকারে এই পত্র লিখিত হয়েছে এবং আশা করি আপনারাও এই পত্রকে সে ভাবে গ্রহণ করবেন।

[১৯৪৮]

"ওয়ান ওয়ার্লড্" পুরস্কার প্রাপ্তির পর

আপনারা আমাকে এই অসাধারণ সম্মান দেবার সিদ্ধান্ত করায় আমি প্রচণ্ড ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছি। আমার সুদীর্ঘ জীবনকালে আমি সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে যোগ্যতার অতিরিক্ত সমাদর পেয়েছি এবং আমি স্বীকার করছি যে, এই সব প্রসঙ্গে চিরকালই এতদ্সংশ্লিষ্ট আনন্দের চেয়ে আমার লজ্জাবোধ প্রবলতর হয়েছে। তবে আর কখনও এবারকার মত আনন্দের চেয়ে দুঃখের বেদনা তীব্র হয়নি। কারণ আমরা যারা শান্তিকামী এবং চাই যে যুক্তি ও ন্যায়বিচার বিজয়ী হোক, তারা আজ তীব্রভাবে এই বিষয়ে সচেতন যে রাজনৈতিক জীবনের ঘটনা-প্রবাহের উপর যুক্তি এবং সততাপূর্ণ সদিচ্ছার প্রভাব কত অকিঞ্চিৎকর। তবে যত যাই হোক এবং আমার অদৃষ্টে যাই থাক, নিশ্চিতভাবে আমরা যেন জেনে রাখি যে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের জন্য চিন্তিত ব্যক্তিবর্গের বিরামহীন প্রচেষ্টা বিনা মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ আজকের চেয়ে বহুগুণ শোচনীয় হত।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রাক্কালে আমাদের সহধর্মী নাগরিকদেরকে সর্বোপরি যা বলা উচিত তা মোটামুটি এই রকমের: রাজনৈতিক জীবনে যখন দৈহিক শক্তির সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে,

এই শক্তি তখন তার স্বধর্ম অনুযায়ী চলা শুরু করে এবং দৈহিক শক্তিকে আয়ুধরূপে প্রয়োগেচ্ছুক মানবের চেয়ে এ অধিকতর ক্ষমতাশালী প্রমাণিত হয়। জাতি রণসজ্জায় সজ্জিত হবার যে পরিকল্পনা করেছে, তার পরিণাম শুধু অবিলম্বে যুদ্ধাশঙ্কাই নয়, এর ফলে এ দেশে ধীর গতিতে হলেও নিশ্চিত ভাবে গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও ব্যক্তি-মানবের মর্যাদা বিলুপ্ত হবে। বৈদেশিক ঘটনা-প্রভাবের কারণে আমরা অস্ত্রসজ্জা করছি বলে ধারণা করা ভ্রমাত্মক। এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সর্ব শক্তি প্রয়োগে সংগ্রাম করতে হবে। বস্তুতঃ আমাদের নিজেদের রণসজ্জা এবং অন্যান্য জাতির উপর তাঁর প্রতিক্রিয়া ঠিক সেই অবস্থারই সৃষ্টি করবে, এ দেশের সমরসজ্জার সমর্থকরা যাকে ভিত্তি করে তাঁদের পরিকল্পনার সপক্ষে প্রচার করছেন।

বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার একটি মাত্র পন্থা আছে এবং তা রাষ্ট্রোত্তর সংস্থা গঠন। কোন বিশেষ জাতির একতরফা সমরসজ্জা কার্যকর রক্ষা ব্যবস্থা না হয়ে সাধারণ অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তিকে কেবল বাড়িয়ে দেবে।

[১৯৪৮]

বুদ্ধিজীবীদের প্রতি

আজ এখানে আমরা আমাদের উপর এক গভীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানচর্চাকারী রূপে সমবেত হয়েছি। আমাদের ফরাসী ও পোল্যাণ্ডদেশীয় সহকর্মীদের উদ্যোগে এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে এখানে একত্র হবার সুযোগ পেয়েছি বলে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করার বিশেষ কারণ রয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র শান্তি সংস্থাপন ও নিরাপত্তাভাব বৃদ্ধি মানসে জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রভাব প্রয়োগের উপায় উদ্ভাবনকল্পে আমর সমবেত হয়েছি। এ সমস্যা সুপ্রাচীন এবং পূর্বসূরীদের মধ্যে প্লেটো এর সমাধানের জন্য কঠোর প্রয়াস করেছিলেন। প্লেটোর সাধনা ছিল মানবজাতির সমস্যাবলীর সমাধানের জন্যে পরম্পরাগত রিপু প্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার না করে যুক্তি ও ধীর বুদ্ধি প্রয়োগ করা।

অত্যন্ত কটু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা এই জ্ঞান লাভ করেছি যে, আমাদের সমাজজীবনের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য বিচারবুদ্ধিযুক্ত চিন্তাই যথেষ্ট নয়। গভীর গবেষণা এবং উচ্চ কোটির বৈজ্ঞানিক কৃতির পরিণাম অনেক সময় মানবজাতির পক্ষে মারাত্মক প্রতিপাদিত হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন মানুষকে প্রাণান্তকর দৈহিক শ্রম থেকে মুক্তি প্রদায়ক পন্থা আবিষ্কৃত হয়ে তার জীবন-যাত্রাকে সহজতর ও সমৃদ্ধতর করেছে, তেমনি অন্য দিকে আবার এর পরিণামে তার জীবনে প্রচণ্ড অশান্তির ঝড় বয়ে গেছে ও মানুষ তার যন্ত্রকৌশলময় পরিবেশের ক্রীতদাসে পর্যবসিত হয়েছে। আর সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানুষ

যূথবদ্ধ ভাবে আত্মধ্বংসের সাধন উৎপাদন করছে। নিঃসন্দেহে এ-ই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ বিয়োগান্তক ব্যাপার।

তবে এ ব্যাপার যতই মর্মন্তুদ হোক না কেন, বোধহয় এর চেয়েও শোকাবহ ঘটনা হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের ক্ষেত্রে মানবসমাজ বহু-সংখ্যক উচ্চবর্গের সকল সুধীর জন্ম দিলেও আমাদের চতুর্দিকস্থ বহুবিধ রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও অর্থনীতি সংক্রান্ত উত্তেজনা প্রশমনের উপযুক্ত সমাধান আবিষ্কারের ব্যাপারে আমরা বহুদিন যাবৎ কোন রকম কুশলতার পরিচয় দিতে পারিনি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আজকের বিশ্বের বিপজ্জনক ও বিস্ফোরক অবস্থার জন্য জাতি সমূহের পারস্পরিক ও আভ্যন্তরীণ আর্থিক সংঘাতই মুখ্যতঃ দায়ী। মানুষ বিশ্বের জাতি সমূহের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানকারী কোন রকম রাজনৈতিক ও আর্থিক সংস্থার কাঠামো রচনা কার্যে সফলকাম হয়নি। মানুষ এখনও কোন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি, যা যুদ্ধের সম্ভাবনা ও ব্যাপক হত্যালীলার বিধ্বংসী মারণাস্ত্র সমূহকে চিরতরে নির্বাসিত করতে পারে।

হননক্রিয়াকে অধিকতর বীভৎস ও কার্যকুশল করায় সহায়তা দানই আমাদের এই বৈজ্ঞানিককুলের শোচনীয় ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এই সব অস্ত্র যাতে স্বীয় পাশবিক উদ্দেশ্য সাধন করতে না পারে তার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগে প্রচেষ্টা করাই আমাদের পবিত্রতম ও মহত্তম কর্তব্য। আর কোন্ কাজ আমাদের কাছে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? আর কোন্ সামাজিক আদর্শ আমাদের অন্তরের এতখানি সন্নিকটবর্তী হতে পারে? এই জন্য এই সমাবেশের উপর এত গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র দায়িত্বভার রয়েছে। এখানে আমরা সবাই মিলে পরামর্শ করব। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে সংযুক্ত করার জন্য আমরা আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক সেতু রচনা করব। জাতীয় সীমান্তরেখার বীভৎস বাধা আমাদের জয় করতেই হবে।

সাম্প্রদায়িক জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতর মানুষ সমাজবিরোধী সার্বভৌমত্ব খর্ব করার দিকে কতক পরিমাণে এগিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, নগরজীবনের আভ্যন্তরীণ প্রবাহ, এমনকি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমাজজীবন অন্ততঃ অংশতঃ এর সাক্ষ্য বহন করে। এই সব জনসমুদায়ের ভিতর ঐতিহ্য ও শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একটা অনুগ্র প্রভাব আছে এবং ওই সব ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর বাসকারী জন-সম্প্রদায়ের মধ্যে এর ফলে একটা সহনীয় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এখনও সম্পূর্ণ অরাজকতা চলেছে। বিগত কয়েক সহস্র বৎসরের ভিতর আমরা এক্ষেত্রে সত্যকার কোন অগ্রগতি করেছি বলে আমি বিশ্বাস করি না। বিভিন্ন জাতির ভিতর সংঘর্ষ উপস্থিত হলে এখনও সচরাচর পশুশক্তি অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বারা তার মীমাংসা হয়। যখন যেখানে তিলমাত্র

প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হয়, উত্তরোত্তর অধিকতর ক্ষমতা প্রাপ্তির বল্গাহীন আকাঙ্ক্ষা আক্রমণাত্মক ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই অরাজকতা যুগে যুগে মানবজাতির উপর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও ধ্বংসলীলার বোঝা চাপিয়েছে। মানুষের বিকাশ, তাদের আত্মার উন্নতি ও সর্ববিধ মঙ্গলবিধান এর ফলে বার বার ব্যাহত হয়েছে। সময় সময় এর দরুন এক একটি অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে উৎসন্ন হয়ে গেছে।

তবে জাতিসমূহের যুদ্ধের জন্য নিত্যপ্রস্তুতির বাসনা মানবজীবনের উপর এ ছাড়াও আর একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বিগত কয়েক শতাব্দীতে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে জনজীবনের উপর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের পরিমাণ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক অথবা পাশব অত্যাচার সহকারে প্রযুক্ত হোক, উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব সমভাবে অমিত বলশালী হয়ে উঠেছে। আধুনিক শ্রমশিল্প-ব্যবস্থা মুখ্যতঃ কেন্দ্রীভূত ও একত্র-সন্নিবিষ্ট হওয়ায় রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভিতর পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ ও বিধিবদ্ধ সম্বন্ধ বজায় রাখা ক্রমশঃ অধিকাধিক মাত্রায় জটিল ও বহুবিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে। নাগরিকদের বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আধুনিক রাষ্ট্রের এক ভীষণভাবে সজ্জিত নিত্যসম্প্রসারণশীল সৈন্যবিভাগ প্রয়োজন। এ ভিন্ন দেশবাসীদের যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া রাষ্ট্র তার অবশ্যকর্তব্যরূপে বিবেচনা করে। এই "শিক্ষা" কেবল যুবসমাজের আত্মা ও চৈতন্যকেই কলুষিত করে না, এর ফলে প্রাপ্তবয়স্কদের মনোবৃত্তিও ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। কোন দেশ এই বিচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। এমনকি যেসব দেশের অধিবাসীদের ভিতর কোন রকম স্পষ্ট আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি নেই, তাদের মনেও এর প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়। এইভাবে আধুনিক রাষ্ট্র আজ দেববিগ্রহের স্থান নিয়েছে এবং অত্যন্ত অল্প-সংখ্যক ব্যক্তি এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতময় শক্তির হাত এড়াতে পারছে।

অবশ্য যুদ্ধের জন্য শিক্ষা এক মায়া-মরীচিকা ভিন্ন আর কিছু নয়। বিগত কয়েক বৎসরের যন্ত্রকৌশলের অগ্রগতি এক অভিনব সামরিক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। কয়েক লহমার ভিতর অসংখ্য মানুষ ও সুবিস্তীর্ণ এলাকাকে ধ্বংস করার উপযুক্ত ভয়াবহ মারণাস্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। বিজ্ঞান এ যাবত এই সব আয়ুধের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করতে পারেনি বলে আধুনিক রাষ্ট্র এখন আর তার নাগরিকদের রক্ষার জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত হতে অপারগ।

তা হলে কী ভাবে আমরা রক্ষা পাব?

একমাত্র যদি কোন রাষ্ট্রোত্তর সংস্থার হাতে এই সব অস্ত্র-শস্ত্র উৎপাদন ও সংরক্ষণের একাধিকার থাকে, শুধু তা হলেই মানবসমাজ অভাবনীয় বিধ্বংস ও

উৎপথগামী বিনষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। তবে অতীতে যেসব বিবাদের দরুন যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে, প্রস্তাবিত রাষ্ট্রোত্তর সংস্থাকে সেই-জাতীয় বিবাদ নিষ্পত্তির বৈধানিক অধিকার ও কর্তব্য না দেওয়া পর্যন্ত জাতিসমূহ যে বর্তমান অবস্থায় এ ক্ষমতা রাষ্ট্রোত্তর সংস্থার হাতে সমর্পণ করবে—এ কথা কল্পনা করা যায় না। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কম-বেশী আত্মনিয়োগ করাই রাষ্ট্রগুলির কাজ হবে। অপরাপর রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধের ক্ষেত্রে তারা একমাত্র সেই সব বিষয় ও সমস্যা নিয়ে কাজ-কারবার করবে, যেগুলি কোনমতেই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার পরিপোষক নয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে এমন কোন নিদর্শন পরিদৃষ্ট হচ্ছে না যার ফলে ধারণা করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সরকার মানবজাতির সম্মুখস্থ সমস্যার গভীরতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে প্রয়োজনের তীব্র তাগিদে বৈপ্লবিক কার্যক্রম গ্রহণ করার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছেন। অতীতের কোন অবস্থার সঙ্গে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা চলতে পারে না। সুতরাং প্রাচীন যুগে যেসব পদ্ধতি কার্যকর প্রতিপন্ন হয়েছিল, এখন সে সবের প্রয়োগ অসম্ভব। আমাদের চিন্তাজগতে বিপ্লব সাধন করতে হবে, আমাদের ক্রিয়াকলাপে মধ্যে বিপ্লবের আবাহন করতে হবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের স্তরে বিপ্লব সংঘটন করার সাহস দেখাতে হবে। কালকের চাল আজ চলবে না এবং আগামীকল্য তো এ চাল ভীষণভাবে সেকেলে হয়ে যাবে। এই কথাটি আজ বিশ্বের প্রত্যন্ত প্রদেশের মানুষকেও বুঝিয়ে দেওয়া বুদ্ধিজীবীদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক সামাজিক উত্তরদায়িত্ব। অতীতে আর কখনও বুদ্ধিজীবীদের এমন গুরুভার দায়িত্ব স্কন্ধে নিতে হয়নি। বিশ্ববাসীর মনের গভীর মূলে নিহিত যাবতীয় ঐতিহ্যকে চূড়ান্ত প্রগতিশীলতায় রূপান্তরিত করার জন্য বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই কার্য সাধনের জন্য স্বীয় জাতিগত বন্ধনের উর্ধ্বে ওঠার মত যথেষ্ট মনোবল বুদ্ধিজীবীদের আছে কি?

দুর্দম প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আজ এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও রাষ্ট্রোত্তর প্রতিষ্ঠান পরে সৃষ্ট হবে। তবে বর্তমান বিশ্বের এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের ধ্বংসস্তূপের উপর তখন তা নির্মিত হবে। আমরা আশা করব যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাজিত বর্তমান অরাজকতার অবসান স্বহস্তে এই বিশ্বকে বিধ্বংস করার মূল্যে ক্রয় করতে হবে না। সম্ভাব্য বিনষ্টির ব্যাপ্তি অনুমান করা আজ আমাদের কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। হাতে অত্যন্ত অল্প সময় রয়েছে। কিছু যদি করতেই হয়, তবে এখনই তা করতে হবে।

[১৯৪৮]

জাতীয় নিরাপত্তা

রণকৌশলের বর্তমান অবস্থায় জাতিকে সামরিক অস্ত্রে সুসজ্জিত করে নিরাপদ বোধ করার পরিকল্পনা এক মারাত্মক মোহ মাত্র। বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এই মোহকে পুষে রাখার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দেশ সর্বপ্রথম পারমাণবিক বোমা উৎপাদনে সফলকাম হয়। সে সময় এই বিশ্বাস ছিল যে, শেষ পর্যন্ত এর দ্বারা সুনিশ্চিত সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবভাগী হওয়া যাবে। ভাবা হত যে, এই পদ্ধতিতে যে কোন শক্তিশালী বিরুদ্ধপক্ষীয়কে ভীতিবিহ্বল করে অবদমিত করা যাবে এবং আমরা সকলে মনে প্রাণে যে নিরাপত্তা কামনা করি, সমগ্র মানব সমাজের তা করায়ত্ত হবে। বিগত পাঁচ বৎসর যাবত আমরা যে নীতি অনুসরণ করে আসছি, সংক্ষেপে তা হচ্ছে যে কোন মূল্যে উন্নততর সামরিক শক্তি দ্বারা নিরাপত্তা সৃষ্টি করা।

এই যান্ত্রিকতা আধারিত সামরিক মনোভাব বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফলে থাকে। পররাষ্ট্র নীতির প্রতিটি কার্য একমাত্র নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ দ্বারা সঞ্চালিত হয়: কী ভাবে চলা যায় যাতে যুদ্ধ বাধলে শত্রুপক্ষের তুলনায় আমাদের সামরিক বল শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন হয়? এর পরিণামে বিশ্বের প্রতিটি সামরিক গুরুত্ব বিশিষ্ট কেন্দ্রে যুদ্ধঘাঁটি নির্মিত হয়। অতঃপর রাজনৈতিক সুহৃদদের অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত করতে হয় ও তাদের অর্থসাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করতে হয়। স্বদেশের অভ্যন্তরে সমর বিভাগের হাতে অমিত আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রিত হয়, যুবকদের জঙ্গী ভাবাপন্ন করে তোলা হয়, নাগরিকদের, বিশেষতঃ সরকারী কর্মচারীদের রাষ্ট্রানুগত্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় এবং এই কার্য সাধনের জন্য পুলিশ বাহিনী উত্তরোত্তর বলশালী হয়ে ওঠে। স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভিতর ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। বেতার যন্ত্র, সংবাদপত্র এবং শিক্ষা-নিকেতন দ্বারা জনসাধারণকে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিভ্রান্ত করে তাদের মনে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে সুবিধাজনক বিশ্বাস অনু-প্রবিষ্ট করানো হয়। সমর বিভাগীয় গোপনতার চাপে সাধারণের অধিগম্য সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থার উপর ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট সরকারের ভিতর মারণাস্ত্রে সজ্জিত হবার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে, প্রথমে তাকে নিবর্তনমূলক মনে করলেও এখন এ মৃগী রোগের মত হয়ে পড়েছে। ব্যাপক ধ্বংসলীলা সাধনের আয়ুধরাজিকে উভয় পক্ষই নিজ নিজ গোপনীয়তার প্রাচীরের অন্তরাল থেকে অভাবনীয় তৎপরতা সহকারে নিখুঁত করার কাজে লেগে গেছে। লোকচক্ষে উদ্‌যান বোমা সম্ভাব্য লক্ষ্য রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট দ্রুতগতিতে এর বিকাশ সাধনের জন্য এক আন্তরিকতাপূর্ণ ঘোষণা প্রচার করেছেন। এ প্রচেষ্টা সফল হলে বায়ুমণ্ডলকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি দ্বারা দূষিত

করা ও তার পরিণামে বিশ্বের বুকে যে কোন রকম প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন করার কল্পনা যান্ত্রিক সম্ভাবনার আয়ত্তাধীন হবে। বর্তমান অবস্থার পরিণতির এই ভয়াবহ বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে এর ছুর্নিবার ও অনিবার্য গতি। প্রতিটি পদক্ষেপ পূর্ববর্তী পদক্ষেপের অনিবার্য পরিণাম বলে মনে হয়। অবশেষে সর্বব্যাপক সর্বনাশের হাতছানি ক্রমশঃ অধিকাধিক মাত্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মানুষের স্বসৃষ্ট এই গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পাবার কি কোন পথ আছে? আমাদের প্রত্যেকের এবং বিশেষতঃ যাঁরা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট সরকারের বর্তমান মনোভাবের জন্য দায়ী তাঁদের সকলেরই এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা এক বাহ্য অরাতিকে পরাভূত করতে সমর্থ হলেও যুদ্ধজনিত মনোভাবের প্রভাবমুক্ত হতে সমর্থ হইনি। যতদিন পর্যন্ত সম্ভাব্য ভবিষ্যত সংঘর্ষের কথা বিবেচনা করে প্রতিটি কার্য করা হবে, ততদিন শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অতএব যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের মূল দৃষ্টিকোণ হবে: বিভিন্ন জাতির ভিতর শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, এমনকি প্রেমময় সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করার জন্য আমরা কী করতে পারি? প্রথম সমস্যা হচ্ছে পারস্পরিক আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের ভাব দূর করা। এর জন্য নিঃসন্দেহে সর্ব-প্রকারের হিংসা (কেবল ব্যাপক ধ্বংসলীলার অস্ত্রশস্ত্রই নয়) বর্জন করতে হবে। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে জাতি সমূহের নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত জরুরী সমস্যাবলী সমাধানের ক্ষমতা যুক্ত কোন রকম রাষ্ট্রোত্তর বিচারব্যবস্থা ও শাসনযন্ত্র গড়ে তুললে তবেই এই-জাতীয় বর্জন সুফলপ্রসূ হতে পারবে। এমনকি জাতি সমূহ যদি এই মর্মে ঘোষণাও করেন যে এই-জাতীয় "সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন বিশ্ব সরকার" গঠনের জন্য তাঁরা সম্মিলিত ভাবে সততা সহকারে চেষ্টা করবেন, তা হলেও অবিলম্বে যুদ্ধের সম্ভাবনারূপী বিপদাশঙ্কা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাবে।

শেষ পর্যন্ত বিচার করলে দেখা যায় যে, মানুষের ভিতর যাবতীয় শান্তিময় সহযোগিতার প্রাথমিক আধার হচ্ছে পারস্পরিক বিশ্বাস। ন্যায়ালয় ও পুলিশী ব্যবস্থা ইত্যাদি আসে তার পর। এ সত্য ব্যক্তির মত জাতির ক্ষেত্রেও প্রযুজ্য এবং বিশ্বাসের আধার হচ্ছে সততা ও সৌহার্দপূর্ণ পারস্পরিক লেনদেন।

আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কি হবে? দণ্ডশক্তির ব্যাপার বলে একে গৌণ স্থান দেওয়া যেতে পারে। তবে এর গুরুত্ব সম্বন্ধে অহেতুক উচ্চ ধারণা করা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ নয়।

[১৯৫০]

গান্ধী পথ দেখিয়েছেন

যুদ্ধকালে নরহত্যা করা সাধারণ নরহত্যার চেয়ে কোনক্রমেই কম হীনকার্য নয়। তথাপি যুদ্ধ-প্রথার উচ্ছেদ করে ফেলার জন্য এবং আইনসঙ্গত ভাবে ও শান্তিময়

পদ্ধতিতে নিজেদের বিবাদ মীমাংসার জন্য যতদিন না সকল জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টা সার্থক হচ্ছে, ততদিন তাঁরা নিজেদের যুদ্ধপ্রস্তুতিতে লিপ্ত থাকতে বাধ্য মনে করছে। যাতে রণসজ্জার প্রতিযোগিতায় পিছু হটে না যেতে হয়, এই জন্য বাধ্য হয়ে তারা অতি জঘন্য ও ভয়াবহ মারণাস্ত্র প্রস্তুত করছে। এইরূপ কার্যক্রমের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যুদ্ধ, অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধ হলে সার্বজনীন ধ্বংস সংঘটিত হবে।

এরূপ অবস্থায় পারমাণবিক বোমার মত কোন বিশেষ প্রকারের মারণাস্ত্র ইত্যাদি নির্মাণ প্রতিরোধ করার চেষ্টার মধ্যে আশান্বিত হবার মত কিছু নেই। যুদ্ধের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং যুদ্ধরূপী বিপদ সম্ভাবনার নিরাকরণ করতে পারলে তবে স্বস্তি লাভ হতে পারে। যুদ্ধ নিরাকরণের উদ্দেশ্যেই প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। কেউ যেন এরূপ অবস্থা স্বীকার না করেন যাতে এই উদ্দেশ্যের বিপরীতমুখী কোন কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে বাধ্য হতে হয়।

আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিভাযুক্ত মনীষী গান্ধী আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। সত্য পথ পেয়েছি বুঝলে মানুষ কতখানি ত্যাগের অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি দেখিয়েছেন। অটুট বিশ্বাসকে আশ্রয় করে মানুষের ইচ্ছা বাহ্যতঃ অজেয় এবং বাস্তব ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে জয়ী হতে পারে—ভারতের মুক্তিপ্রচেষ্টায় তাঁর কার্য এরই জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

[১৯৫৩]

ইহুদী আদর্শ

জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের সাধনা, ন্যায়বিচারের প্রতি প্রায়-অন্ধপ্রেম এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—এই হচ্ছে ইহুদী ঐতিহ্যের ত্রিবিধ আধার। তাই ইহুদীকুলে জন্মলাভের সৌভাগ্য হয়েছে বলে আমার অদৃষ্টকে আমি ধন্যবাদ দিই।

যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আজ যারা জেহাদ ঘোষণা করেছে এবং পাশব শক্তির সহায়তায় বিবেকহীন শাসনযন্ত্রের দাস তৈরী করা যাদের উদ্দেশ্য, তারা যে আমাদের চরম শত্রু জ্ঞান করবে—এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? ইতিহাস এক সুকঠিন দায়িত্বভার আমাদের উপর ন্যস্ত করেছে। কিন্তু আমরা যতদিন সত্য, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সেবক থাকব, ততদিন আমরা প্রাচীনতম মানব-জাতির বংশধর হিসাবে তো টিকে থাকবই, অধিকন্তু আমাদের সৃষ্টিশীল প্রতিভা দ্বারা মানবতার জন্য এমন সুফল অর্জন করব, যা চিরকাল তাকে মহান্ করে রাখবে।

[১৯৩৪]

ইহুদী দৃষ্টিভঙ্গী নামক কোন কিছু আছে কি?

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে আমাদের মতে ইহুদী দৃষ্টিভঙ্গী বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আমার মনে হয় জুডাবাদের সম্পর্ক শুধু জীবনের নৈতিক দিকের সঙ্গে ও নৈতিক দৃষ্টিতে জীবনকে দেখার ভিতর। একে আমি "তোরাহ্" (Torah)-এ লিখিত ও "তালমুদে" ব্যাখ্যাকৃত বিধান সমূহের সার মনে করার পরিবর্তে বরং ইহুদী জাতির জীবনযাত্রায় ভাস্বর জীবনের প্রতি এক বিশিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গীর মূলীভূত প্রতীক স্বরূপ বিবেচনা করি। আমার কাছে "তোরাহ্" এবং "তালমুদ" হচ্ছে ইহুদীদের প্রাচীনকালীন জীবন সম্বন্ধীয় ধারণার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

আমার মতে সৃষ্টির তাবৎ জীবের জীবনের প্রতি এক বিধায়ক মনোভাব হচ্ছে পূর্বোক্ত ধারণার মূলকথা। সর্ব জীবের জীবনকে মহত্তর এবং সুন্দরতর করায় সহায়তা দানের ভিতরই প্রতিটি ব্যক্তি-জীবনের অর্থ অন্তর্নিহিত রয়েছে। জীবন পবিত্র—অর্থাৎ এর মর্যাদাই সর্বোচ্চে বিরাজিত এবং অন্যান্য সকল কিছু এর নীচে। ব্যক্তি-জীবনের উর্ধ্বস্থিত সত্তার উপর এই ভাবে জোর দেবার ফলে স্বতঃই আধ্যাত্মিক সকল কিছুর উপর শ্রদ্ধার ভাব জন্মে এবং এটা ইহুদী ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্টতা।

জুডাবাদ কোন ধর্মমত (creed) নয়। ইহুদীদের ভগবান হচ্ছেন কুসংস্কারের অনস্তিত্ব ও অযৌক্তিক ধারণা সমূহের বিলুপ্তির এক কাল্পনিক স্থিতি। এতে অবশ্য

নৈতিক বিধানাবলীকে ভয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মূর্ত করার প্রয়াস করা হয়েছে এবং এটা নিতান্ত ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়। তবুও আমার মনে হয়, ইহুদী জাতির দৃঢ়মূল নৈতিক ঐতিহ্য বহুলাংশে তার ভয়ের আধারের উর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়েছে। এ কথা পরিষ্কার যে, ইহুদীদের কাছে "ঈশ্বর সেবা" এবং "জীব সেবা" সম-অর্থসূচক। ইহুদীদের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানগণ, বিশেষতঃ পয়গম্বররা ও যীশু এই আদর্শের রূপায়ণের জন্যই প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, ইহুদী ধর্ম মোটেই অতি-প্রাকৃত নয়। যেভাবে আমরা জীবন যাপন করি এবং এর যতখানি আমাদের উপলব্ধিতে আসে, তাই নিয়েই এর কাজ এবং তার বাইরে এ যায় না। আমার তাই সন্দেহ হয় যে, ইহুদী ধর্মকে বোধহয় ধর্মের প্রচলিত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী ধর্মপদবাচ্য করা যায় না। বিশেষতঃ কোন ইহুদীর "বিশ্বাস" (faith) আছে কিনা তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তার কাছ থেকে কেবল শুদ্ধ জীবনের আশা করা হয় বলে আমার মনে এই সংশয় জাগে। এই শুদ্ধ জীবনও আবার শুধু ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ নয়—ব্যক্তির পরিধির উর্ধ্বে এর সঞ্চরণ।

তবে ইহুদী ঐতিহ্যে এতদতিরিক্ত আরও কিছু আছে এবং "ওল্ড টেস্টামেণ্টের" অনেক গাথাতেও এই-জাতীয় সুন্দর অভিপ্রকাশ দেখা যায়। এ হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য এবং চিত্তবিমোহনকারী বর্ণাঢ্য রূপ প্রত্যক্ষ করে মদির আনন্দ ও বিস্ময়ে বিহ্বল হওয়া। মর মানব এর সম্বন্ধে কেবল অস্পষ্ট ধারণা করতে পারে। এই অনুভূতি থেকেই সত্যকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা তার আধ্যাত্মিক আধারের জীবনরস আহরণ করে। এরই অভিব্যক্তি যেন বিহগকুলের কাকলির ভিতরও রূপ পেয়েছে। তবে একে ভগবানের কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করা একান্ত শৈশব জনিত অবাস্তব মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

এ পর্যন্ত আমি যা বলেছি তা কি জড়বাদের কোন বিশিষ্ট লক্ষণ? অন্যত্র অপর কোন নামে কি এর অস্তিত্ব বিদ্যমান? এর শুদ্ধ রূপ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমন কি জুডাবাদেও নয়। নানা রকম শাস্ত্র আর পুঁথি-পত্রের চাপে জুডাবাদেও শুদ্ধ আদর্শটির অনেকখানি চাপা পড়ে গেছে। তথাপি জুডাবাদকে আমি এ আদর্শের অন্যতম শুদ্ধ ও জীবন-শক্তিতে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি বলে বিবেচনা করি। আমার এ অভিমত বিশেষ করে এর জীবনের পবিত্রতার মৌলিক আদর্শের প্রতি প্রযুজ্য।

"স্যাবাথ ডে"-র পবিত্রতার জন্য জীবজন্তুদের কথাও যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় "কম্যাণ্ড" সমূহের অন্তর্গত করা হয়েছে—এ একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। এ ভাবনা এত দৃঢ়মূল যে এই আদর্শ অনুযায়ী তাবৎ জীবিত প্রাণীর ভিতর সংহতি

আবশ্যক। সমগ্র মানবসমাজের ভিতর সমভাব প্রতিষ্ঠার কথা তো আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে এবং সমাজবাদের দাবি যে মূলতঃ ইহুদীরাই প্রথমে তুলেছে, এ নিছক একটা আকস্মিক ঘটনা নয়।

ইহুদীদের ভিতর জীব মাত্রকে পবিত্র মনে করার সংস্কার কত গভীর তার প্রমাণ মেলে ওয়াল্টার রাথেন্থর অভিমত থেকে। আমার সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে একবার তিনি বলেছিলেন, "কোন ইহুদী যদি বলে যে চিত্তবিনোদনের জন্য সে শিকার করতে যাচ্ছে, তবে বুঝতে হবে সে মিথ্যা ভাষণ করছে।" এর চেয়ে সরল ভাবে ইহুদীদের জীব মাত্রকে পবিত্র মনে করার সংস্কারকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

[১৯৩৪]

খৃষ্টধর্ম ও জুডাবাদ

জুডাবাদ থেকে যদি তার পয়গম্বরদের ছাঁটাই করা যায় এবং যীশুখৃষ্ট প্রবর্তিত খৃষ্টধর্ম থেকে যদি তার পরবর্তী প্রত্যেকটি সংযোজন—বিশেষতঃ পুরোহিত সম্প্রদায়ের কারিগরী বাদ দেওয়া যায়, তবে যে উপদেশাবলী থেকে যাবে তা দিয়ে মানব-সমাজের যাবতীয় রোগ মুক্ত করা যায়।

শুভ ইচ্ছা প্রণোদিত প্রতিটি মানব সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে যথাসাধ্য নিজের ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতর পবিত্র মানবতার এই শিক্ষা সমূহকে প্রাণবন্ত করে তোলার প্রয়াস করা। সমসাময়িক সমাজের দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ ও পদদলিত না হয়ে তিনি যদি এতদুদ্দেশ্যে আন্তরিক চেষ্টা করতে পারেন, তা হলে সে ঘটনাকে তাঁর নিজের ও নিজ সম্প্রদায়ের সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলে বিবেচনা করা উচিত।

[১৯৩৪]

ইউরোপের ইহুদী সম্প্রদায়ের পুনর্বাসন সমস্যা

ইহুদী সম্প্রদায়কে যে উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে, তার ইতিহাস অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ। তবুও আজ মধ্য ইউরোপে আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলেছে, তার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাইবেলে উক্ত সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও অতীতে আমাদের নিগৃহীত হতে হয়েছে। আজ অবশ্য বাইবেলে উক্ত সম্প্রদায় হবার **কারণেই** আমরা নিপীড়িত হচ্ছি। এর উদ্দেশ্য কেবল আমাদেরই নিশ্চিহ্ন করা নয়, বাইবেল এবং খৃষ্টধর্মের যে প্রেরণার ফলে মধ্য ও উত্তর ইউরোপে সভ্যতার উদ্ভব সম্ভবপর হয়েছিল, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ধ্বংস করা হচ্ছে এই সব কার্যকলাপের লক্ষ্য। এই অভীষ্ট পূর্ণ হলে ইউরোপ এক নিষ্ফলা মরুভূমিতে পরিণত

হবে। মানবসমাজে নগ্ন পশুশক্তি, পাশবিকতা, আতঙ্ক ও ঘৃণার ভিত্তিতে জীবন অধিককাল স্থায়ী হতে পারে না।

একমাত্র প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি, ন্যায়সংগত আচরণ ও স্বশ্রেণীর মানবকে সহায়তা দানের ইচ্ছাই মানবসমাজের স্থায়িত্ব বিধান করতে পারে এবং ব্যক্তি-মানবকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম। শিক্ষার এই অত্যাবশ্যক অঙ্গ ব্যতিরেকে কেবল বুদ্ধি বা নিত্য নব আবিষ্কার অথবা বিশেষ কোন ধরনের সমাজ-সংগঠন এর বিকল্প হতে পারে না।

ইউরোপের বর্তমান সংক্ষোভের ফলে ইহুদী সম্প্রদায় ছিন্নমূল হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশু নিজ গৃহ হতে বিতাড়িত হয়ে হতাশাপীড়িত অবস্থায় বিশ্বের রাজপথগুলিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করছে। ইহুদী সমাজের বর্তমান দুর্দশা আধুনিক সভ্যতার মূলকেন্দ্রকে ধরে নাড়া দিতে উদ্যত।

ইহুদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচারের এক অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে উদ্বাস্তু শ্রেণী সৃষ্টি। বিজ্ঞান, চারুকলা ও সাহিত্য ক্ষেত্রের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যে দেশকে একদা তাঁদের প্রতিভা দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন, আজ তাঁরা সে দেশ থেকে বিতাড়িত। এই সকল নির্বাসিত ব্যক্তির ভিতর আজকের এই আর্থিক অবরোহণের দিনে দেশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক মান পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সব উদ্বাস্তুর ভিতর অনেকে শ্রম-শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে পড়েন। বিশ্বের অগ্রগতির পথে তাঁরা মূল্যবান অবদান রেখে যেতে সমর্থ। আর্থিক বিকাশের নবীন কর্মপ্রচেষ্টার সূত্রপাত করে এবং স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য নূতন সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে তাঁরা আতিথ্যের প্রতিদান দিতে পারেন। আমি খবর পেয়েছি যে, ইংলণ্ডে উদ্বাস্তুদের প্রবেশাধিকার দেবার ফলে প্রত্যক্ষতঃ পনের হাজার কর্মহীন ব্যক্তি কাজ পেয়েছে।

জার্মানী ছাড়ার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত জনৈক প্রাক্তন জার্মান নাগরিক হিসাবে আমার বিশ্বাস আমি আমার উদ্বাস্তু ভাইদের জন্য কথা বলতে পারি। অত্যন্ত হৃদ্যতা সহকারে আমাদের গ্রহণ করার জন্য বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে আমি তাঁদের হয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারি। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নব নব দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী এবং আমাদের প্রত্যেকেই আমরা যে সব দেশে আশ্রয় পেয়েছি, তার আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি।

তবে ক্রমাগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ হয়েছে। গত সপ্তাহের ঘটনার ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু আগমন করেছে। যে ইহুদী সম্প্রদায়ের পিছনে গণতন্ত্র ও সমাজসেবার পবিত্র ঐতিহ্য ছিল, আবার তারা এক শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে।

ইহুদী সমাজ যে সহস্র সহস্র বৎসরের ঝড়-ঝঞ্ঝাকে প্রতিরোধ করে বেঁচে আছে, এর মূলে রয়েছে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কিত বাইবেলের শিক্ষা। প্রত্যক্ষ ভাবে এই শিক্ষার প্রতি আনুগত্যই ইহুদীদের শক্তির মূলাধার। এই বেদনা-বিক্ষোভের দিনে পরস্পরকে সহায়তা দানের জন্য আমাদের প্রস্তুতি বিশেষ এক অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের পূর্বজদের মত সগৌরবে এর সম্মুখীন হবার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের সংহতি সাধন এবং আমরা এক সুমহান্ ও পরম পবিত্র আদর্শের জন্য কৃচ্ছ্র সাধন করছি—এই বোধ ছাড়া আত্মরক্ষার অন্যবিধ পন্থা নেই।

[১৯৩৯]

ইসরাইলের ইহুদী সম্প্রদায়

বিস্ময়কর উদ্দীপনা এবং আত্মত্যাগের অতুলনীয় ইচ্ছা দ্বারা ইসরাইলে যে চমৎকার ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে, আমাদের ইহুদী সম্প্রদায়ের কাছে তদপেক্ষা বিস্ময়কর আর কিছুই নেই। উদ্দীপনা ও মননশীলতার আকর এই ক্ষুদ্রায়তন মানব-গোষ্ঠী যে সাফল্য অর্জন করেছে, তার আনন্দ ও প্রশস্তি যেন আমাদের বর্তমান সময়োচিত সুমহান্ দায়িত্বভার গ্রহণের উপযুক্ত শক্তি প্রদান করে।

এই সাফল্য নিয়ে গর্ব করার সময় আমরা যেন যে আদর্শ সংসাধনার্থ এই সাফল্য, তার কথা বিস্মৃত না হই। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে : বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত আমাদের বিপদ্‌গ্রস্ত ভ্রাতৃবৃন্দকে ইসরাইলে সম্মিলিত করে উদ্ধার করা, অতীতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারা বেয়ে আমাদের স্বজাতীয়দের ভিতর যে নৈতিক আদর্শাবলীর উদ্গম ও বিকাশ হয়েছে, যথাসম্ভব তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানকারী এক জাতি গড়ে তোলা।

এই আদর্শাবলীর অন্যতম হচ্ছে শান্তি। হিংসা আধারিত শান্তি নয়, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আত্মসংযমের ভিত্তিতে রচিত শান্তিই আমাদের কাম্য। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলে আমাদের আনন্দ কথঞ্চিৎ বেদনামিশ্রিত হয়ে ওঠে। কারণ আরবদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এই লক্ষ্য থেকে বহু দূরে। এ কথা হয়ত সত্য যে অপর কেউ যদি হস্তক্ষেপ না করত এবং আমরা যদি নিজেদের মত চলতে পারতাম, তা হলে সম্ভবতঃ এতদিনে আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা এই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারতাম। কারণ আমরা শান্তি চাই এবং আমরা বুঝি যে আমাদের ভবিষ্যত উন্নতি শান্তির উপর নির্ভরশীল। আমরা যে সমান মর্যাদা সম্পন্ন, স্বাধীন ও শান্তিতে বসবাসকারী ইহুদী ও আরবের বাসভূমি অবিভক্ত প্যালেস্টাইন পাইনি, এর জন্য আমাদের বা আমাদের প্রতিবেশী তেমন দায়ী নয়। এর জন্য প্রধানতঃ

"ম্যাণ্ডেটরী শক্তি"-ই দায়ী। ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটের অধীনস্থ প্যালেস্টাইনের মত কোন দেশে যদি এক জাতি অন্য জাতির তুলনায় অধিকতর প্রভাবশালী হয়, তা হলে শাসক শক্তি বোধহয় কুখ্যাত ভেদনীতি প্রয়োগ করে শাসন করার প্রলোভন সংবরণ করতে পারে না। সরল ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে এই যে, শাসিত প্রজাদের ভিতর এমন ভাবে বিভেদ সৃষ্টি কর যে তারা যেন তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অধীনতা-পাশ ছিন্ন করার জন্য ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে। অধীনতা-পাশ আজ অপসারিত; কিন্তু ভেদনীতির বীজ ফলপ্রসূ হয়েছে এবং হয়ত ভবিষ্যতে আরও কিছু দিন ক্ষতি সাধন করবে। আশা করা যাক যে এ কুপ্রভাব যেন অধিক কাল স্থায়ী না হয়।

প্যালেস্টাইনের ইহুদীরা নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেনি; তারা চেয়েছিল বিভিন্ন দেশের ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে অবাধ বসতি স্থাপনের অধিকার। ওই সব দেশে ইহুদীদের অস্তিত্বই সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। স্বজাতীয়দের মধ্যে যারা নিজেদের মত করে বাঁচতে চায় তাদের জন্য অবাধ আগমনাধিকার চাওয়া হয়েছিল। এ কথা বললে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন করা হবে না যে, মানবেতিহাসে অদ্বিতীয় এক আত্মোৎসর্গের নিদর্শন সংস্থাপনার্থ তারা সংগ্রাম করেছিল।

সংখ্যাবলে বলীয়ান বিরুদ্ধ পক্ষীয়ের সঙ্গে সংগ্রামে যে ধন ও জনবলের আহুতি দিতে হয়, তার কথা আমি বলছি না। অথবা উপেক্ষিত, অনাদৃত ও ঊষর দেশে পথিকৃৎদের ললাটে যে অমানুষিক পরিশ্রম লিখিত থাকে, আমি তার প্রতিও ইঙ্গিত করছি না। দেশের ইহুদীদের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক সংখ্যক নবাগন্তুককে যখন উপরিউক্ত অবস্থার মধ্যে কালাতিপাতকারী জনসাধারণকে আঠার মাসের মধ্যে গ্রহণ করতে হয়, তখন তাঁদের এতদতিরিক্ত যে আত্মত্যাগ করতে হয়, আমি তার কথা চিন্তা করছি। ব্যাপারটা যে কী পরিমাণ গুরুতর তা অনুমান করার জন্য আমেরিকার ইহুদীদের একটি সমপরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ কৃতির কথা কল্পনা করা যাক। ধরে নেওয়া যাক যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এসে বসতি স্থাপন করার উপর কোন রকম বাধানিষেধ নেই। এই অবস্থায় যদি এ দেশের ইহুদীদের দেড় বৎসরের ভিতর এক লক্ষেরও অধিক অপর দেশাগত ইহুদীকে এই দেশে গ্রহণ করে তাদের সুখ-সুবিধার দায়িত্ব নিতে হত এবং তাদের এ দেশের আর্থিক কাঠামোর মধ্যে খাপ খাইয়ে নেবার কর্তব্য পালন করতে হত, তা হলে ব্যাপারটা কী রকম গুরুতর হত তার কথা চিন্তা করুন। নিঃসন্দেহেই একে প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্বের আখ্যা দেওয়া হত। কিন্তু তবু আমাদের ইসরাইলস্থ ভ্রাতৃবৃন্দ যা করেছে, তার কাছে এ কিছুই নয়। কারণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এক সুবিস্তীর্ণ, উর্বর ও বিরল-বসতি দেশ। এখানকার জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উচ্চ ও দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা অতীব বিকশিত।

ইহুদীদের প্যালেস্টাইনের সঙ্গে এর তুলনাই হতে পারে না। অতিরিক্ত উদ্বাস্তুদলের আগমনের পূর্ব হতেই সে দেশের অধিবাসীবৃন্দ শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনায় সদা-সশঙ্ক অবস্থায় এক কঠোর ও কৃচ্ছ্রতামূলক জীবন যাপন করতেন। ইসরাইলের ইহুদীদের স্বতঃপ্রবৃত্ত ভ্রাতৃজনোচিত ভালবাসার তাৎপর্য, এই প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধন ও ব্যক্তিগত অনটনের কথা একবার চিন্তা করুন।

ইসরাইলের ইহুদীদের অর্থসংগতি এই বিশাল কীর্তিকে সাফল্যমণ্ডিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ১৯৪৮ সনের মে মাস থেকে যে তিন লক্ষাধিক উদ্বাস্তু এসেছে, তার ভিতর এক লক্ষেরও অধিক ব্যক্তির জন্য বাসগৃহ বা কর্মের সংস্থান করা সম্ভব হয়নি। তাদের এমন সব দৈন্যদশাপূর্ণ শিবিরে রাখতে হয়েছে, যা আমাদের সকলের পক্ষেই অগৌরবের বিষয়।

এ দেশের ইহুদীদের কাছ থেকে যথাসময়ে যথেষ্ট সহায়তা না পাবার কারণে যেন এই চমৎকার কার্য ব্যর্থ না হয়। আমার মতে প্রতিটি ইহুদী এক অতীব মূল্যবান উপহার পেয়েছে। তারা এই অতীব চমৎকার কর্তব্য সম্পাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে।

[১৯৪৯]

বিবিধ

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন

র—ডক্টর মেণ্ডেলের সঙ্গে আজ গণিত শাস্ত্রের আধুনিকতম আবিষ্কার সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। এঁর মতে ক্ষুদ্রতম পরমাণুর জগতে আকস্মিকতারও স্থান আছে। জীবন-নাট্যের সব কিছুই একেবারে পূর্ব-নির্ধারিত স্বভাববিশিষ্ট নয়।

আ—যে সব তথ্যের কারণে বিজ্ঞান এই মতের দিকে আকৃষ্ট হয়, তারা তো কার্যকারণবাদকে সম্পূর্ণ ভাবে বিদায় দেয় না।

র—তা হতে পারে ; কিন্তু মনে হয়, সৃষ্টির মূল উপাদানগুলির মধ্যে কার্যকারণত্ব নেই। অন্য কোন শক্তি তাদের নিয়ে একটা সুশৃঙ্খল বিশ্ব গড়ে তোলে।

আ—একটা উচ্চতর স্তর থেকে এই শৃঙ্খলার স্বরূপ আমরা বুঝতে চেষ্টা করি। বৃহত্তর উপাদানগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে জীবন বা অস্তিত্বকে যখন নিয়ন্ত্রিত করে, তখন আমরা শৃঙ্খলা দেখতে পাই। কিন্তু ক্ষুদ্রতর উপাদানগুলির মধ্যে এই শৃঙ্খলা আর অনুভব করা যায় না।

র—তা হলে অস্তিত্বের গভীরতম এলাকায় এই দ্বৈত বিদ্যমান। এক দিকে অসংযত আবেগ এবং অন্য দিকে সেই আবেগকে পরিচালনা করে সমস্ত বস্তুর মধ্যে একটা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে যে ইচ্ছাশক্তি—এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ চলছে।

আ—এরা যে পরস্পরবিরোধী এ কথা আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান স্বীকার করে না। দূর থেকে দেখলে মেঘকে এক অখণ্ড সত্তা বলে মনে হয় ; কিন্তু কাছে থেকে দেখলে বোঝা যাবে যে, সেগুলি ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত বারিবিন্দু ছাড়া আর কিছু নয়।

র—মানবের মনোরাজ্যেও এর তুলনা মেলে। আমাদের কামনা-বাসনাগুলি অসংযত, কিন্তু আমাদের চরিত্র সেগুলিকে সংযত করে তাদের একটা সুসংগত সমগ্রতা দেয়। বস্তুজগতেও কি এমনি কিছু ঘটে? উপাদানগুলি কি সব স্বৈরাচারী ? তারা কি আপন আপন আবেগে চঞ্চল ? এবং সেগুলিকে শাসন করে সুনিয়ন্ত্রিত বিধির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার মত কোন শক্তি বস্তুজগতে আছে কি ?

আ—উপাদানগুলির মধ্যেও একটা গোষ্ঠীগত শৃঙ্খলার (statistical order) অভাব নেই। যেমন রেডিয়মের বস্তু-কণিকা কখনই তার আপনার নিয়ম লঙ্ঘন করবে না। চিরকালই সেগুলি একটি নিয়মে চলে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এই নিয়ম মেনে চলবে। উপাদানগুলির মধ্যেও তাই একটা গোষ্ঠীগত শৃঙ্খলা রয়েছে।

র—তা না হলে জীবন-নাট্য-প্রবাহ নিতান্ত এলোমেলো ও খাপছাড়া রকমের হত। আকস্মিকতা ও পূর্ববিধান—এই দুইয়ের চিরন্তন সংগতির মধ্য দিয়েই আমাদের জীবনলীলা চিরনবীন ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

আ—আমার বিশ্বাস, আমরা যা কিছু করি বা যা কিছুর জন্য বেঁচে থাকি, সমস্তই কার্যকারণত্বের অধীন। তবে আমরা যে সেটা সব সময় দেখতে পাই না, তা ভালই।

র—তবে মানুষের জীবনে কতকটা স্থিতিস্থাপকতাও আছে—অল্প পরিসরের মধ্যে কিছুটা স্বাধীনতা রয়েছে। আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশের জন্য সেটা প্রয়োজন। এ যেন কতকটা আমাদের ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির মত। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের মত তা অত ধরা-বাঁধার মধ্যে নেই। আমাদের সুরকাররা মোটামুটি একটা কাঠামো ঠিক করে দেন। তার মধ্যে রাগ-রাগিণী ও তাল-মান-লয়ের একটা পরিষ্কার বিধান থাকে। তবে সেই বিধানের মধ্যে গায়ক বা বাদক তাঁর অবস্থা ও প্রয়োজনানুসারে একটু-আধটু এদিক-ওদিকও করতে পারেন। কোন একটা রাগিণী বিশেষের নিয়মের মধ্যে তাঁকে অবশ্যই থাকতে হবে এবং তার পর তার মধ্যে তাঁর সংগীতাবেগের একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটাতে কোন বাধা নেই। সুরের ভিত্তি এবং তার উপর একটা কাঠামো খাড়া করে দেওয়ার জন্য আমরা সুরকারের প্রতিভার তারিফ করি, কিন্তু গায়ক বা বাদকের কাছ থেকেও রাগিণীর মধ্যে নানা সুচিক্কণ ও কারুকার্যের বৈচিত্র্য রচনার কলাকৌশল আমরা আশা করে থাকি। সৃষ্টির মধ্যেও সমস্ত অস্তিত্বের কেন্দ্রগত নিয়ম আমরা মেনে চলি। তবে সৃষ্টি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না নিলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের স্বল্প পরিসরের মধ্যেই পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে।

আ—এটা সম্ভব সেখানেই, যেখানে সংগীতের মধ্যে জনমত পরিচালনার জন্য বহুকালের আচরিত একটা শক্তিশালী শিল্প-সংস্কার থাকে। ইউরোপের সংগীত-শাস্ত্র জনসাধারণের শিল্প ও অনুভূতির রাজ্য থেকে অনেক দূরে সরে এসে স্বকীয় সংস্কার ও প্রথাগুলি নিয়ে যেন অনেকটা গুপ্ত শিল্পের মত হয়ে উঠেছে।

র—আপনাদের তাই এই অতীব জটিল সংগীত-শাস্ত্রের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে নতি স্বীকার করতে হয়। আমাদের দেশে কিন্তু গায়কের স্বাধীনতা তার সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিত্বের অনুরূপ হয়ে থাকে। যে সুরকারের সুর-লহরীর রূপায়ণ গায়ককে করতে হবে, তার কোন রাগিণীর সাধারণ রূপের ব্যঞ্জনার মধ্যে আপনাকে স্রষ্টা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার মত শক্তি থাকলে গায়ক মূল সুরস্রষ্টার গান নিজের মত করেই গাইতে পারে।

আ—অতীব উচ্চাঙ্গের কুশলতা না থাকলে মূল সুরের অন্তর্নিহিত বিরাট ভাবটি এমন ভাবে ধরা যায় না, যাতে করে সেই সুরের মধ্যে ইচ্ছামত অদল-বদল করা চলে। আমাদের দেশে সুরের সমস্ত পরিবর্তনই আগে থেকে নির্দেশ করা থাকে।

র—নিজেদের আচরণে মঙ্গলের সমস্ত নিয়মগুলি মেনে চলতে পারলেই আমরা

সত্যকারের আত্মবিকাশের স্বাধীনতা পাই। আচরণের নিয়ম তো রয়েছেই ; কিন্তু যে চরিত্র সেগুলিকে যথার্থ ও প্রাতিস্বিক করে তোলে, তা আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি। আমাদের সংগীতেও এই স্বাধীনতা ও পূর্ববিধানের দ্বৈরাজ্য আছে।

আ—সংগীতের বাণী সম্বন্ধেও কি স্বাধীনতা আছে? অর্থাৎ গান গাইবার সময় গায়ক কি ইচ্ছামত সেই গানে নিজের কথা জুড়ে দিতে পারেন?

র—হ্যাঁ। বাঙলা দেশে কীর্তন নামে এক রকম গান আছে। কীর্তন গাইবার সময় ইচ্ছা করলে কিছু কিছু নিজস্ব কথা জুড়ে দেবার স্বাধীনতা গায়কের থাকে। এর ফলে উচ্ছ্বাস অনেকখানি বেড়ে যায়। কারণ শ্রোতারা সব সময়েই গায়কের জুড়ে দেওয়া একটা নূতন স্বতঃস্ফূর্ত মধুর ভাবাবেগে পুলকিত হয়ে ওঠেন।

আ—ছন্দের নিয়ম কি খুব কঠোর?

র—হাঁ, অবশ্যই। ছন্দের মাত্রা একটুও অতিক্রম করে যাবার জো নেই। গায়ককে তার সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেই নির্দিষ্ট তাল ও লয় মেনে চলতে হবে। ইউরোপের সংগীতে লয় সম্বন্ধে আপনাদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা আছে ; কিন্তু স্থর সম্বন্ধে নেই। ভারতবর্ষে স্থর সম্বন্ধে কিছুটা স্বাধীনতা থাকলেও লয় সম্বন্ধে নেই।

আ—ভারতবর্ষীয় সংগীত কি কথার সাহায্য না নিয়ে গাওয়া যেতে পারে? বিনা কথায় কি সংগীত বোঝা যায়?

র—আমাদের এমন অনেক গান আছে, যার কথার কোন অর্থ হয় না। সেখানে কেবল ধ্বনিই স্থরগুলিকে বহন করে। উত্তর ভারতের সংগীত একটা স্বতন্ত্র কলা। বাংলা দেশের সংগীতের মত ভাব ও ভাষার ভাষ্য রচনা করা তার কাজ নয়। সে সংগীত বড়ই সূক্ষ্ম ও জটিল—যেন একটা স্বতন্ত্র স্থর-জগত।

আ—সে সংগীত কি বহুধ্বনিবিশিষ্ট?

র—যন্ত্র ব্যবহার করা হয় বটে, তবে তা সংগতের জন্য নয়। তাল রক্ষা এবং স্থরের ব্যাপ্তি ও গভীরতার জন্য যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। আপনাদের সংগীতে সংগতের চাপে স্থর কি ক্ষুণ্ণ হয় না?

আ—হয় বইকি, খুবই হয়। কখনও কখনও সংগতের মধ্যে স্থর একেবারে চাপা পড়ে যায়।

র—সংগীতের স্থর ও সংগত চিত্রে রেখা ও রঙের মত। একটা সাধারণ রেখা-চিত্র সর্বাঙ্গস্থন্দর হতে পারে ; কিন্তু তাতে রঙ লাগালে সেটা হয়তো অর্থহীন ও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তবে রঙ রেখাকে চাপা দিয়ে অস্পষ্ট করে না ফেললে রেখার সঙ্গে মিশে স্থমহান্ চিত্র সৃষ্টি করতে পারে।

আ—এটা বেশ চমৎকার তুলনা। রেখা রঙের চেয়ে অনেক প্রাচীনও বটে।

মনে হয় গঠনের দিক থেকে আপনাদের সুর আমাদের সুরের চেয়ে অনেক বেশী সমৃদ্ধ। অন্ততঃ জাপানী সুরকে তো তা-ই মনে হয়।

র—আমাদের মনের উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংগীতের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখা শক্ত। পাশ্চাত্ত্য সংগীত আমার মনকে খুব নাড়া দেয়। আমি বেশ অনুভব করি যে সে সংগীতের ঠাট যেমনি বিশাল, তার রচনাও তেমনি উদার—সে সংগীত মহীয়ান্। আমাদের নিজেদের সংগীত তার মূলগত গীতিধর্মী আবেদনের জন্য আমাকে মুগ্ধ করে। ইউরোপের সংগীতের ধরনটা মহাকাব্যের মত। এর পটভূমি বিশাল ও এর ঠাট গথিক ধরনের।

আ—ঠিক ঠিক, একেবারে ঠিক। আপনি ইউরোপীয় সংগীত প্রথম শুনেছিলেন কবে?

র—আমি যখন প্রথম ইউরোপে এসেছিলাম। তখন আমার বয়স সতের। তখন থেকে ইউরোপের সংগীতের সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয়। কিন্তু তার আগেও আমাদের বাড়ীতে আমি পাশ্চাত্ত্য সংগীত শ্রবণ করেছি। ছেলেবেলাতেই শোপাঁ (Chopin) এবং অন্যান্য সুরকারদের সংগীত আমি শুনেছি।

আ—আমাদের সংগীতে আমরা এত বেশী অভ্যস্ত যে একটা কথা আমরা ইউরোপীয়রা ঠিক বুঝতে পারি না। আমরা জানতে চাই যে, যে অনুভূতিকে আশ্রয় করে আমাদের সংগীত রচিত হয় তা কি কোন মৌলিক মানবীয় অনুভূতি, না এ দেশের কোন প্রথাগত অনুভূতির উপর আমাদের সংগীত-সৌধ গড়ে ওঠে? যে সংগৎ-অসংগৎ আমাদের কানে লাগে, সেটা কি স্বাভাবিক, না অভ্যাসজাত?

র—পিয়ানোটা কেমন যেন আমি বুঝতে পারি না। তার চেয়ে বেহালা আমার অনেক বেশী ভাল লাগে।

আ—যে ভারতবাসী যৌবনে কখনও ইউরোপীয় সংগীত শোনেনি, তার উপর আমাদের সংগীতের কেমন প্রতিক্রিয়া হয়, একথা জানতে আমার বড় আগ্রহ হয়।

র—একবার আমি একজন ইংরেজ সংগীতজ্ঞকে কোন উচ্চাঙ্গ (classical) সংগীত বিশ্লেষণ করে কোন্ কোন্ উপাদানের জন্য তার সৌন্দর্য—এ কথা আমাকে বুঝিয়ে দিতে বলেছিলাম।

আ—মুশকিল হচ্ছে এই যে, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য যে কোন দেশেরই হোক না কেন, সত্যকারের ভাল সংগীত বিশ্লেষণ করা যায় না।

র—ঠিক তাই। শ্রোতাকে যা গভীরভাবে স্পর্শ করে, তা তার নাগালের বাইরে।

আ—আমাদের অনুভূতি-লোকের প্রতিটি মৌলিক বস্তুর ক্ষেত্রেই সদা-সর্বদা এই অনিশ্চয়তা থাকবে। ইউরোপ কিংবা এসিয়া যে কোন দেশের শিল্প সম্বন্ধীয়

অভিজ্ঞতার মূলেও ওই একই কথা রয়েছে। এমনকি আপনার টেবিলের উপর আমি যে লাল ফুলটি দেখছি, আমাদের দুজনের কাছে তা অভিন্ন না-ও হতে পারে।

র—তবুও এদের মধ্যে চিরকাল একটা সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়া চলে আসছে। ব্যক্তিগত রুচি সার্বজনীন মাপকাঠির সঙ্গে সংগতি রেখে চলেছে।

[১৯৩০]

সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে

রসিকতা করে বা উচ্ছ্বাসের মাত্রাধিক্য হওয়ায় অথবা সাময়িক উষ্মা বশতঃ মানুষ যা কিছু বলে থাকে, তা শেষ অবধি মারাত্মক প্রতীয়মান হলেও তার প্রতিটি শব্দের জন্য তার কাছে প্রকাশ্যে কৈফিয়ত তলব করা হয়ত ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তিসংগত ও স্বাভাবিক। কিন্তু একজনের নামে অন্যে কে কী বলেছে, তার জন্য তার কাছে প্রকাশ্যে জবাবদিহি দাবি করা নিঃসন্দেহে এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। আপনারা প্রশ্ন করবেন, "কার আবার এমন দুর্ভোগ হল?" শুনুন তা হলে। জনসাধারণের মনে যাঁরই সম্বন্ধে এমন প্রচণ্ড আগ্রহ আছে যে সাক্ষাৎকারপ্রার্থীর দল তাঁর পিছনে ধাওয়া করেন, তাঁর কপালেই এ বিড়ম্বনা ঘটে থাকে। আপনারা অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন; কিন্তু আমার এ সম্বন্ধে বহু বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এবং তার কথা এবার আমি আপনাদের জানাব।

নিম্নলিখিত অবস্থার কথা কল্পনা করুন। একদিন সকালে জনৈক সাংবাদিক এসে বন্ধুভাবে আপনার মিত্র "ক" সম্বন্ধে আপনাকে কিছু জানাতে অনুরোধ করলেন। প্রথমে নিশ্চয় আপনি এ-জাতীয় প্রস্তাব শুনে অপমানের মত বোধ করবেন। কিন্তু শীঘ্রই উপলব্ধি করবেন যে আপনার পরিত্রাণের উপায় নেই। কিছু বলতে অস্বীকার করলে সে ভদ্রলোক লিখবেন, "ক বাবুর অন্তরঙ্গ সুহৃদ বলে আখ্যাত একজনকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি কিন্তু চালাকি করে আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। পাঠক এর থেকে অনিবার্য সিদ্ধান্ত করতে পারেন।" সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন যে, রক্ষা পাবার উপায় নেই। তাই আপনি বললেন, "ক বাবু বেশ হাসিখুশী এবং ঘোর-প্যাঁচবিহীন লোক। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে খুব পছন্দ করেন। যে কোন অবস্থায় ভালর দিকটাই তাঁর চোখে পড়ে। তাঁর উৎসাহ ও উদ্যমের কোন সীমা নেই। নিজের কাজে তিনি সর্বক্ষণ তন্ময় থাকেন। পরিবারের প্রতি তাঁর খুবই টান এবং রোজগারের সবটুকু স্ত্রীর পদপ্রান্তে সমর্পণ করেন।......"

এবার সাংবাদিকের কলমের কেরামতি দেখুন, "ক বাবু সব কিছুকেই লঘুভাবে নেন এবং বিশেষতঃ বেশ চেষ্টা-চরিত্র করে লোকের সঙ্গে মেশার ও তাদের চোখে পড়ার স্বভাব আছে বলে তিনি সকলের সঙ্গেই ভাব জমাতে পারেন। কাজের

কাছে তিনি একেবারে আত্মবিক্রয় করে বসে আছেন এবং এর বাইরে কোন সার্বজনীন বিষয় বা বৌদ্ধিক কাজকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাঁর নেই। তিনি অবিশ্বাস্য ভাবে তাঁর স্ত্রীর মাথা খাচ্ছেন এবং একেবারে তাঁর কড়ে আঙ্গুলের ডগায় নাচছেন……"

কোন সাক্ষাৎকারের সত্যকার বিবরণ হলে একে আরও সরস করা যেত। তবে আমার মনে হয় আপনার ও আপনার বন্ধু "ক" বাবুর কাছে এখনকার মত এইটুকুই যথেষ্ট। পরের দিন কাগজে আপনার বন্ধু এই মন্তব্যটি এবং এই-জাতীয় আরও অনেক কিছু পড়লেন। তিনি যতই দিলদরিয়া মেজাজের ও উদার ধাতের হোন না কেন, এর পর আপনার বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশের সীমা রইল না। বন্ধুর ক্ষতির জন্য আপনার এদিকে অকথ্য মনঃপীড়া হচ্ছে, বিশেষতঃ আপনি সত্যসত্যই তাঁর অনুরক্ত।

বলুন তো মশাই, এর পর কী করবেন ? যদি জানেন তবে শীঘ্র আমাকে বলবেন। কারণ যথাসম্ভব সত্বর আমি আপনাদের পদ্ধতি গ্রহণ করতে চাই।

[১৯৩৪]

একটি উত্তর

(জার্মানীতে ইহুদীবিরোধী যে আন্দোলন চলছিল, তার সমালোচনা করে ফরাসী দেশ থেকে এক ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হয়। আইনস্টাইনকে এই ঘোষণা-পত্রের সঙ্গে যুক্ত হতে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তার নিম্নলিখিত উত্তর দেন।)

আমার হৃদয়ের সঙ্গে এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটির অতিমাত্রায় মিল আছে বলে সব দিক দিয়ে আমি এটি অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করে দেখেছি। এর ফল স্বরূপ আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, নিম্নলিখিত দুটি কারণ বশতঃ এই অত্যধিক গুরুতর বিষয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন অংশ গ্রহণ করতে পারি না।

প্রথমতঃ যাই হোক না কেন, এখনও আমি জার্মান নাগরিক এবং দ্বিতীয়তঃ আমি ইহুদী। প্রথম কারণটি সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই যে, আমি বহুকাল যাবত জার্মান গবেষণা-প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে যুক্ত আছি এবং জার্মানীতে আমাকে পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস করা হয়েছে। আজ সেখানে যা চলছে তার জন্য আমার মনে যত প্রচণ্ড ক্ষোভই থাক না কেন এবং সরকারের সমর্থনে সেখানে যে সব ভীষণ ভুল করা হচ্ছে যতই আমি তার তীব্র সমালোচনা করি না কেন, কোন বিদেশী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রারব্ধ কোন কার্যকলাপে ব্যক্তিগত ভাবে অংশ গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার অবস্থা যাতে সঠিক ভাবে বুঝতে পারেন তার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন আমারই মত অবস্থায় পড়ে কোন ফরাসী

নাগরিক একদল প্রধান জার্মান রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে মিলে ফরাসী সরকারের আচরণের প্রতিবাদ করল। সে অবস্থায় সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা আপনাদের স্বদেশীয় ভাইটির অভিযোগের ভিত্তি যথার্থ বলে আপনার মনে হলেও আমার বিশ্বাস তাঁর আচরণকে আপনি বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন বলে আখ্যা দেবেন। ড্রেফুসের (Dreyfus) মামলার সময় এমিল জোলা ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাওয়া প্রয়োজন মনে করলেও তিনি নিশ্চয় জার্মান সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফরাসী সরকারের নিন্দা করতেন না। জার্মানীর এই-জাতীয় সরকারী কর্মচারীদের কাজের সমর্থন করলেও তিনি স্বয়ং প্রতিবাদ জ্ঞাপন করার জন্য তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হতেন না। স্বদেশবাসীর আচরণে তিনি শুধু মরমে মরে থাকতেন। দ্বিতীয়তঃ, অবিচার ও হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যদি শুধু মানবতা ও ন্যায়-বিচারবোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে আসে, তবে তা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। আমার মত ইহুদী মাত্রের সঙ্গে নাড়ির টান বিশিষ্ট একজন ইহুদী সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা প্রযুজ্য নয়। তার কাছে ইহুদীদের উপর কোন অবিচারের অর্থ স্বয়ং তার উপর অত্যাচার। নিজের মামলার বিচারক যে স্বয়ং হতে পারে না, তাকে নিরপেক্ষ বাইরের লোকের ন্যায়-বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

আমার অসামর্থ্যের কারণ ব্যক্ত করলাম। তবে একটি কথা আমাকে স্বীকার করতে হবে। ফরাসী ঐতিহ্যের অন্যতম মহান্ বৃত্তি হচ্ছে ন্যায়-বিচারের প্রতি আগ্রহ এবং এর জন্য আমি চিরকাল তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করি।

[১৯৩৪]

গণিতজ্ঞের মনোজগৎ

(ফরাসী গণিতজ্ঞ জাক্. এস. আদামার ক্রিয়াশীল অবস্থায় গণিতজ্ঞদের মানসিক কার্যপ্রণালী জানার জন্য তাঁদের মনস্তত্ত্বের পরিবীক্ষণ করেন। নিম্নে দুটি প্রশ্ন ও আইনস্টাইন প্রদত্ত তার উত্তর দেওয়া হল।)

গণিতজ্ঞরা কোন্ আভ্যন্তরিক বা মানসিক প্রতিরূপ এবং কী-জাতীয় "আভ্যন্তরীণ শব্দ" ব্যবহার করেন জানতে পারলে মনোবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্যের সহায়তা হবে। এ কি পেশীসঞ্চালক স্নায়ুর ক্রিয়া (motor action), অথবা শ্রুতিজনিত কিংবা চাক্ষুষ প্রতিক্রিয়া? তা যদি না হয়, তবে কি এ পরিবীক্ষণের বিষয় অনুসারে পূর্বোক্ত সব কয়টি প্রতিক্রিয়ার মিশ্রিত কোন রূপ?

বিশেষতঃ গবেষণাকালীন চিন্তার সময় মনোরাজ্যের চিত্রসমূহ বা আভ্যন্তরীণ শব্দাবলী পরিপূর্ণ সংবিৎ-এর মধ্যে আবির্ভূত হয়, না, চেতনা-রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে তারা মূর্ত হয়ে ওঠে?

প্রিয় সহকর্মী,

নিম্নে সংক্ষেপে আমি আমার সাধ্যানুসারে আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। উত্তরগুলি যে আমার নিজেরই কাছে সন্তোষজনক মনে হয়েছে, তা নয়। আমি এ ছাড়া অপর কোন প্রশ্নের উত্তর দিলে আপনি যে চিত্তাকর্ষক অথচ দুরূহ কার্যভার নিয়েছেন তাতে সহায়তা হবে বলে যদি আপনার মনে হয়, তবে আমি তার জন্যে প্রস্তুত আছি।

(ক) আমার চিন্তার গঠনপদ্ধতিতে প্রচলিত প্রথায় লিখিত ও কথিত বাক্য এবং ভাষার কোন রকম ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। যে সব মানসিক সত্ব চিন্তার মৌলিক অংশ রূপে ক্রিয়াশীল বলে প্রতীয়মান হয়, সেগুলি প্রত্যুত কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন এবং মোটামুটি সুস্পষ্ট প্রতিরূপ। "স্বেচ্ছাপূর্বক" এদের পুনর্জাগরিত এবং সম্মিলিত করা যায়।

অবশ্য ওইসব মৌলিক অংশে এবং প্রাসঙ্গিক যৌক্তিক ধারণার ভিতর এক-জাতীয় সম্পর্ক বিদ্যমান। এ কথাও স্পষ্ট যে, উপরিউক্ত চিন্তার মৌলিক অংশের সঙ্গে প্রত্যুত যে আবছা খেলা চলে, শেষ অবধি তার মানসিক আবেগজনিত ভিত্তি হচ্ছে যুক্তিসংগত ধারণায় উপনীত হবার আকাঙ্ক্ষা। তবে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই সম্মিলনকারী ক্রীড়া যেন সর্জনাত্মক চিন্তার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বোধ হয়। চিন্তাকে শব্দের মাধ্যমে যুক্তিসিদ্ধ আকৃতি দেবার পূর্বে অথবা অপরের কাছে প্রকাশক্ষম অন্যবিধ সাংকেতিক চিহ্নে রূপায়িত করার পূর্বে এই ক্রীড়া চলতে থাকে।

(খ) আমার কাছে উপরিউক্ত মৌলিক অংশের কতকগুলি দর্শনেন্দ্রিয় সঞ্জাত এবং কতকগুলি আবার পেশল বা স্থূলজাতীয়। পূর্বোল্লিখিত ভাবানুষঙ্গিক ক্রীড়া যখন যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ়মূল হয়ে যায় এবং ইচ্ছামাত্র যখন তাকে পুনর্জাগরিত করার মত অবস্থা সৃষ্ট হয়, তখন হয় এর দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা। এইবার তীব্রভাবে সনাতন-রীতিধর্মী বাক্য বা অন্যবিধ সাংকেতিক চিহ্নের শরণ যাচ্ঞা করা হয়।

(গ) পূর্বোক্ত উক্তি অনুযায়ী পূর্বোল্লিখিত মৌলিক অংশের সঙ্গে ক্রীড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবমনের অনুসন্ধিৎসাজাত কতকগুলি যৌক্তিক সম্বন্ধের সঙ্গে সংগতি স্থাপন।

(ঘ) চাক্ষুষ এবং পেশীসঞ্চালক স্নায়ুর ক্রিয়া : শব্দ যে সময় একান্তই মাঝখানে এসে পড়ে, আমার ক্ষেত্রে তারা নিছক শ্রুতিজনিত (auditive)। তবে তারা শুধু পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকরণেই এইভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

(ঙ) আমার মতে আপনি যাকে পূর্ণ সংবিৎ বলছেন, তা একটা চূড়ান্ত অবস্থা। কদাচ পূর্ণমাত্রায় এর উপলব্ধি সম্ভবপর নয়। সংবিৎ-এর সংকীর্ণতা বলে যে একটা কথা আছে, তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ আছে বলে আমার মনে হয়।

মন্তব্য : অধ্যাপক ম্যাক্স ভেরথিমার কেবল ভাবানুষঙ্গ, অর্থাৎ পুনর্জাগরিত করণক্ষম মৌলিক অংশের সম্মিলন এবং বোধের (understanding) ভিতর পার্থক্য অনুধাবন করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কতটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের পর্যালোচনা করেছে, তা বিচার করার ক্ষমতা অবশ্য আমার নেই।

[১৯৪৫]

এ যুগের মৌলিক সমস্যা

পুস্তকটিতে ঘটনা, সত্য ঘটনা ছাড়া আর কিছু নেই এবং এসব ঘটনার বিবরণ ইতঃপূর্বে প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যথার্থই পুস্তকটির গুরুত্ব আছে এবং এর শৈক্ষণিক মূল্যও যথেষ্ট। গ্রন্থটি গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতবর্ষের শান্তিময় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত। আমাদের কালে—একেবারে আমাদের চক্ষের সম্মুখে ওইসব ঘটেছে। গ্রন্থটি যে কারণে উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন হয়ে উঠেছে তা হল ভারতবর্ষের ওইসব ঘটনাবলী থেকে যথোপযুক্ত বিবরণ বেছে নিয়ে তাদের সুচারুরূপে সাজিয়ে উপস্থাপিত করার নৈপুণ্য। দক্ষ ঐতিহাসিকের হাতে বিভিন্ন ঘটনার সূত্র থাকে এবং তার টানা-পোড়েনে তিনি একটি নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তোলেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের ক্ষমতা ওই-জাতীয় ঐতিহাসিকের সঙ্গে তুলনীয়।

একজন নব্যযুবক কী করে এ রকম সুপরিণত রচনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন? গ্রন্থের ভূমিকাতে লেখক এ রহস্যের সমাধান করেছেন : যত ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হোক না কেন, একটি বিশেষ আদর্শের সেবা করাকে তিনি নিজের অবশ্যআচরণীয় কর্তব্য জ্ঞান করেছেন। কী এই আদর্শ? যন্ত্রকৌশলের ক্ষেত্রে যেসব নানাবিধ অগ্রগতি হচ্ছে তার কারণে মানবতার অস্তিত্ব বিপন্ন, মনুষ্যজাতি এক শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির সম্মুখীন। আত্মবিনাশের এই বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নৈতিকজীবনের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা এবং গান্ধীর অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এ যুগে এই শক্তি স্পষ্টভাবে প্রকট হয়েছে। সম্ভাব্য অধোগতিকে ব্যক্ত করার জন্য 'নৈর্ব্যক্তিকরণ' বা 'ব্যক্তিসত্তাবিরহিত অবস্থা' (depersonalization), 'সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ' (regimentation) ও 'সর্বব্যাপী যুদ্ধ' (total war) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর মুক্তির পন্থা রয়েছে, "গান্ধী প্রদর্শিত পন্থায় ব্যক্তিগত দায়িত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে অহিংসা ও মানবসেবার ব্রত" গ্রহণ করার মধ্যে। আমি বিশ্বাস করি যে গ্রন্থকারের এই দাবি সম্পূর্ণরূপে সংগত যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন 'মধ্যপন্থার' অস্তিত্ব নেই।

ন্যুরেমবার্গ-বিচারের সময় নিম্নোক্ত আদর্শ পালন করার চেষ্টা করা হয়েছিল :

কোন ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্বকে রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা চেপে মারা যায় না। শীঘ্রই যেন সেই দিনের আবির্ভাব হয় যখন এই নীতিকে কেবল পরাজিত জাতির নাগরিকদের উপর প্রযুজ্য বিবেচনা করা হবে না।*

[১৯৫৩]

গান্ধীর পথে চলতে হবে

(সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচিত প্রশ্নোত্তর থেকে।)

প্রশ্ন: এ কথা বললে কি অতিরঞ্জন করা হবে যে পৃথিবীর ভাগ্য আজ এক সরু সুতোয় ঝুলছে?

উত্তর: না, এ উক্তি অতিরঞ্জিত নয়। মানবসভ্যতার ভবিষ্যত চিরকালই সরু সুতোয় ঝুলছে······তবে ইতিহাসের কোন যুগেই আজকের মত বিপজ্জনকভাবে ঝুলত না।

প্রশ্ন: এই যুগের এই ভীষণ সংকট সম্বন্ধে কী ভাবে সকলকে সচেতন করে তোলা যায়?

উত্তর: আমি বিশ্বাস করি যে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যে এর সমাধান নেই। এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে যে, একমাত্র ধৈর্যমণ্ডিত পারস্পরিক আলোচনা ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য কোন রকম বৈধানিক ভিত্তি রচনার মাধ্যমে সামরিক ধ্বংসলীলার কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এই বৈধানিক ভিত্তির পিছনে এক যথেষ্ট শক্তিশালী নির্বাহী তন্ত্র—সংক্ষেপে বলতে গেলে কোন-না-কোন প্রকারের বিশ্ব-রাষ্ট্রশক্তি থাকবে।

প্রশ্ন: পারমাণবিক মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতার ফলে অপর একটি বিশ্বযুদ্ধ ত্বরান্বিত হচ্ছে, না, কেউ কেউ যেমন বলে থাকেন, এর দ্বারা যুদ্ধ নিরোধের পথ প্রশস্ত হচ্ছে?

উত্তর: মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতা যুদ্ধ পরিহারের পথ নয়। এই লক্ষ্যাভিমুখী প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের সর্বনাশের সন্নিকটকর্তী করে। মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতা প্রকাশ্য সংঘর্ষ নিরোধের জঘন্যতম পদ্ধতি। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রোত্তর পর্যায়ে বিধিবদ্ধভাবে নিঃশস্ত্রীকরণ না করলে যথার্থ শান্তি সংস্থাপিত হতে পারে না। আমি আবার বলব যে, অস্ত্রসজ্জা দ্বারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা যায় না, এর ফলে নিশ্চিতভাবে আমরা যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাই।

---

* জেনে শার্প লিখিত 'গান্ধী উইলডস দি ওয়েপন অফ মর‍্যাল পাওয়ার' গ্রন্থের ভূমিকা হইতে।

প্রশ্ন : যুদ্ধ-প্রস্তুতি এবং বিশ্ব-সমাজ গঠন প্রচেষ্টা কি এক সঙ্গে চলতে পারে ?

উত্তর : শান্তির আকাঙ্ক্ষা এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতির মধ্যে কোন মতেই সংগতি বিধান করা যায় না। এবং অন্য যে কোন যুগের তুলনায় আমাদের যুগে এবংবিধ সমন্বয় প্রচেষ্টা আরও অসম্ভব।

প্রশ্ন : আমরা কি যুদ্ধ পরিহার করতে পারব ?

উত্তর : এর উত্তর অত্যন্ত সহজ। আমরা যদি শান্তির সপক্ষে যাবার সৎ সাহসের পরিচয় দিতে পারি, তা হলে **নিশ্চয়** শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন : কোন্ উপায়ে ?

উত্তর : একমত হবার দৃঢ় **ইচ্ছা** দ্বারা। এ কথা স্বতঃপ্রমাণিত। খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা ছেলেখেলা করছি না। মানব-অস্তিত্বের পক্ষে চরম সংকট-জনক অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা কালাতিপাত করছি। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যাবলী সমাধানের জন্য আপনারা যদি দৃঢ় সংকল্প না করেন, তা হলে কিছুতেই আপনারা শান্তিময় সমাধানে উপনীত হতে পারবেন না।

প্রশ্ন : আগামী দশ পনের বৎসরে পারমাণবিক শক্তি আমাদের সভ্যতার উপর কী প্রভাব বিস্তার করবে বলে আপনি অনুমান করেন ?

উত্তর : এ প্রশ্ন এখন অপ্রাসঙ্গিক। এখনই এর যে যান্ত্রিক সম্ভাবনা রয়েছে, তা সন্তোষজনক······তবে এর সদুপযোগ করতে হবে।

প্রশ্ন : পারমাণবিক শক্তির ফলে আমাদের জীবনযাত্রায় বিরাট্ পরিবর্তন আসবে বলে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী ?······উদাহরণ স্বরূপ দিনে মাত্র দুই ঘণ্টা পরিশ্রম করার সম্ভাবনার কথা নেওয়া যেতে পারে।

উত্তর : মানুষ হিসাবে সর্বদাই আমরা পূর্ববৎ থেকে যাই। বস্তুতঃ আমাদের ভিতর একটা বড় রকমের কিছু পরিবর্তন ঘটে না। পাঁচ ঘণ্টা কাজ করছি, না, দুই ঘণ্টা—এটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা সামাজিক ও আর্থিক।

প্রশ্ন : যে সব পারমাণবিক বোমা মজুদ রয়েছে, তা দিয়ে আপনি কী করতে বলেন ?

উত্তর : এগুলি কোন রাষ্ট্রোত্তর প্রতিষ্ঠানের হস্তে সমর্পণ করতে হবে। যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ববর্তী কালে কোন রকম রক্ষক শক্তির অস্তিত্ব রাখতেই হবে। একতরফা নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব নয় এবং সে কথা এখানে উঠছেও না। একমাত্র কোন আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের হাতেই অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করা হবে। রাষ্ট্রোত্তর সরকারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত রীতিবদ্ধ নিঃশস্ত্রীকরণ ছাড়া অন্য কোন সম্ভাব্য

পন্থা নেই। নিরাপত্তার সমস্যাকে খুব বেশী যান্ত্রিক বা নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। শান্তি সংস্থাপনের ইচ্ছা এবং এই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপযোগী পদক্ষেপ করতে প্রস্তুত থাকাই সবচেয়ে বড় কথা।

প্রশ্ন : যুদ্ধ বা শান্তির বিষয়ে একক ভাবে কোন ব্যক্তি কী করতে পারে ?

উত্তর : কংগ্রেস (আমেরিকান—অনুঃ) ইত্যাদিতে যাঁরা নির্বাচিত হবার জন্য প্রয়াস করছেন, একক ব্যক্তি তাঁদের কাছ থেকে এই মর্মে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি আদায় করার চেষ্টা করতে পারেন যে তাঁরা বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠন এবং তার অনুকূলে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সংযত করার প্রচেষ্টা করবেন। জনমত সৃষ্টির ব্যাপারে প্রত্যেকেই সম্পৃক্ত···এবং যুগের প্রয়োজনীয়তা তাঁকে ঠিকমত উপলব্ধি করতে হবে।···সত্য কথা বলার মত সৎ সাহসও তাঁর থাকা চাই।

প্রশ্ন : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বেতার এখন সাতাশটি ভাষায় বিশ্বের কোণে কোণে এই প্রশ্নোত্তরিকা প্রচার করছে। এই সংকটজনক মুহূর্তে বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আপনার কোন্ বাণী প্রচার করব ?

উত্তর : সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার বিশ্বাস আমাদের যুগের তাবৎ রাজনীতিজ্ঞের ভিতর গান্ধীর দৃষ্টিকোণই সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের কাজ করা উচিত। স্বীয় আদর্শ রক্ষার জন্য আমরা হিংসা প্রয়োগ করব না। আমরা যা অন্যায় বিবেচনা করি, তার সঙ্গে অসহযোগ করব।

[১৯৫০]

॥ সমাপ্ত ॥

পরিশিষ্ট

আইনস্টাইন

তিরিশ বছর আগে আইনস্টাইন যে প্রবন্ধে আপেক্ষিকবাদের স্থচনা করেন, তাহা পদার্থ-বিজ্ঞানে নূতন যুগের স্থচনা করিয়াছে। জড়জগতের ঘটনা সমূহের বিবৃতি ও উহাদের মধ্যে কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক যে দেশ ও কাল রূপ প্রক্ষেপভূমির পরিকল্পনা করেন, তাহা যে দর্শকনিরপেক্ষ নয়, দ্রষ্টার গতির সহিত তাহার পরিকল্পিত দেশ-কাল-ধর্মের যে নিকট ও নিত্য সম্পর্ক আছে, এইটিই এই নূতন মতবাদের প্রধান কথা। এই তত্ত্বটি দার্শনিকের কাছে খুব নূতন না ঠেকিলেও ইহাকে স্বীকার করিয়াও যে পদার্থ-বিজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, এই সত্য একেবারে অনায়াসবোধ্য কিংবা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ফলতঃ আইনস্টাইনের পূর্বে কোন বৈজ্ঞানিকই ইহা সম্ভব বলিয়া ভাবেন নাই। দ্রষ্টানির্বিশেষে যে দেশকালের ব্যবধানের পরিমাণ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সম্ভব এবং ওই পরিমিতির উপর নির্ভর করিয়া গণিতের সাহায্যে জড়বস্তুর অবস্থান ও গতি কিংবা ঘটনার অবসম্পাতের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে, এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানের মূলে বর্তমান। কাজেই নিউটন প্রমুখ পূর্বাচার্যেরা দেশকালের ধর্ম ও মান ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ও স্বতঃপ্রতিষ্ঠ, এই কথা স্বীকার করিয়াই পদার্থ-বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করিয়াছেন। দেশকালের জন্য ইউক্লিডীয় জ্যামিতিই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল ছিল। দূরত্বের মাপকাঠি যে সকল দ্রষ্টার পক্ষে একই, ইহা তাঁহারা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেন। গতিভঙ্গে কিংবা স্থান পরিবর্তনে যে ওই মাপকাঠির কোন রূপান্তর হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির অগোচর ছিল।

কালমান যন্ত্রের ধ্রুবত্বের বিষয়েও তাঁহারা একই প্রকার নিঃসন্দিহান ছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বে ও প্রিন্সিপিয়ার গতিবিজ্ঞানে দেশকালের ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রষ্টা বিভিন্ন হইলেও দেশকালের প্রক্ষেপভূমি সকলের পক্ষে একই এবং তাহার ধর্ম দ্রষ্টার বিশেষত্বের অপেক্ষা রাখে না, এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত গণিতশাস্ত্র ও পদার্থ-বিজ্ঞান প্রায় দুই শত বৎসর সর্বগ্রাহ্য ছিল। যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রয়োগভূমি বিস্তৃত হইল এবং সর্বত্রই ঈক্ষণ ও গণনার মধ্যে নিত্য সামঞ্জস্য আছে কি না তাহারই নিরন্তর পরীক্ষা চলিতে লাগিল। ফলে সূক্ষ্মমানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও গণনার মধ্যে যে অসংগতি ধরা পড়িতে লাগিল, তাহার নিরাকরণ আর পুরাতন বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হইল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আলোকতরঙ্গের উপর দ্রষ্টার গতিবৈশিষ্ট্যের কোন প্রভাব আছে কিনা, এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ও তৎসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার

পরীক্ষার ফলে পুরাতন বিজ্ঞানের সহিত চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার যে অসামঞ্জস্য সকলের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার নিরাকরণের জন্য আইনস্টাইন আপেক্ষিক মতবাদের প্রবর্তন করেন। পূর্বে আলোকতরঙ্গ-বাহক ঈথর ও তৎসম্ভূত তরঙ্গের স্পন্দনকালই বৈজ্ঞানিকদের কাছে নিউটনীয় স্বতঃপ্রতিষ্ঠ দেশকালের মূর্ত প্রতীক হিসাবে গণ্য হইত। এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক ও উহা যে আলোকবিজ্ঞানের সমস্ত অসামঞ্জস্যের কারণ, ইহা আইনস্টাইন খুব সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝাইলেন। দেশকালের নিরপেক্ষবাদ ত্যাগ করিয়াও যে বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্ভব, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আইনস্টাইন প্রথম প্রবন্ধে যে বিভিন্নগামী দ্রষ্টাদের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাদের পারস্পরিক আপেক্ষিক গতির হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে না, ইহা ধরিয়াই তিনি আপেক্ষিকবাদের বিচার আরম্ভ করেন। ওই সময়ে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবকে তিনি গণনার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। আলোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণের কোন প্রভাবই তদবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ফলে আপেক্ষিকবাদের প্রয়োগক্ষেত্র উপরিউক্ত ভাবে সীমাবদ্ধ হইলেও যে বিরোধভঞ্জনের প্রয়োজন ছিল, তাহা সুসাধিত হইল। অধিকন্তু ওই রূপ নূতন মতবাদের উপর যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভিত্তিস্থাপন সম্ভব সে বিষয়েও অপক্ষপাতী বৈজ্ঞানিকের মনে কোন সন্দেহ রহিল না। আইনস্টাইন কিন্তু এই সাফল্যেই সন্তুষ্ট রহিলেন না। আরও দশ বৎসর নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে তিনি আপেক্ষিকবাদের প্রয়োগক্ষেত্র প্রভূতভাবে বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিউটনীয় মাধ্যকর্ষণবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এক নূতন গণিতশাস্ত্রের ভিত্তি তিনি স্থাপন করিলেন। আপেক্ষিকবাদ পূর্বোক্ত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আর আবদ্ধ রহিল না। সর্বপ্রকার গতিবৈষম্যের ক্ষেত্রেও যে উহা প্রযুজ্য, আইনস্টাইন তাহা দেখাইতে সমর্থ হইলেন।

নূতন গণিতশাস্ত্রের সহিত নিউটনীয় মতবাদের বিভিন্নতা বুঝিতে হইলে মাধ্যাকর্ষণবাদের কয়েকটি মূল কথা আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। নিউটন জড়বস্তুর গতিবৈচিত্র্যের কারণ নির্দেশ করিবার জন্য মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের প্রচার করিয়াছিলেন। যে কোন দুইটি জড়বস্তুর মধ্যে ব্যবধান যত বেশী হউক না কেন, নিউটনের মতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি বর্তমান। মাধ্যাকর্ষণ ধর্ম-সম্ভূত ওই শক্তির প্রভাব দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত বিপরীতবর্গ নিয়মানুসারে বাড়ে ও কমে। তাঁহার বিজ্ঞানে কিন্তু এক বস্তু হইতে অন্যের উপর প্রভাব-প্রবর্তনের জন্য কোন অসীম বস্তুধর্মী জড়ক্ষেত্রের পরিকল্পনার সুবিধা নাই। অর্থাৎ আলোক-বিজ্ঞানের মতো মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব তরঙ্গবাদের উপর অবস্থিত নয়। সর্বপ্রকারে বিযুক্ত থাকিয়াও যে জড়বস্তুরা দূর হইতে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এই কল্পনা অনেকের কাছে দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় বলিয়া মনে হইয়াছিল। মনে হয়

নিউটন নিজেও তাঁহার মতবাদকে এই দিক হইতে অসম্পূর্ণ ভাবিতেন। বিদ্যুৎবাহী জড়কণার মধ্যেও এই রূপ আকর্ষণ-শক্তির কল্পনা নিউটনের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্যারাডে ও ম্যাক্সওয়েল পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, এই ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার তরঙ্গাকারে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে পরিব্যাপ্ত হয়। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের এই দূর হইতে প্রভাব বিস্তারের কল্পনা অনেকের কাছে অসন্তোষজনক মনে হইলেও তাহার পরিবর্তে অন্য কোন মতবাদ উত্থাপন করিতে আইনস্টাইনের পূর্বে কোন বৈজ্ঞানিকই সক্ষম হন নাই। এদিকে গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষরেখার বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের গতিবিধির বৈচিত্র্য এই মতানুসারে সহজ ও সুন্দর ভাবে নির্দেশিত হইল। এই তত্ত্বের অদ্ভুত সাফল্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিল। কোপর্নিকাস্ টলেমীকে নির্বাসিত করিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বেত্তারা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব যে সৌরমণ্ডল অতিক্রম করিয়া অনতিদূরবর্তী নক্ষত্র-জগতেও অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্তমান, তাহার পক্ষে ভুরি ভুরি প্রমাণ উপস্থিত করিলেন।

মনে রাখিতে হইবে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বানুমোদিত গতি-শাস্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দেশকালের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিতেছে। এই পরিকল্পনার পরিবর্তে আপেক্ষিকবাদের প্রচার করিতে গিয়া আইনস্টাইন দেখিলেন, নিউটনীয় শক্তি-পরিকল্পনার স্থান তাহার প্রবর্তিত নূতন বিজ্ঞানে নাই। কাজেই জড়ের, গ্রহের, তারকারাজির গতি-বৈচিত্র্যের ভিন্ন হেতু নির্দেশের প্রয়োজন হইল। দশ বৎসরের সাধনার ফলে যে হেতু তিনি আবিষ্কার করিলেন, তাহা উচ্চগণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসাধ্য। কিন্তু পুরাতন মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে যে সব প্রাকৃতিক ঘটনার হেতুনির্দেশ সম্ভপর হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি এই মতবাদের সাহায্যে ভিন্নভাবে বুঝাইতে তিনি সক্ষম হইলেন। ইহার জন্য আইনস্টাইন ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে বিসর্জন দিয়া রীমান-কল্পিত দেশবোধতত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছেন। গণিতের সাহায্যে ব্যক্ত করিতে গেলে বলিতে হইবে, জড়ের গতিবৈচিত্র্যের কারণ দ্রষ্টার দেশকালরূপ প্রক্ষেপভূমির অসমতা ও বর্তুলতা। ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে পরিকল্পনা এই মতবাদে সম্পূর্ণ নূতন ও চমকপ্রদ। পুরাতন বিজ্ঞানে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিই দেশবোধের একমাত্র অবলম্বন। উক্তমতে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার অসীম ও অবাধ। উহার পরিমাণের কল্পনাও অসম্ভব। আপেক্ষিক মতবাদে কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার অবাধ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও উহাকে আর অসীম কিংবা অপরিমেয় বলা চলে না। দেশকালের বর্তুলতা স্বীকার করিলে আইনস্টাইনের মতানুযায়ী তাহার প্রসারের পরিমাণ করা আর অসম্ভব নয়।

জড়ের গতির ন্যায় আলোকের গতির উপর দেশকালের অসমতা ও বর্তুলতার

প্রভাব আছে। কাজেই আলোকরশ্মির উপর তথাকথিত মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আইনস্টাইনের মতবাদের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই বিষয়ে তিনি গণিতের সাহায্যে যে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সব কয়টিই আজ বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের মধ্যেই আইনস্টাইন তাঁহার নূতন গণনার ফল প্রকাশিত করেন। সন্ধিস্থাপনের অব্যবহিত পরে ১৯১৯ সনের সূর্যগ্রহণের সময় ইংরেজ জ্যোতির্বেত্তারা এই সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়া অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। আইনস্টাইনের বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতির আরম্ভ ওই সময় হইতেই। সাধারণ সংবাদপত্রে পর্যন্ত আইনস্টাইনের মতের আলোচনা আরম্ভ হইল। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের মধ্যেও তাঁহার আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি ও কৌতূহল জাগরূক হইল। ফলে আইনস্টাইনের নাম আজ বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সকলের কাছেই সুপরিচিত। তাঁহার জীবনী ও ব্যক্তি-স্বরূপের বিষয় জানিবার কৌতূহলের আজ অবধি নাই।

সর্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইবার বহু পূর্বেই তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা বিজ্ঞান-বিলাসীদের চমৎকৃত করিয়াছিল। তাঁহার প্রখর ও অলোকসামান্য অন্তর্দৃষ্টির কল্যাণে বিজ্ঞানের অনেক জটিল রহস্যের মর্ম আজ সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আলোকের শক্তিকণাবাদ, ব্রাউন আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণীয় বস্তুকণার অবিরত আন্দোলনের বিজ্ঞানসম্মত হেতু নির্দেশ—ইত্যাদি গবেষণার প্রত্যেকটি আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ঘটনা। যে মহারথীরা বর্তমানে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার নেতৃত্ব করিতেছেন, তাঁহাদের অতি পুরোভাগেই আইনস্টাইনের স্থান আজ সর্বজনস্বীকৃত।

এই অসামান্য বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিস্বরূপ বুঝিতে হইলে ইউরোপীয় মহাসমরের পর গত কয়েক বৎসরের জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পরিস্থিতির কিছু আলোচনার প্রয়োজন। যাঁহারা মানবসমাজের ভবিষ্যতে আস্থাবান, জাতি-নির্বিশেষে মনুষ্য-জীবন যাঁহারা অমূল্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক জাতিরই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার স্বীকার করিতে যাঁহারা পরাঙ্মুখ নহেন, তাঁহারা বিগত মহাসমরের হিংস্র ও ভয়াবহ সর্বগ্রাসী মূর্তি দেখিয়া ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছিলেন। যে দাবানলে ইউরোপীয় সভ্যতা ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ভেরসাইয়ের সন্ধিতে সে দাবানল নির্বাপনের পর পুনর্বার উহা যাহাতে দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সকল দেশের প্রকৃত মানবপ্রেমিকেরা উৎসুক ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। ওই মনোভাব হইতেই আন্তর্জাতিক সমবায়ের উৎপত্তি। প্রত্যেক দেশের শিক্ষিত মানবপ্রেমিকের চেষ্টাতে যে রাজনৈতিক জগতে শান্তি চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব, রোগ, দৈন্য, অন্ধ জাতি-বিদ্বেষ,

নৃশংস সামাজিক অত্যাচার ও কলুষতার বিরুদ্ধে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের নিমিত্ত মানুষের সমবেত চেষ্টা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিরন্তর নিয়োজিত থাকিবে, এই আশা ও ধারণা লইয়াই আইনস্টাইন জেনিভার বৈঠকে যোগদান করেন। গত কয়েক বৎসরের কাহিনী কিন্তু বড়ই নিষ্করুণ। বর্বর সমর-মনোভাব, পরশ্রীকাতরতা, অত্যাচার ও সাম্রাজ্য-লোলুপতার আশু অবসানের স্বপ্ন দেখিয়া যাঁহারা জেনিভার আন্তর্জাতিক বৈঠককে এক মহামানবীয় সভ্য যুগের সূচনা বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আজ বড়ই দুর্দিন। বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের পর হতাশ হইয়া আইনস্টাইন ১৯৩২ সনে জেনিভার বৈঠকে পুনর্বার যোগদান করিতে অস্বীকার করেন। ১৯৩৩ সনে হিটলারের অভ্যুদয়ে জার্মানীতে ইহুদীবর্জন নীতি প্রচলিত হইলে তিনি নিজের মানসম্ভ্রম, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেন। স্বধর্মাবলম্বী বহু ইহুদীর ন্যায় আজ তিনি স্বদেশত্যাগী। তাঁহার ন্যায় মন্ত্রদ্রষ্টা বিজ্ঞান-সাধককেও আজ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ঘূর্ণি-বায়ুর মধ্যে পড়িতে হইয়াছে।

আইনস্টাইনের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পত্রাবলী হইতে সংকলিত হইয়া ১৯৩৩ সনে জার্মান ভাষায় Mein Weltbild বলিয়া যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, The World As I See It তাহারই ইংরাজী অনুবাদ। বিষয়ানুসারে পুস্তকখানি পাঁচভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে প্রায় অর্ধাংশ পূর্ণ। বাকি প্রবন্ধগুলি তাঁহার দার্শনিক মনোভাবের এবং আন্তর্জাতিক, জার্মানীর ও ইহুদীর সমস্যার বিষয়ে মতামতের পরিচয় দিতেছে। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত। কাজেই বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে মতামতের সুসংগতি সব সময়ে সুস্পষ্ট না হইলেও সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রত্যেক প্রবন্ধটির মধ্যে লেখককে ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। বর্তমান রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংকট হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তিনি যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকলের কাছে যুক্তিযুক্ত, অমোঘ কিংবা বিচারসহ বলিয়া প্রতিপন্ন না হইতে পারে। কিন্তু মানবজাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সকলকেই স্পর্শ ও মুগ্ধ করিবে। সমস্ত পুস্তকের মধ্যে বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় রচনাগুলিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ইহার মধ্যে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা, আপেক্ষিক মত-বাদের ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক আদর্শ ও গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদি অনেক বিষয়ের প্রবন্ধই গভীরচিত্ত পাঠকের অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

আপেক্ষিক মতবাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় ইতঃপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পদ্ধতির বিষয়ে আইনস্টাইনের মতামতের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সৃষ্টির অপার রহস্যের ভিতর আমাদের মন যে অনন্ত

সৌন্দর্যের ও বিশুদ্ধ চৈতন্যের অত্যল্প ও ক্ষীণ সন্ধান পায়, তাহার সমগ্র উপলব্ধি মানববুদ্ধির অতীত হইলেও নিরন্তর তাহারই সাধনাই তাঁহার মতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক। ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডির বাহিরে সমস্ত জগৎকে বৈজ্ঞানিক অন্ততঃ আংশিকভাবে উপলব্ধি করিতে চায়। এই জন্যই নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী বহির্জগতের হেতুসূত্রে যোজিত মনোমত প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে সে সর্বদাই ব্যস্ত। এইভাবে হেতুপ্রভব প্রতীকের সাহায্যেই ব্যক্তিত্বের দ্বারা রঞ্জিত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অতিক্রম করিয়া সে বহির্জগতের স্বরূপসত্তাকে ধরিতে চাহে। প্রকৃতির প্রত্যেক জটিলতত্ত্বের বিশ্লেষণ মানববুদ্ধির অতীত বলিয়াই ওই প্রতীকের রাজ্যে অপেক্ষাকৃত সরল ঘটনাসমূহের বিকলন ও পুনঃসংযোজন লইয়াই বৈজ্ঞানিককে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এই সংযোজন ও বিশ্লেষণ ন্যায়ানুগ ও নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যই পদার্থ-বৈজ্ঞানিককে গণিতের রীতি ও পরিভাষার আশ্রয় লইতে হয়। কাজেই অপূর্ণ হইলেও বৈজ্ঞানিকের প্রতীকরাজ্যে অশুদ্ধতা ও অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তার স্থান নাই। সমগ্র জাগতিক ঘটনার হেতুনির্দেশ চিরকাল সসীম বিচারবুদ্ধির অতীত রহিলেও শুধু ন্যায়সংগত বিকলন প্রথায় প্রত্যেক বাস্তব বা দৈবঘটনার হেতুনির্দেশ যে সম্ভব, ইহা আইনস্টাইন বিশ্বাস করেন। যে সামান্য ও চিরন্তন নিয়মাবলী হইতে ন্যায়ের বিকলন-পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক জগতের প্রতিকৃতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের আবিষ্কারের কোন ন্যায়নির্দিষ্ট পন্থা নাই। বহির্জগতের ঘটনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে উহারা আপনা হইতে বৈজ্ঞানিকের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়। অবশ্য এই নিয়মাবলীর যুক্তিযুক্ততা ও যথার্থতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদের তৎপ্রসূত ফলাফলকে অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা করিতে হয়।

নিউটন প্রমুখ পুরাতন-পন্থী বৈজ্ঞানিকেরা আইনস্টাইনের মতোই কতকগুলি প্রাথমিক স্বতঃসিদ্ধ হইতে বিকলন প্রথায় জগতের ঘটনাবলীর হেতুনির্দেশ সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা ছিল সংকলন-ন্যায়ানুমোদিত প্রথাতেই প্রাকৃতিক বিশেষ অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ ওই স্বতঃসিদ্ধগুলি নিষ্কাশিত করিয়া লইতে পারে। তাঁহারা অভিজ্ঞতার সহিত স্বতঃসিদ্ধগুলি ন্যায়সূত্রে গ্রথিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করিতেন. যদৃচ্ছাক্রমে বিভিন্ন প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ কল্পনা করিয়া বিশ্বজগতের হেতুনির্দেশে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। এই মতের সপক্ষে উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ও নিউটনীয় গণিতশাস্ত্রের উল্লেখ করিতেন। বৈজ্ঞানিকদের উক্ত ধারণাকে আপেক্ষিকবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। আপেক্ষিকবাদের স্বতঃসিদ্ধগুলি পুরাতন গণিতশাস্ত্রের প্রত্যয়সমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও একই শ্রেণীর ঘটনার হেতুনির্দেশ এই মতেও সন্তোষজনক ভাবে সম্ভব। কাজেই যে প্রাথমিক সংজ্ঞা ও

প্রত্যয়গুলির উপর বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়িয়া উঠে, মানুষের অভিজ্ঞতার সহিত সেগুলির ন্যায়গত কোন নিত্যসম্পর্ক নাই।

এই মত কিন্তু নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। যে প্রত্যয় ও সংজ্ঞার সংযোজনা হইতে বৈজ্ঞানিকের প্রতীক-জগৎ গড়িয়া উঠে, তাহার সহিত মানব অভিজ্ঞতার যদি নিত্যযোগ না থাকে, প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীন কল্পনা করিবার অধিকার যদি স্বীকার করা যায়, তবে কি ভাবিতে হইবে বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জগতের প্রতিকৃতির সহিত বাহ্য জগতের কোনো সম্পর্ক নাই? হেতুপ্রভব প্রতীকের সাহায্যে বহির্জগতের স্বরূপসত্তার উপলব্ধির চেষ্টা তবে কি মানবের ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র? লোকযাত্রার উপযোগিতাই কি তবে বিজ্ঞানের শেষ কথা?

আইনস্টাইন উহা বিশ্বাস করেন না। ন্যায়ানুগত যোগসূত্র না থাকিলেও কোনো অজ্ঞেয় উপায়ে বহির্জগৎ আমাদের প্রতীক-জগতের প্রত্যয় ও স্বতঃসিদ্ধগুলিকে অদ্বিতীয় ভাবে সুনির্দিষ্ট করিতেছে, ইহাই আইনস্টাইনের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই অদ্বিতীয় নিয়মাবলীকে অবিষ্কার করা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব, তাহাও তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন যে, বাহ্যপ্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ ও ঘটনার অন্তর্নিহিত নিত্য সম্পর্ক-সমূহকে আমরা গণিতের অপেক্ষাকৃত সরল প্রত্যয়ের অনুসারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। কিন্তু সেই প্রত্যয়গুলিকে ন্যায় পথে পাওয়া যাইবে না। তাহাদের আবিষ্কারের জন্য আমাদিগকে আন্তরিক অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর করিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ফলে যে প্রত্যয়গুলির সম্ভাব্যতার কথা আমাদের মনোমধ্যে উদিত হইবে, তাহাদের সংযোজনের ফলাফলের সহিত বাহ্য-জগতের প্রকৃতির তুলনা করিয়া বুঝিতে হইবে আমরা যথার্থ প্রত্যয়গুলির সন্ধান পাইয়াছি কিনা। শুদ্ধ প্রত্যয় অবলম্বনে গাণিতিক উপায়ে যে বিজ্ঞান-শাস্ত্র আমরা রচনা করি, তাহা শুদ্ধ ও অন্তর্বিরোধশূন্য। তাহাতে দ্ব্যর্থবোধের অবকাশ না থাকিলেও তাহার সহিত বহির্জগতের কোনো নিত্য সম্পর্ক নাই। ফলতঃ উহা বস্তুসারশূন্য সংযোজনা মাত্র। উহার প্রত্যয়গুলির সহিত বহির্জগতের বস্তুসত্তার যথাযথ সম্পর্ক আরোপ করিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে ওই বিজ্ঞানের অনুসারে বহির্জগতের ঘটনাবলীকে আমরা বুঝিতে পারি কিনা।

আপেক্ষিকবাদ আবিষ্কার-ব্যপদেশে তাঁহার বিভিন্ন চেষ্টার উদাহরণ দিয়া আইনস্টাইন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উপরোল্লিখিত উপায়ে বহির্জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা নিষ্ফল ও আকাশকুসুম মাত্র নয়।

আইনস্টাইন যে পূর্বগামী আচার্যদের মতোই বহির্জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্বে ও হেতুপ্রভব বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাসী, তাহা উপরের আলোচনা হইতে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। পদার্থবিজ্ঞানের নবতম সমষ্টিবাদের ফলে আজকাল অনেকেই

হেতুবাদের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছেন। ফলে ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতার পরিবর্তে তাহার সম্ভাবনার আলোচনাই বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। এই নবমতবাদ অণুপরমাণু-রাজ্যের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইলেও ভবিষ্যতে বিজ্ঞানে যে হেতুবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে, ইহাই আইনস্টাইনের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই প্রতিষ্ঠার আয়াসেই তাঁহার সাধনা ও পরিশ্রম সমগ্রভাবে নিয়োজিত।

[১৩৪২]

আলবার্ট আইনস্টাইন

গ্যালিলিও এবং নিউটনের সমপর্যায়ের বৈজ্ঞানিক, এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সেবী। ১৮৭৯ সনের ১৪ই মার্চ জার্মানীর এক ইহুদী পরিবারে জন্ম। বিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে বিশেষ নাম না করলেও ছেলেবেলাতে কম্পাস যন্ত্রকে কেন্দ্র করে প্রকৃতির রহস্য জানার জন্য তাঁর মনে অদম্য কৌতূহল সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয়ে একমাত্র গণিতের প্রতি বিশেষ রুচি দেখা যায় এবং বিজ্ঞানের সহজবোধ্য পুস্তক পাঠে আনন্দ পেতেন। জুরিখে ১৮৯৬ সন থেকে ১৯০০ সন পর্যন্ত পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত অধ্যয়ন করেন। ১৯০২ সনে বার্ন শহরে সুইস পেটেণ্ট অফিসে একটি সাধারণ চাকরি গ্রহণ করেন এবং অবকাশ সময়ে বিজ্ঞানের মৌলিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে অনুশীলন করতে থাকেন। ১৯০৫ সনে ২৬ বৎসর বয়সে তাঁর স্পেশাল থিওরী অফ রিলেটিভিটি সংক্রান্ত রচনা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনার জন্য তাঁর জগৎ জোড়া খ্যাতি হয়। ১৯১৬ সনে তাঁর জেনারেল থিওরী অফ রিলেটিভিটি এবং ১৯৫০ সনে ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী সংক্রান্ত রচনা প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সনে তাঁকে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় এবং সে অর্থ তিনি জনসেবার জন্য দান করেন। ১৯৫৫ সনের ১৮ই এপ্রিল পরলোক গমন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অনাড়ম্বর নিরহংকার ও আত্মভোলা স্বভাবের জন্য তাঁকে ঋষিতুল্য ব্যক্তি বলা হত। শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসেবী হওয়া সত্ত্বেও সঙ্গীত এবং বিশেষ করে বেহালা বাদনে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল এবং তিনি চিরায়ত সাহিত্যের পরম অনুরাগী ছিলেন। বিশ্বের কোন কোণে অন্যায় ও অবিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে—এ খবর পেলেই এই মানবদরদী মনীষী প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠতেন। এই জন্য তাঁকে হিটলারের জার্মানী ত্যাগ করতে হয় ও আমেরিকাতে বসবাসকালীন এক শ্রেণীর সংকীর্ণচেতা রাজনৈতিক নেতার বিরাগভাজন হতে হয়। বিশ্বশান্তির জন্য এই অহিংসাপ্রেমী মহামানবের প্রয়াস স্মরণীয়। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মত মানুষ আইনস্টাইনও সর্বযুগের মহাপুরুষদের সঙ্গে একই সারিতে স্থান পেয়েছেন।

অনুবাদক পরিচিতি

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মার্চ বিহারের সিংহভূম জেলার রেলওয়ে কলোনী চক্রধরপুরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। ওইখানকার রেলের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর আগস্ট আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দুইবার গ্রেপ্তার হন। ছেলেবেলা থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার কারণ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ার পর নানা রকম অল্প পুঁজির ব্যবসায় করেন। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টাটানগরে রেলে চাকরী করার পর বিহারের বিখ্যাত জননেতা স্বর্গত অধ্যাপক আবদুল বারীর প্রভাবে চাকরী ছেড়ে দিয়ে পূর্ণমাত্রায় জনসেবামূলক জীবন গ্রহণ করেন। জেলা কংগ্রেসের কার্যালয় সম্পাদক, ছাত্র ও যুব কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী ও সিংহভূম জেলার গঠনমূলক কাজের কেন্দ্র "বারী আশ্রমের" ব্যবস্থাপক ইত্যাদি অনেকবিধ দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দ থেকে রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ ও সর্ব সেবা সঙ্ঘের আওতায় গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তী দশ বৎসর বিনোবাজী প্রবর্তিত ভূদান আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের কলিকাতার আঞ্চলিক দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা।

প্রথম রচনা স্কুলের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বাইশ বছর বয়সে। তারপর এযাবৎ অনুবাদ ও মৌলিক রচনা মিলিয়ে প্রায় বারটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষার প্রায় সব কয়টি প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকায় অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান ও রাজনীতি শাস্ত্র সম্পর্কিত প্রবন্ধ লিখে থাকেন। ইংরাজী ও হিন্দিতেও লেখার চর্চা আছে। আঠার বছর বয়সে জামসেদপুর থেকে প্রকাশিক সাপ্তাহিক "নবজাগরণ" পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন ও পাঁচ বৎসর সে দায়িত্ব পালন করেন। দেড় বৎসরকাল কাশী থেকে প্রকাশিত ভূদান আন্দোলনের ইংরাজী মুখপত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এঁর একাধিক মৌলিক রচনা ও গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইনি গল্প উপন্যাসও লিখে থাকেন; কিন্তু ছদ্মনামে।

নাম-সূচী

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য অবদান এবং বিশ্বের সাহিত্যসৃষ্টির অদ্বিতীয় নিদর্শন স্বরূপ। শিল্পকলা সংক্রান্ত যাবতীয় সংজ্ঞা তত্ত্বকথা, রসবোধ ও বিচার বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও রয়েছে অপরূপ কথাচিত্র। অতিসূক্ষ্ম ও সাধারণের পক্ষে দুরূহ বিষয়গুলি তাঁর অননুকরণীয় বাচনভঙ্গীতে সহজ সরল সরস ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতে তাঁর দ্বিমুখী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অধ্যাপকের মত শিক্ষা দান করেন নি, সেকালের ঋষি ও গুরুর মতই দীক্ষা দিয়ে গেছেন শিল্পশাস্ত্রে।

'শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা, রূপকলার আলোচনা ক্ষেত্রে যুগান্তরকারী গ্রন্থ, এবং এ যুগে আমাদের মধ্যে রসবোধের উন্মেষসাধনে অতুলনীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গসাহিত্যের এটি এক অমূল্য সম্পদ।'

—নন্দলাল বসু

বহুকাল অপেক্ষার পরে অবনীন্দ্রনাথের এই উপাদেয় প্রবন্ধ পুস্তক যে পড়তে পেলুম তার জন্য 'রূপা কোম্পানী'-কে ধন্যবাদ। আটাশটি বক্তৃতা প্রবন্ধের এই বইটি দেখা যাচ্ছে তার প্রসঙ্গমূল্য কিছুমাত্র হারায় নি। শিল্পতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্বের সমস্যা উন্মোচনে অবনীন্দ্রনাথের চিন্তা এখনও আমাদের পরিপাকজীর্ণ হয় নি, এখনও মননকে জাগাবার ক্ষমতা এই বক্তৃতাবলীর সময়াপহৃত হয় নি কিছুমাত্র। এবং শিক্ষণীয়তা ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথের রচনা স্বকীয় সাহিত্যগুণে আজও সমান আনন্দদায়ক।...'

[বিষ্ণু দে, পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৬৯]

'চিত্রশিল্পে ও কথাশিল্পের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। সেজন্য যাঁরা সাহিত্যতত্ত্ব পড়তে ভালোবাসেন তাঁরা এই রূপতত্ত্ব ও শিল্পের নানা দিকের কথা পড়লে লাভবান হবেন। খুব যত্ন করে ছাপা, সুন্দর একখানি ফোটোগ্রাফসহ কাপড়ে বাঁধাই। দাম খুবই শস্তা।...'

[পরিমল গোস্বামী, যুগান্তর, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৬৯]

দাম : ১২·০০ টাকা

বাঙালী

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাসের অগ্নিচক্র ঘুরেছে ভারতের উত্তরে আর দক্ষিণে। কিন্তু পূর্ব ভারতের তমসাচ্ছন্ন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বাঙালী। সেই খণ্ডছিন্নবিক্ষিপ্ত বাঙালী আজ সারা ভারতের সমস্যা। তবুও নতুনকে গ্রহণ করবার ক্ষমতায়, সমীকরণের অসাধারণ শক্তিতে সে আজো ভাস্বর। তার বর্তমান বিপর্যয় এক অপরিমেয় দিগন্তের পূর্বাভাস। তাই বাঙালীর ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছেই অনুশীলনের বস্তু। সারা ভারতের পটভূমিতে সেই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

আপনার বইখানি পড়িয়া আনন্দিত ও লাভবান হইলাম। আপনি বাঙালীর কথা অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ সেন

এই সুন্দর পুস্তকটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চিন্তাশীল পাঠকসমাজে ইহার আদর হইবে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

দাম ঃ ৬·০০ টাকা

আমার ঘরের আশেপাশে

ডঃ তারকমোহন দাস

এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন), ডি. আই. সি.

রীডার, কৃষি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ

ভূমিকা : **সত্যেন্দ্রনাথ বসু**, জাতীয় অধ্যাপক

নিজেদের দেশের ফুলফল, গাছপালার ওপর এক স্বাভাবিক আত্মীয়তাবোধ মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। দেশের সম্পূর্ণ পরিচয় আজ শুধু নদনদী ও স্থাপত্য-কীর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে দেশের পশু-পক্ষী ও গাছপালার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও। উদ্ভিদের হাত ধরেই আমরা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধাপগুলি পার হয়ে এসেছি। ইতিহাসের পাতা ওলটালে তাই দেখা যায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করে এসেছে বৃক্ষদেবতা। যে সব আমাদের দেশের নিজস্ব গাছপালা তাদের অতুলনীয় রূপ, রস ও সৌরভের সঙ্গে আমাদের রুচি ও রসবোধ কতো নিবিড়-ভাবে জড়িত ছিল তার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে। এই সব দেশজ গাছপালা, আমাদের মাটির সঙ্গে যাদের হাজার হাজার বছরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তারা আজও পথে-প্রান্তরে জীবনের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে দিগন্ত রঙীন করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের নির্লিপ্ত দৃষ্টির সম্মুখেই।—কি তাদের নাম? কি তাদের জীবন-বৈশিষ্ট্য? আমাদের জাতীয়-মানস ও ভাবধারার সঙ্গে কোথায় তাদের সংযোগ?—সেই কাহিনী পরিবেশনই এই বইএর মূল লক্ষ্য।

দাম : ৫·০০ টাকা